বাখতিন

তপোধীর ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পথিকৃৎ ও সম্প্রতিক সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা তপোধীর ভট্টাচার্য এই বইতে বিশ শতকের প্রশস্যতম চিন্তাগুরু মিখায়েল বাখতিনের দ্বিরালাপিক ভাবনাজগতের নিষ্কর্ষ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা এবং কোনো অস্তিত্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—এই দুটি মহাবাক্যের নিরিখে শিল্প-সাহিত্য-জীবনের তাৎপর্য ইদানীং নতুনভাবে, নির্ধারিত হচ্ছে। জীবন ও সৃষ্টির যুগলবন্দি কত অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক বাখতিন সেই পাঠ আমাদের দিচ্ছেন। তাঁর কাছে পাওয়া বহুস্বরিকতা ও অনেকার্থদ্যোতনার ভাবনায়, কার্নিভাল-চেতনায় আমাদের নান্দনিক দর্শন ও সাহিত্যবীক্ষা আমূল পুনর্বিন্যস্ত হয়ে চলেছে। বদলে যাচ্ছে আখ্যানের আলো ও আঁধার, সোচ্চার ও নিরুচ্চারের মন্থনকথা। এই বইতে সেই সব আলোচিত হয়েছে বিরল প্রজ্ঞায়, অন্তর্দীপ্ত বাচনে। বাখতিন-চর্চায় তাই এর গুরুত্ব দ্বিতীয় সংস্করণেও অম্লান।
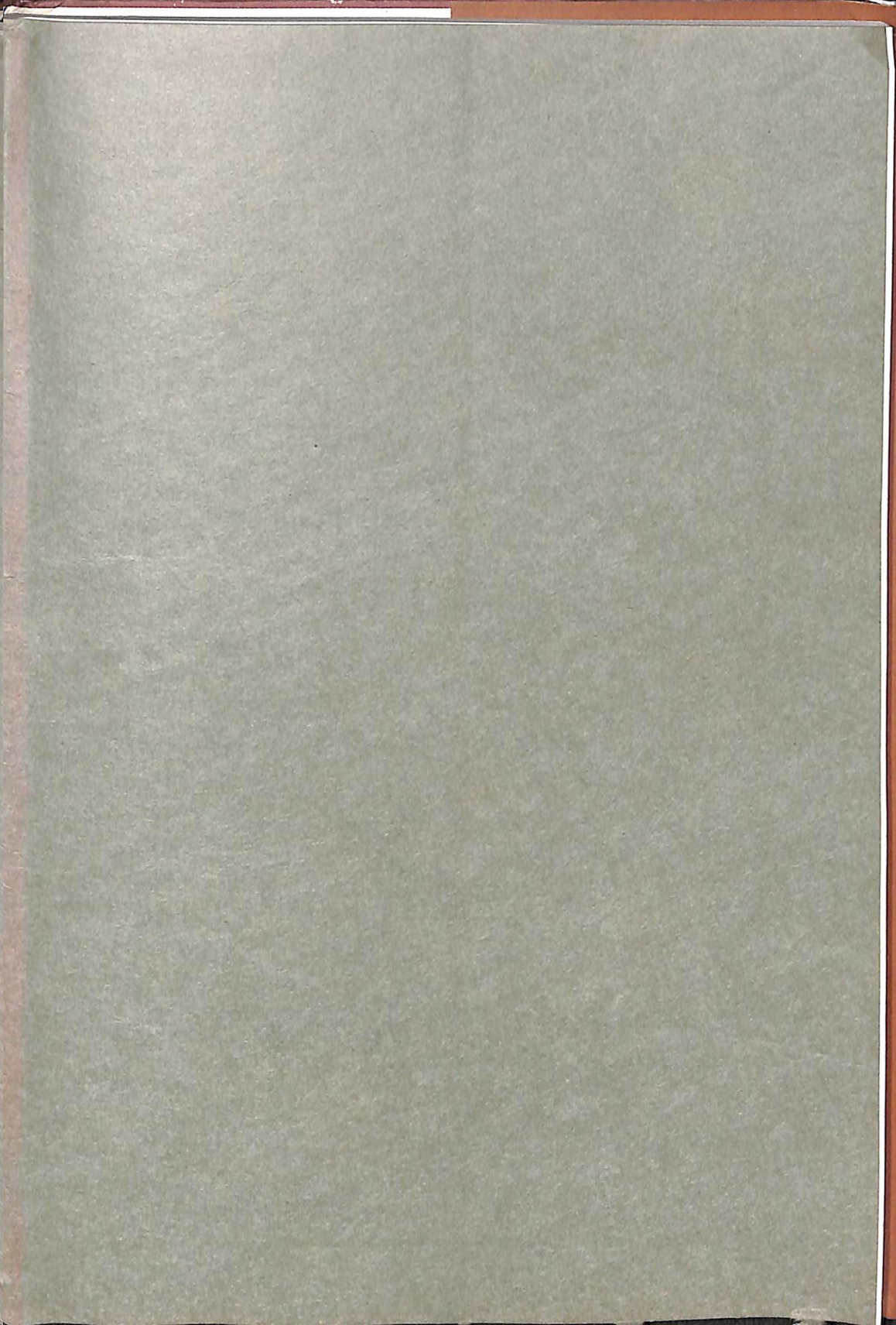
বাংলা সা
সম্প্রতিক
পুরোধা
শতকের
বাখতিনে
নিষ্কর্ষ বি
সহযোগী
স্বয়ংসম্পূ
নিরিখে
ইদানীং ন
সৃষ্টির যুগ
বাখতিন
কাছে পাও
ভাবনায়,
নান্দনিক
পুনর্বিন্যস্ত
আখ্যানের
নিরুচ্চারে
আলোচিত
বাচনে।
দ্বিতীয় সং

বাখতিন
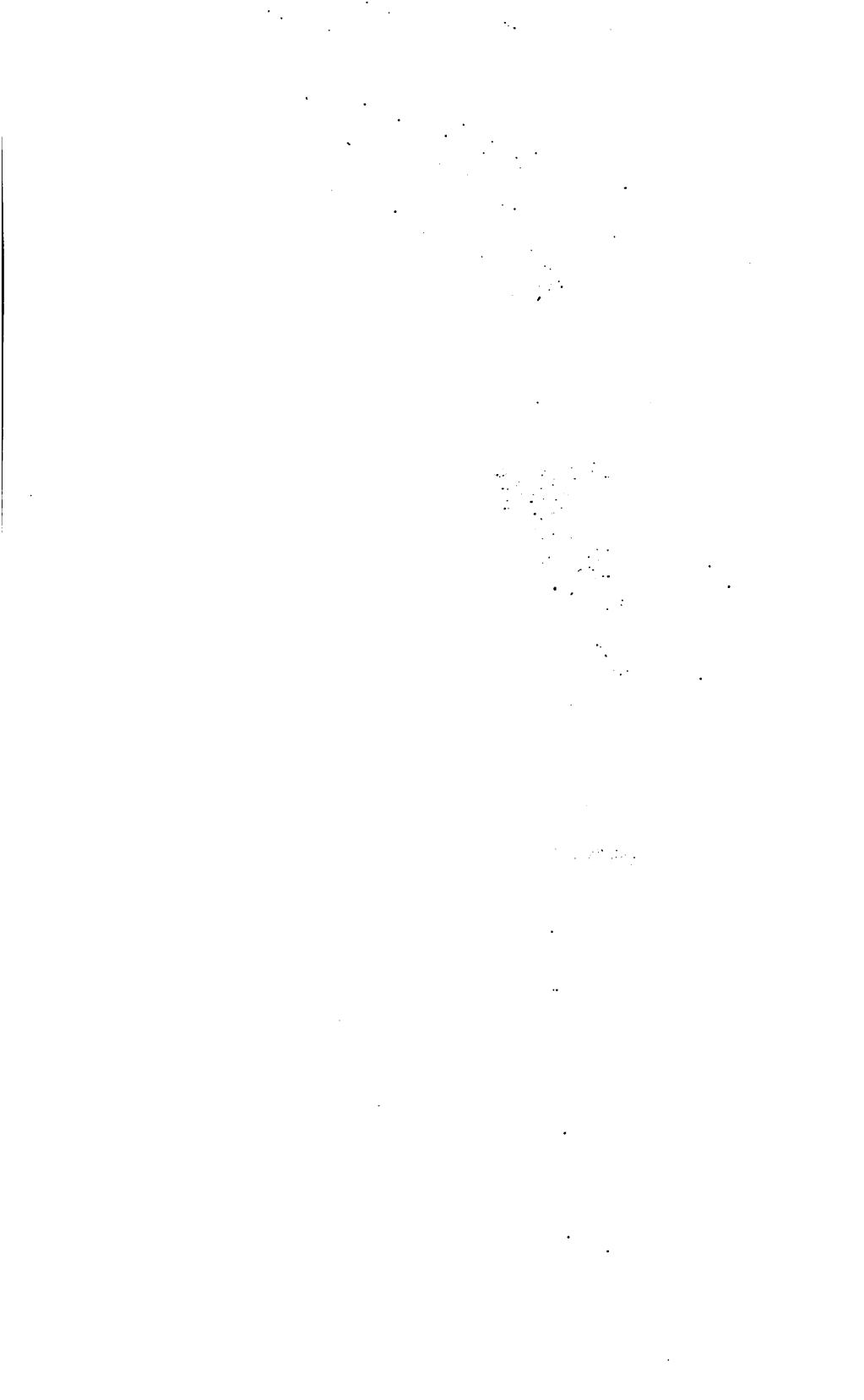
বাখতিন

তপোধীর ভট্টাচার্য

এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

BAKHTIN
A Collection of Essays on Bakhtin by
Tapodhir Bhattacharya

Rs. 125.00

এবং মুশায়েরা সংস্করণ
শ্রাবণ ১৪১৬। আগস্ট ২০০৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৫। জুন ২০০২

প্রচ্ছদ
কল্লোল সাহা

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭৩

I S B N 978-93-80255-01-9

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : এক শত পঁচিশ টাকা

শ্রীসনৎ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয় দেব
শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

কৃত্যের দর্শন যাঁদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে

সূচি

প্রাক্‌কথন ২

জেনেছি তাঁকে', এই প্রাচীন উচ্চারণ মেধাবী প্রত্যয়ে আজও মর্মরিত হয়, প্রাণিত করে আমাদের। কিন্তু সময়ের নিষ্করুণ প্রহারে ছিন্নভিন্ন হতে হতে আমরা কি তেমনভাবে দ্বিধা ও সংশয় পেরিয়ে যেতে পারি! সাহসী উচ্চারণ থেকে কতখানি বিচ্ছুরিত হয় উদ্‌ভাসনী আলো? আসলে আমাদের জিজ্ঞাসা পূর্ণাঙ্গ নয় কেননা আমরা আজও নিজেদের জিজ্ঞাসাকে নির্মাণ করতে শিখি নি। তাই প্রত্যুত্তরযোগ্যতাও অর্জিত হয়নি কী ব্যক্তিপরিসরে কী সামাজিক পরেসরে। অথচ জীবন নামক সমাপ্তিবিহীন নির্মাণের আয়োজনে জিজ্ঞাসার যর্থাথ গ্রন্থনাই সব কিছু।

মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন জীবনতত্ত্ব ও জীবনপ্রয়োগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশিল্পী। হাঁ, ইদানীং মনে হয়, এই চিন্তা শুরু প্রকৃতপক্ষে চিন্তাকে শিল্পে রূপান্তরিত করেছেন। জীবন নামক প্রয়োগশালায় একটি মুহূর্তের সঙ্গে অপর মুহূর্তের, একটি অবস্থানের সঙ্গে অপর অবস্থানের, একটি অস্তিত্বের সঙ্গে অপর অস্তিত্বের দ্বিবাচনিকসম্পর্ক স্বত:সিদ্ধ ও স্বয়ংদীপ্ত-- এই পাঠই তো দিয়েছেন তিনি। জীবনে শেষ কথা বলে কিছু নেই, কোনো পূর্বধার্য সমাপ্তিবিন্দুও নেই কোথাও— এই বোধে দীক্ষিত হয় যখন, আমাদের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে বুঝে নিই অন্তহীন সম্ভাবনার পরিসর হিসাবে।

বাখচিন অনন্য উপন্যাসতাত্ত্বিক নিশ্চয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী হলো তিনি জীবন নামক স্থাপত্যের বিশ্বকর্মা। যত পড়ি তাঁকে, ততই নতুন নিষ্কর্ষ আবিষ্কার করি। উপন্যাসের পাঠকৃতি আর জীবনের বয়ানের যুগলবন্দি হয়ে ওঠে একই সত্যের ভিন্নভিন্ন প্রকাশ। ভিন্নতার পথে ঐক্যের সন্ধান আবার ঐক্যের পথে বিভিন্নতার খোঁজ: অনেকার্থদ্যোতক এই প্রকরণ। বহুস্বরে বহুমাত্রায় তার বিন্যাসও প্রতিন্যাস। এই সন্দর্ভে নান্দনিক ব্যকরণের বিধি আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেইসব বিধি পেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় ঐ খোঁজ অনন্য। তিনি শুধু প্রতীচ্যের ছিলেন না কখনও, তিনি সর্বমানবের চিন্তাগুরু। সব কালে ও সব পরিসরে তাঁকে বহুবার, বারবার পুনরাবিষ্কার করে যেতে হবে আমাদের।

তাই বাখতিন চর্চা আমাদের বৌদ্ধিক কৃত্য নয় কেবল, জীবনের প্রতি আনখশির তৃতীয় নিমগ্ন থেকে জীবন-পুনর্নির্মাণের আর্তি প্রতিষ্ঠার জরুরি আয়োজন। দ্বিরালাপই অস্তিত্বের সারসত্য এই বোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার জন্যে নিজেকে জানাতে হয়: 'জেনেছি

তাকে': বেদাহম্ এতম্। সাহিত্যে-শিল্পে কত অজস্র দ্যোতনায় পুষ্পিত হয়ে চলেছে সহযোগ,তা উচ্চারণ করাই তো নির্মাণবায়িত কুহকী জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দৃপ্ত ঘোষণা। এই আমাদের একক ও সামূহিক প্রতিবাদ।

অতএব এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ হয়। বহুবিঘ্ন পেরিয়েই হয়। কেননা জীবন থেমে থাকতে পারে না, শিল্প পথ থেকে পথান্তরে যায়, অস্তিত্বের বিস্তার ঘটে ক্রমাগত। বাখতিন ছিলেন আছেন থাকবেন কেননা রয়েছেন তাঁর অজস্র জিজ্ঞাসু পাঠকেরা।

৯ জুলাই ২০০৯

তপোধীর ভট্টাচার্য

প্রাক্‌কথন ১

এমন একটা সময়ও ছিল আমাদের যখন 'তত্ত্বকথা' জাতীয় শব্দ ছিল অস্পৃশ্য; জিজ্ঞাসা থেকে সব মহিমা ঝরে গিয়েছিল। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সহজ লক্ষ্য হিসেবে 'তত্ত্ব' ছিল অদ্বিতীয়। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-আলোচনায় তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যত আপত্তি। এবং, এবিষয়ে আমরা ঘোর জাতীয়তাবাদী। পদার্থবিদ্যায় নিউটন-আইনস্টাইন-কে যারা ছাড় দেয় এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমস্ত শাখায় আন্তর্জাতিক নাগরিক হতে পারে সোৎসাহে—তাদের যত আপত্তি সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে। বিশ্বায়নের শুরু হওয়ার পরেও সাহিত্যচিন্তায় সীমান্ত-প্রহরা অটুট রয়ে গেছে। সাহিত্যে নতুন-নতুন চিন্তা প্রত্যাশিত। সেইসব ক্ষেত্রেও লক্ষ করি যুক্তিহীন দ্বিধা ও অনীহা।

তবু মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিনের বিস্ফোরক আবির্ভাব হলো। সত্তর দশকে ইংরেজি অনুবাদে তাঁর রচনা পড়ার পরে। মুখ্যত, দেবেশ রায়ের উদ্যম বাখতিনকে উৎসুক বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ফুকো-বার্ত-দেরিদা-জেমসন-বদ্রিয়ারের প্রতি কেউ-কেউ হয়তো সামান্য মনোযোগী। কেননা আধুনিক ও আধুনিকোত্তর কালপর্বের জটিলতা ব্যাখ্যায় প্রতীচ্যের এই তাত্ত্বিকেরা অগ্রণী। তত্ত্বকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে চান যাঁরা, সেইসব পাঠকদের কথা বলছি না। বলছি সেই জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের কথা যাঁরা জানেন, জীবনের প্রতিটি পাঠই তত্ত্বের পাঠ।

বাখতিনের স্বাতন্ত্র্য ঠিক কোথায়—তা অনুশীলন করতে গিয়ে দেখি, তিনি আমাদের যাবতীয় ভাব-পিঞ্জর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে প্রাণিত করেছেন। বাখতিনের তত্ত্ববীজগুলি স্বভাবে আকরণোত্তরবাদী। তাই কোনও ধরনের রুদ্ধতায় এরা কখনও বিকশিত হয় না। বাখতিনের ভাববিশ্ব এমন যে বারবার পুনঃপঠিত হওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁর তত্ত্ববিশ্বের আরও একটি প্রধান ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হলো, অন্যান্য চিন্তা-প্রস্থান কিংবা চিন্তাবীজের সঙ্গে দ্বিরালাপে তার বিকাশ ত্বরান্বিত হয় আরও। নিশ্চিহ্নায়ন ও প্রতিরূপায়ণের তোড়ে, আকাঙ্ক্ষার প্রতাপে সমকাল যখন প্লাবিত—কোনও কল্পিত স্বর্গের ইশারা পাই না তাঁর কাছে। এ মুহূর্তে ঠিক কোথায় নোঙর ফেলতে পারে চেতনা, এই জিজ্ঞাসা নিয়েই যাই বাখতিনের কাছে।

তিনি আমাদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন না। হয়তো মুক্তি ও শীর্ষবিন্দুর তাৎপর্য বদলে গেছে এখন। সমাজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়েছে ইতিহাস, মানবতন্ত্র ও নান্দনিক চেতনা। তবুও অনবরত অস্তিত্বের নবায়মান নির্মিতি-প্রকরণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকতেই হয়। বারবার তৈরি করে নিতে হয় নিজেদের প্রত্যুত্তরযোগ্যতা, অপরতার সঙ্গে সত্তার সংযোগ-প্রকল্প। প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের সর্বব্যাপ্ত বিয়োগপর্বে বাখতিনের পথ ও পাথেয়কে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করা সম্ভব? শুধু তো আধুনিকতাই নয়, আধুনিকোত্তর পরিস্থিতিও বিস্ফোরিত হয়েছে আমাদের চারপাশে। জাঁ বদ্রিয়ার বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে এসেছে মুক্তির মুহূর্ত : 'Political liberation, sexual liberation, liberation of the forces of production, liberation of the forces of destruc-

tion, women's liberation, children's liberation, liberation of unconscious drives, liberation of art. The assumption of all models of representation, as of all models of anti-representaiton' (The transperancy of evil : ১৯৯৬ : ৩)। বর্তমান যখন অস্থির, কেন্দ্রচ্যুত ও নিরালম্ব—উপস্থাপনার সমস্ত আকল্প ধ্বস্ত হয়ে যেতে বাধ্য। সন্দর্ভ ও প্রতিসন্দর্ভের যাবতীয় আয়োজন যেন হঠাৎ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। এই সময় যেন নিজেই মাদকে রূপান্তরিত; নিষ্কর্ষরিক্ত কার্নিভালের হুল্লোড়ে ভেসে যাচ্ছে বাস্তব, কল্পনা, যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ, সংকট ও দ্যোতনা। বাখতিন নিশ্চয় এমন প্রতিজগতের কথা ভাবতে পারেননি যেখানে প্রতিবাচনের সন্ত্রাসে বাচনের জমি ও আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বস্তু-চিহ্ন-বার্তা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবকল্পের অতি উৎপাদনে প্রতিটি পথের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রতিরূপেরও প্রতিরূপ তৈরি করতে করতে আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন এখন।

বাখতিন-চর্চায় নিজের সাধ্য অনুযায়ী যেদিন যোগ দিয়েছিলাম, পরিবেশ আজকের মতো এতটা আবিল হয়ে যায়নি। সাহিত্য ও জীবনের আশ্চর্য দ্বিরালাপের অংশীদার হয়ে মনে হয়েছিল, বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে প্রণালীবদ্ধভাবে কিছু বিশ্লেষণ তুলে ধরা যায়। একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল সেই অধ্যবসায়, একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বে ভ্রমণ-প্রত্যাশী সহযাত্রীর সংখ্যা তখন যা ছিল, সেই তুলনায় গত কয়েক বছরে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে নিশ্চয়। তবু যে-পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই পথের উপযোগিতা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে এখন। একই পথে যে অভিন্ন লক্ষ্যে যাত্রার অভিনিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকবে—তা ভাবার কারণ নেই কোনও। কতটা রূপান্তরিত হয়েছে পথ ও লক্ষ্য, যাত্রায় কতটা নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে, তা অনুধাবন করার আগেই জরুরি হয়ে পড়েছিল বাখতিনের পুনঃপাঠ। আমরা কি বিপুল শূন্যায়তনে প্রতিরূপেরও প্রতিরূপ গড়ে তুলছি কেবলই? বিভিন্ন ধরনের মুক্তি লক্ষ্য ইতিমধ্যে বিলীয়মান দিগন্তরেখার মতো অনেক দূরে সরে গেছে। যেসব চিহ্ন, প্রকরণ, আকাঙ্ক্ষা আমরা নিজেরাই উৎপাদন করেছিলাম—সেসব কি উৎপাদককেই গ্রাস করতে চাইছে আজ?

বিশ শতকের অন্তিম দশকের সূচনাপর্বে যখন বাখতিন-চর্চার শুরু করেছিলাম, সে-সময় নির্মাণবায়নের চোরাবালি এতটা হিংস্র হয়ে ওঠেনি। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দাপট এমন ভাবে যাবতীয় অপর পরিসরকে মুছে ফেলতে বেপরোয়া আগ্রাসন শুরু করেনি। বাখতিনের দেওয়া চিন্তাসূত্র ব্যবহার করে নিজেদের জীবন-জগৎ-সাহিত্য-মনন নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে উদ্যমী হয়েছিলাম। প্রত্যুত্তরযোগ্যতা, নির্মিতি-বিজ্ঞান, উদ্যমের দর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি ইংরেজি ভাষান্তরে তখনও পাইনি। নব্য উপনিবেশবাদের প্রতাপ ও বিশ্বায়িত প্রযুক্তির তুমুল প্রভাবে ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগল বদ্রিয়ার-কথিত, 'epidemic of simulation,' (তদেব : ৪) এবং সেই সূত্রে অনির্ণেয়তা ও অনিশ্চয়তা। বাখতিনের যথাপ্রাপ্ত স্থিতি-র ধারণা কি নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে তাতে? নাকি অস্থিতিমূলক স্থিতিকে যথাপ্রাপ্ত বলে ধরে নিয়ে জীবন ও জগতের বয়ান তৈরি করব এখন? 'দ্রষ্টা চক্ষু'র ধারণায় 'দৃষ্টি'র বহুস্বরিক তাৎপর্য প্রতিরূপায়ণের মোড়কে কি ঝাপসা হয়ে যাবে—নাকি নতুন উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে? ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন

তাত্ত্বিকের মৌলিক ভাবপ্রস্থান সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এঁরা প্রত্যেকেই সমান্তরাল অপর চিন্তা-পরিসরের সূত্রধার হিসেবে বাখতিন-অনুধ্যানকেই গভীরতর ও শানিততর করেছেন যেন।

তাই এই লিখন-প্রয়াসীর যে-বইটি বাখতিন সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ (এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র) বাংলা বই, তার সম্পূরক কিছু রচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রধানত ছোট পত্রিকার সহযোগী লিখন-যোদ্ধাদের আগ্রহে তৈরি হলো কিছু প্রবন্ধ। সময় ও পরিসরের উত্তাপ কিংবা দহন থেকে যে-বিহ্বলতা তৈরি হয়েছে সর্বত্র, বাখতিনের পুনঃপাঠ সূত্রে তার মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করেছি। বুঝতে চেয়েছি, বাস্তু-চিহ্ন-কৃত্য যখন তাদের ভাবনা-ধারণা-নির্যাস-উৎস-পরিণতি-মূল্যমান-পরম্পরা-অন্বিষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে যায়—বাখতিনীয় পার্থক্য-প্রতীতি এবং দ্বিবাচনিকতা কি সত্যিই কূটাভাসের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়! অথবা প্রত্যুত্তর-যোগ্যতার সম্ভাবনা ও তাৎপর্যকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করে নিরবচ্ছিন্ন নির্মিতির অধ্যবসায়ে মগ্ন হতে হয়! বাখতিন কি এই ক্রান্তিকালেও আমাদের এই পাঠ দেন না যে অস্তিত্বের সংজ্ঞা ও অন্বিষ্ট পুনর্নির্ণয়ের প্রক্রিয়া নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে শুরু হয় মাত্র?

নিশ্চয়। নতুন নতুন আরম্ভের শেষ নেই কোনও। সহযোগী সত্তার উপস্থিতি সম্পর্কে সংশয়ের কারণ নেই। তাই তিনদশক ধরে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন যিনি, 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার স্বনামধন্য সেই সেনাপতি, অনিল আচার্য, আমার বাখতিন-পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। একজন লিখন-কর্মীর কক্ষে এই তো বড়ো পুরস্কার যে অনুষ্টুপ প্রকাশনীর শ্লাঘ্য তালিকায় তার উদ্যমও অন্তর্ভুক্ত হলো। তাহলে, বাখতিন ঠিক, কোনও অধ্যবসায়ই হারিয়ে যায় না পুরোপুরি, আসন্ন ভবিষ্যতে দ্বিরালাপের পরবর্তী বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই উদ্যমও তাৎপর্য নির্ণয়ের অন্তর্বর্তী পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত হবে। আসলে সর্বব্যাপ্ত বিয়োগপর্বের কুহকে যত আচ্ছন্নতাই আসুক, সংযোগশূন্য ও মানবিক অভিকর্ষহীন চরম পরিস্থিতি কখনও তৈরি হতে পারে না। সব কিছুই রাজনৈতিক এখন, তাই আলাদা ভাবে কোনও পরিসরে রাজনীতি খুঁজতে হয় না। সব কিছুই চিহ্নায়ক যখন, আলাদা ভাবে চিহ্নায়ন প্রকরণ কোথায় খুঁজব? তেমন-ই সব কিছুই এখন সাংস্কৃতিক—হ্যাঁ, সর্বত্রব্যাপ্ত পীড়া-সংক্রমণ সত্ত্বেও—অতএব সংস্কৃতির যুদ্ধক্ষেত্র আলাদা ভাবে খুঁজতে হয় না।

বাখতিন-পাঠের সময়োপযোগী নিষ্কর্ষ অনুশীলনে এই বইটি যদি গ্রহীতা-পাঠকদের সহযোগী হিসেবে পায়, তাঁদের চিন্তাবিশ্বে একটুও শরিক হতে পারে—তাহলে উদ্যমকে সার্থক মনে করব। তবে চিন্তা ও কৃত্য যেহেতু চূড়ান্ত হয় না কখনও, এই প্রতিবেদন পরবর্তী কোনও সন্দর্ভের পূর্বলেখ বলে বিবেচিত হোক॥

কলকাতা বইমেলা
ফেব্রুয়ারি, ২০০২

তপোধীর ভট্টাচার্য

জীবনপঞ্জি

১৮৯৫...: ১৬ নভেম্বর (পুরোনো পঞ্জিকা অনুযায়ী ৪ নভেম্বর) মস্কোর দক্ষিণে অবস্থিত ওরেল নামক প্রাদেশিক শহরে মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিনের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল মিখায়েল ফেদ্রোভিচ। বাখতিনেরা ছিলেন নীল রক্তের মানুষ। তবে তাঁদের পারিবারিক আবহ ছিল সাংস্কৃতিক রুচিসম্পন্ন ও উদারনৈতিক। মিখায়েলের দাদা নিকোলাই তাঁর চেয়ে এক বছরের বড়ো ছিলেন। এছাড়া তাঁর তিনজন ছোট বোনও ছিল : একাটেরিনা, মারিয়া ও নাতালিয়া। শৈশবে জার্মান গৃহশিক্ষিকার সাহচর্য তাঁকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। মাতৃভাষার সঙ্গে জার্মান ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জার্মান অনুবাদে গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি পড়েন। আর, নাটক সম্পর্কে অনুরাগও তৈরি হয় মূলত ঐ গৃহশিক্ষকের উৎসাহে।

১৯০৪...: মিখায়েলের দাদু যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর বাবা তারই বিভিন্ন শাখায় ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। এবছর তিনি লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিল্‌নিয়াসে বদলি হন। আরও ছ-বছর বাখতিনের পরিবার সেখানেই ছিলেন। বহু ধরনের সংস্কৃতি পারস্পরিক ভিন্নতা নিয়ে সহাবস্থান করত ঐ শহরে। বিচিত্র কিংবদন্তি ও রহস্য, ভাষা ও ইতিহাস, ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক চর্যার সংশ্লেষণে ভিল্‌নিয়াস কিশোর মিখায়েলের পক্ষে হয়ে উঠেছিল বহুস্বরিকতা ও অনেকার্থদ্যোতনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ফার্স্ট ভিলিনিয়াস জিম্‌নাসিয়াম নামক স্কুলে তিনি যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন, তেমনই সেখানকার জীবনই তাঁকে ভাষিক ও বৌদ্ধিক বহুবাচনিকতার পাঠ দিয়েছে।

১৯০৭...: নানা ধরনের রাজনৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় আন্দোলন তখন স্থিতাবস্থায় আঘাত হানতে শুরু করেছে, দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন প্রবণতা। বুর্জোয়া সমাজ ও নৈতিকতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রচলিত ধর্মপ্রকরণ সম্পর্কে প্রতিপ্রশ্ন জেগে উঠেছে। দাদা নিকোলাইয়ের প্রভাবে মিখায়েল সমসাময়িক তরুণদের আলোচনাচক্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাতে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স-এর বৈপ্লবিক তত্ত্ব চর্চা করা হত। কিছুকাল পরে অবশ্য আলোচনার বিষয় পাল্‌টে গেছে। নীৎশে, বোদলেয়ার, হ্যাগনের, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং প্রতীকবাদী কবিতা হয়ে উঠছে অভিনিবেশের বিষয়।

১৯১০...: মিখায়েলের বাবা ওডেসায় বদলি হচ্ছেন। নিকোলাই তাঁর পড়াশোনার প্রয়োজনে আরো দু'বছর ভিল্‌নিয়াসে রয়ে গেছেন। মিখায়েল ওডেসার স্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন, এখানকার পরিবেশে একদিকে ছিল সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবন, অন্যদিকে, সমাজ-বহির্ভূত অপরাধপ্রবণ মানুষের জমায়েত। পরবর্তী জীবনে যিনি কার্নিভাল ও অনেকার্থদ্যোতনার দর্শন প্রচার করবেন,

ওডেসার যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতিতে তার বীজ নিহিত ছিল। একজন জার্মান শিক্ষকের কল্যাণে তিনি মার্টিন বুবের ও কীর্কেগার্দের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এত অল্প বয়সেও তাঁর বিপুল পাঠ-অভিজ্ঞতা সবাইকে বিস্মিত করছে। এবছর টলস্টয়ের মৃত্যু।

১৯১১...: মারাত্মক অস্থি-পীড়ার সূচনা যা তাঁকে সারা জীবন ধরে কষ্ট দেবে।

১৯১৩...: ওডেসার স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছেন মিখায়েল। এবছর নিকোলাই পিটাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুপদীবিদ্যা বিভাগে উচ্চতর পাঠ শুরু করেছেন।

১৯১৪...: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু। মিখায়েল চলে আসছেন পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসময় শহরের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পালটে পেট্রোগ্রাদ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব শাখার ধ্রুপদীবিদ্যা বিভাগে মিখায়েল ভর্তি হচ্ছেন। তখন পিটার্সবুর্গের বৌদ্ধিক জীবনে নতুন নতুন আবর্ত তৈরি হচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম পূর্বসূরিদের চিন্তাপ্রণালীকে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছেন। ভবিষ্যবাদী সাহিত্য-আন্দোলন ও শিল্পভাবনা প্রতীকবাদের বিরোধিতা করছে। মায়াকোভস্কির কবিতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন মিখায়েল। এসময় পেট্রোগ্রাদে টেনিয়ানোভ, আইখেনবাউম, স্কলোভস্কি প্রমুখ বিখ্যাত প্রকরণবাদী ভাবুকেরা উপস্থিত। কাব্যভাষা অধ্যয়নের জন্যে বিখ্যাত Opoyaz গোষ্ঠী উদ্ভূত হচ্ছে।

১৯১৬...: মিখায়েল পিটার্সবুর্গ রিলিজিয়াস-ফিলোসফিক্যাল সোসাইটিতে সদস্য হিসেবে গৃহীত হচ্ছেন। রুশ ঐতিহ্যের সঙ্গে বৃহত্তর ইউরোপীয় প্রেক্ষিত সম্পর্কে গভীর প্রীতি তৈরি হচ্ছে তাঁর। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ফাজেই এফ জেলিনস্কির প্রভাব তাঁর ওপর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। বহু বাখতিনীয় চিন্তাবীজের উৎস জেলিনস্কির ভাবনায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবছর ভিয়াচোশ্লাভ ইভানোভের প্রবন্ধসংকলন Furrows and Boundaries প্রকাশিত হচ্ছে, যার কাছে মিখায়েল ঋণ স্বীকার করেছেন।

১৯১৭...: রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটছে।

১৯১৮...: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হচ্ছে। মিখায়েল বাখতিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করছেন। এবছরের গোড়ায় নিকোলাই পেট্রোগ্রাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন; তাঁর প্রতিবিপ্লবী পর্যায় শুরু হচ্ছে। মিখায়েল তাঁর দাদার দীর্ঘায়ত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছেন। নিজস্ব ভাববৃত্ত রচনার সূচনা হচ্ছে। বছরের শেষে তিনি পেট্রোগ্রাদের তিন শ' মাইল দক্ষিণে, নেভেল নামে ছোট্ট মনোরম শহরে, চলে যাচ্ছেন। ইতিহাসই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে। এবছর অভূতপূর্ব শীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে ভয়াবহ করে তুলেছে।

১৯১৯...: 'শিল্প ও প্রত্যুত্তরযোগ্যতা' নামক প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে দি ডে অফ আর্ট পত্রিকায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। বিদেশি শক্তির আক্রমণে সামাজিক ভারসাম্য বিচলিত হচ্ছে। এই অস্থির পরিবেশে ম্যাক্সিম গোর্কির চেষ্টায় লেখক-গবেষক-বুদ্ধিজীবীদের জন্যে বিশেষ আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছে। খাদ্য-বস্ত্র-জ্বালানির যোগান পাচ্ছেন তাঁরা। কাগজের অভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা না হওয়াতে বিতর্ক ও মৌখিক প্রতিবেদনের ওপর গুরুত্ব

বাড়ছে। এসময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে ইভানোভের সঙ্গে লুনাচারস্কির প্রকাশ্য বিতর্ক হচ্ছে। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার মাত্রা বাড়ছে। বিপ্লব-বিরোধী বা সংশয়ী বুদ্ধিজীবীরা হাজতবাস এড়ানোর জন্যে মহানগর ছেড়ে মফস্বলে চলে যাচ্ছেন। বাখতিনের জীবিকা ও চিন্তা-জীবনের দীর্ঘ সংঘর্ষ শুরু হচ্ছে। সমকালীন মার্ক্সীয় ভাবনা ও আভাঁ গার্দ চিন্তাধারা : দুটি প্রবণতাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে অথচ কোনও পক্ষে তিনি যোগ দেননি। দু'বছর ধরে তিনি নেভেলের একটি জিমনাসিয়ামে শিক্ষকতা করেছেন। সেখানকার কয়েকজন তরুণ চিন্তাবিদদের নিয়ে বিচিত্র দার্শনিক বিতর্ক সংগঠিত করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা হচ্ছেন ভ্লাদিমির জিনোভিয়োভিচ রুগেভিচ, ভ্যালেন্টিন নিকোলায়োভিচ ভোলোশিকোভ, বোরিস মিখায়েলোভিচ জুবাকিন, লেভ ভ্যাসিলিয়েভিচ পুমপিয়ানস্কি, মারিয়া ভেনিয়ামিনোভনা যুদিনা, মাটভেই ইসায়েভিচ ফাগান প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকে বহুমুখী আগ্রহ সম্পন্ন ও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী।

১৯২০...: নেভেলের সত্তর মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছোট জনপদ ভিটেব্‌স্ক-এ চলে আসছেন বাখতিন। সেখানে সাংস্কৃতিক জীবন ঋদ্ধতর ছিল, আর খাদ্য সংকট তত তীব্র ছিল না। পরের বছর নেভেলের বৌদ্ধিক সমাবেশ পুরোপুরি ভেঙে যাচ্ছে কেননা নানা প্রয়োজনে কয়েকজন বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছেন। বাখতিন-চিন্তাবৃত্ত অবশ্য ভিটেব্‌স্ক-এ পুনর্গঠিত হচ্ছে। সেখানকার ভূমিপুত্র মার্ক্স শাগালের নেতৃত্বে দু'বছর আগে বামপন্থী শিল্পের চর্চাকেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। বিপ্লবোত্তর জীবন ও জগৎ রূপান্তরের ভাবনা গৃহযুদ্ধের নৈরাজ্যের মধ্যেই সেখানে বিকশিত হয়েছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন এবছর ভিটেব্‌স্ক শহরে এসেছেন। ইভান ইভানোভিচ সোলেরটিনস্কি ও পাভেল নিকোলায়েভিচ মেডভেডেভ—এই দু'জন বাখতিন-চিন্তাবৃত্তে বড়ো স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন। শহরের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাখতিন শিক্ষকতা করছেন। এছাড়া সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সংগঠনে তিনি সাহিত্য সহ নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। যে-বাড়িতে বাখতিন ঘর ভাড়া নিয়েছেন, সে-বাড়িতেই আরেকটি ঘরে রয়েছেন এলেনা আলেকজান্দ্রাভ্‌না ওকোলোভিচ। ভিটেব্‌স্ক-এর পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করছেন তিনি। এবছর বাখতিনের অস্থিপীড়া এমন চরম আকার ধারণ করছে যে তিনি প্রায়-পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। ডান পায়ের শল্য-চিকিৎসা করতে হচ্ছে, টাইফয়েডেও আক্রান্ত হচ্ছেন। কঠিন পীড়ায় এলেনের শুশ্রূষা দু'জনকে কাছাকাছি এনে দিচ্ছে। বছরের শেষ দিকে তাঁরা বিয়ে করছেন। এলেনার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে উঠছেন বাখতিন। এসময় 'নান্দনিক প্রক্রিয়ায় লেখক ও নায়ক' বিষয়ে একটি লিখন-প্রকল্প শুরু করেছেন তিনি।

১৯২১...: বাখতিনের দেখা-শোনা করার জন্যে নেভেল থেকে ভিটেব্‌স্ক-এ আসছেন ভোলোশিনোভ। তাঁর ভাবী স্ত্রী নিনা আর্কাডিয়েভ্‌না আলেক্সিভ্‌স্কায়ার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। নিনা ছিলেন তাঁর গৃহস্বামীর মেয়ে। রুগ্ন বাখতিনের ঘনিষ্ঠ

সহযোগী-সত্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকার নতুন পর্যায় শুরু হচ্ছে। এবছর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে সরকারি অনুদান বিপুল মাত্রায় কমতে শুরু করেছে। অতএব বেসরকারি প্রতিবেদনের বহুমাত্রিক গুরুত্ব স্পষ্ট হচ্ছে। অসস্থ শরীর নিয়েই প্রচুর পড়ছেন, নানা বিষয়ে অসংখ্য খসড়া তৈরি করছেন; বক্তৃতা দিচ্ছেন, লাগাতার চা ও সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে। ফেব্রুয়ারি মাসে কাগানকে চিঠিতে জানাচ্ছেন, 'শাব্দিক সৃষ্টির বিভিন্ন আকল্প' সম্পর্কিত বই লিখছেন তিনি। ভিটেব্‌স্ক-এর সংবাদপত্রে (মার্চ মাসে) জানানো হচ্ছে, বাখতিন নৈতিক দর্শন বিষয়ে বই লিখছেন।

১৯২২...: শাগালের পর যিনি ভিটেব্‌স্ক আর্ট আকাদেমির কর্ণধার হয়েছিলেন; সেই কাসিমির মালেভিচ সংস্থা থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে সমাজতান্ত্রিক শিল্পচেতনার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হচ্ছেন বাখতিন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-পরিসরে স্ত্রী এলেনা ক্রমশ সঞ্চালক হয়ে উঠছেন। জানুয়ারিতে কাগানকে চিঠিতে জানাচ্ছেন বাখতিন যে নৈতিক জীবন ও আইন পরিসরে বিষয়ীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছেন তিনি, যা নৈতিক দর্শন সম্পর্কিত বইয়ের ভূমিকা হিসেবে পরিকল্পিত। পেট্রোগ্রাদ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'দি লাইফ অফ আর্ট'-এর আগস্ট সংখ্যায় জানানো হচ্ছে যে বাখতিন ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কিত বই এবং শাব্দিক সৃষ্টির নন্দন বিষয়ে পুস্তিকা লেখা শেষ করেছেন।

১৯২৪...: বাখতিনের চিন্তা-জীবনে আদিপর্যায় শেষ হচ্ছে। পরবর্তী কালে যেসব রচনা 'প্রত্যুত্তরযোগ্যতার নির্মিতিবিজ্ঞান' নামক সামূহিক অভিধায় উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের বয়ান নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই সময়পর্বে। নিত্য সঙ্গী অসুস্থতা নিয়েই সৃষ্টিমুখর হতে পারছেন বাখতিন। কিন্তু নানা ধরনের জীবিকা সত্ত্বেও ছোট্ট শহরে খুব বেশি আয় করতে পারছেন না। এসময় তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়াতে পরিবার বাখতিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত দেশে উপার্জনের পথও খুব সহজ ছিল না। মস্কো, পেট্রোগ্রাদ বা অন্য কোনও মাঝারি মাপের শহরে বন্ধুদের চেষ্টা সত্ত্বেও শৈক্ষিক জীবিকার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। তবু প্রতিকূল পরিবেশেও অক্ষুণ্ণ থাকছে নতুন নতুন চিন্তাবীজের অঙ্কুরায়ন। এবছর, প্রয়াত হচ্ছেন লেনিন। বাখতিন ফিরে আসছেন লেনিনগ্রাদে।

১৯২৫...: পাঁচ বছর ব্যাপী বিপুল সৃষ্টিশীলতার সূচনা। এই সময়পর্বে *ফ্রয়েডীয় মতবাদ : মার্ক্সীয় সমালোচনা*, *সাহিত্যিক গবেষণায় প্রকরণবাদী পদ্ধতি*, *মার্ক্সবাদ ও ভাষাদর্শন* এবং *ডস্টয়েভস্কি ও তাঁর নন্দন*—এই চারটে প্রধান গ্রন্থ ছাড়াও বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। এসময় বাখতিন-চিন্তাবৃত্ত সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে। তবে সহযোগী সত্তাদের মধ্যে বৌদ্ধিক দ্বিরালাপের কোনও অভাব নেই। বাখতিনের অস্থিপীড়া এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ভাতার জন্যে তিনি মনোনীত হয়েছেন। তবু জীবিকার চিন্তা থেকে তিনি রেহাই পাননি কারণ বার্ষিক পুনর্বিবেচনায় ভাতা ক্রমাগত কমে

যাচ্ছিল। গৃহযুদ্ধের অবসান হওয়াতে শিল্প-সাহিত্য ও বৌদ্ধিক চর্চার জন্যে অবশ্য আর্থিক অনুদান পাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যমের বাইরেও কিছু কিছু প্রকাশন সংস্থা সক্রিয় থাকতে পারছে। কিন্তু নেভেল ও ভিটেব্‌স্ক-এর পরিস্থিতির প্রতিতুলনায় লেনিনগ্রাদের বৌদ্ধিক বর্গের মধ্যে বাখতিন প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন। কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। তাই সহযোগী বন্ধুদের নামে তাঁকে লেখা প্রকাশ করতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনও ইতর-বিশেষ হয়নি। লেনিনগ্রাদে আসার কয়েক মাস পরেই তাঁর ভাতা কমিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নিয়ে আসা হয়; আর ১৯২৯-এ চতুর্থ শ্রেণীতে। এসময় তাঁর মা প্যারিতে বড়ো ছেলে নিকোলাইকে বারবার চিঠিতে লিখছেন : মিশাকে (মিখায়েলের বাড়ির নাম) যতটা পারো সাহায্য করো। বেচারা বক্তৃতা দিয়ে ও ছাত্র পড়িয়ে মাসে পনেরো থেকে পঁচিশ রুবাল মাত্র আয় করতে পারছে। ১৯২৭ পর্যন্ত লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় প্রকাশন সংস্থায় অনিয়মিত কাজ পেয়েছেন বাখতিন। এছাড়া নানা বেসরকারি সভা-সমিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে কিছু কিছু রোজগার হচ্ছে। ১৯২৭ পর্যন্ত বন্ধুদের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এর পরে নির্দিষ্ট একটা বাসস্থান অবশ্য হয়েছে। এত অস্থিরতা ও দুর্বিপাক সত্ত্বেও বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের বৌদ্ধিক অবস্থান ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে।

১৯২৮...: স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের জন্যে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশেষত শিল্পায়ন ও কৃষিক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে ও মদ্যপানের মতো কুপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, ক্রমশ তার পরিধি নানাদিকে বিস্তৃত হচ্ছে। বুর্জোয়া মতবাদ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন।

১৯২৯...: খ্রিস্টীয় যাজকেরা বিশেষভাবে পীড়নের শিকার হচ্ছেন। লেনিনগ্রাদের বৌদ্ধিক কেন্দ্রগুলিতে প্রকরণবাদীরা সবচেয়ে বেশি বিপন্ন। অন্যান্য লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে পড়েছে। বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের শরিকেরাও নিপীড়ন এড়াতে পারেননি। ৭ জানুয়ারি স্বয়ং বাখতিন গ্রেপ্তার। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ : তিনি তরুণ প্রজন্মের মনকে বিদূষিত করছেন এবং রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারের পক্ষে তিনি আশঙ্কার কারণ। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তাঁর স্বাস্থ্যের এতদূর অবনতি ঘটছে যে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে গোর্কির প্রাক্তন স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে য়ুদিনা বাখতিনের ওপর আরোপিত শাস্তির মাত্রা কিছুটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছেন। গোর্কি ও ঔপন্যাসিক আলেক্সেই টলস্টয় বাখতিনের মুক্তির জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে তারবার্তা পাঠাচ্ছেন। ফলে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে

বছরের শেষে বাড়িতে অন্তরীণ করা হচ্ছে। এসময় এলেনাও চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেননি যাতে বাখতিনকে দশ বছরের জন্যে সোলোভেৎস্কি দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত না করা হয়। শেষ পর্যন্ত, তাঁকে কাজাখস্তানে কুস্তানাই শহরে ছ'বছরের জন্যে নির্বাসিত করা হচ্ছে।

১৯৩০...: বাখতিন স্ত্রীকে নিয়ে কুস্তানাই শহরে উপস্থিত হচ্ছেন। এসময় টলস্টয়ের তেরো খণ্ডে বিন্যস্ত সমগ্র সাহিত্য-রচনার দুটি খণ্ডের ভূমিকা লিখছেন বাখতিন। এই দুটি রচনায় তাঁর মার্ক্সীয় যুক্তিবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক আগের বছর প্রকাশিত ভ্লাদিমির প্রোপের *Morphology of the Folktale* বইয়ের যুক্তি-বিন্যাস বাখতিনের চিন্তা-প্রণালীকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। সর্বতোভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বাখতিন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেননি কেননা শিক্ষকতার বৃত্তি তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রী এলেনা নানা ধরনের কাজ করে সংসার চালানোর ব্যবস্থা করছেন।

১৯৩১...: এপ্রিল মাসের শেষে সরকার-নিয়ন্ত্রিত সমবায় কার্যালয়ে বাখতিন হিসাব-রক্ষকের কাজ পাচ্ছেন।

১৯৩৩...: জেলাপর্ষদে পরামর্শদাতার অতিরিক্ত কাজও তাঁকে দেওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে তাঁর উপর নিয়ন্ত্রণও কিছুটা শিথিল হয়ে আসছে। সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ না পেলেও অন্যান্য প্রায়োগিক বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। গৃহযুদ্ধের প্রাক্তন যোদ্ধা লালরক্ষীদের মধ্যে জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পারছেন। যৌথখামারের কৃষিজীবীদের মধ্যে নানা বিষয়ে ভাষণ দিয়ে নিঃসন্দেহে বৃহত্তর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন তিনি।

১৯৩৪...: সোভিয়েত ট্রেড নামক সরকারি পত্রিকায় নবার্জিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। ৪ আগস্ট সরকারিভাবে তাঁর নির্বাসনদণ্ড শেষ হলেও তিনি আরও কিছুদিন কুস্তানাইতে থাকছেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি চিকিৎসার প্রয়োজনে শুধু কিছুদিনের জন্যে লেনিনগ্রাদে যাচ্ছেন। ততদিনে তাঁর দুটি পা-ই পীড়ায় আক্রান্ত।

১৯৩৬...: লেনিনগ্রাদে দু'মাসের জন্যে গ্রীষ্মকালে আসার অনুমতি পাচ্ছেন বাখতিন। আগস্টে আবার মস্কো হয়ে কুস্তানাই-তে ফিরে আসছেন। উপন্যাসের প্রতিবেদন সম্পর্কে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে ইতিমধ্যে। সেপ্টেম্বরের শেষে কুস্তানাই-এর সরকারি সমবায় কার্যালয়ে ইস্তফা দিয়ে তাঁর প্রিয় শিক্ষকতার কাজে যোগ দিচ্ছেন সারান্স্ক শহরে। মুখ্যত পাভেল মেডভেডেভ-এর চেষ্টায় সেখানকার মোর্দোভিয়া পেডাগগিক্যাল ইন্স্টিটিউট-এ যোগ দিতে পেরেছেন। তখন সোভিয়েত পার্টির মধ্যে বিরাট উথাল-পাথাল শুরু হয়েছে। জিনোভিয়েভ ও ট্রটস্কির মতাবলম্বীর বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক সাহচর্য সেই পর্যায়ে পাওয়া খুবই কঠিন ছিল, নতুন পরিস্থিতিতে তা আরও দুরূহ হয়ে উঠছে। বিশ্বসাহিত্য বিভাগে বাখতিন একাই পাঠদান করছেন এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী পাঠ্যবস্তুও তিনি নির্বাচন করতে পারছেন।

লক্ষণীয়ভাবে শহরের পার্টি কমিটি দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সাহিত্যে ও শিল্পে পার্টি মানসিকতা সম্পর্কে লেনিন ও স্ট্যালিনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করছেন।

১৯৩৭...: বাখতিনের পরিচিত জনেরা আন্তঃপার্টি সংগ্রামে ক্ষমতাচ্যুত হওয়াতে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে। বাখতিনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা যদিও নেওয়া হয়নি, নতুন পরিস্থিতিতে খুব বেশি ভরসা রাখাও সম্ভব ছিল না। তাই ২০ জুলাই ইস্তফা দিয়ে সারান্স্ক থেকে চলে যাচ্ছেন বাখতিন। ২৬ ডিসেম্বর প্রয়াত হচ্ছেন বাখতিনের দীর্ঘদিনের বন্ধু কাগান। মস্কো হয়ে লেনিনগ্রাদে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, নতুন ভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা খুব প্রবল। তাই বছরের শেষে মস্কোর কাছাকাছি সাভেলোভো শহরে চলে যাচ্ছেন। জীবিকাহীন অবস্থায় কপর্দকশূন্য বাখতিন একমাত্র বন্ধুদের পাঠানো সাহায্যের ওপর ভিত্তি করে অত্যন্ত কষ্টে জীবন নির্বাহ করেছেন।

১৯৩৮...: অস্থিপীড়া এত মারাত্মক হয়ে পড়ছে যে ১৩ ফেব্রুয়ারি ডান-পা কেটে বাদ দিতে হচ্ছে। দু'মাস পরে হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পাচ্ছেন, তিনি তখন অবশিষ্ট জীবনের জন্যে পঙ্গু। বছরের শেষে দমন-পীড়ন মোটামুটি কমে আসছে।

১৯৩৯...: সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। এবছরের গোড়া থেকেই বাখতিনের বৌদ্ধিক জীবন আবার গতিময় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বিল্‌ডুঙ্গস্‌রোমান বা শিক্ষা বিষয়ক উপন্যাস ও বাস্তবতাবাদের ইতিহাসে তার তাৎপর্য সম্পর্কিত বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া উপন্যাসে সময়ের বিভিন্ন প্রকরণ ও ক্রনোটোপ এবং মানবিকী বিদ্যার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ তিনি সম্পূর্ণ করেছেন।

১৯৪০...: বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার জন্যে সমালোচনা লেখার কাজ পেয়েছেন বাখতিন। গবেষকদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বাড়ছে। মস্কোর বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কিত গোর্কি ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। এপ্রিলের শেষে শেক্সপীয়র আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রিত হচ্ছেন। এমনকী ১৪ অক্টোবর ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব বিভাগে উপন্যাসের প্রতিবেদন সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের প্রাক্‌-ইতিহাস সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রবন্ধটি লিখছেন।

১৯৪১...: মার্চের শেষে বিশিষ্ট সাহিত্য-মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। মহাকাব্য ও উপন্যাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখছেন। আর, গোর্কি ইন্‌স্টিটিউটে দাখিল করার জন্যে বাস্তবতাবাদের ইতিহাসে রাবেলের স্থান সম্পর্কে ডক্টরেট ডিগ্রির অভিসন্দর্ভ লিখছেন। ইতিমধ্যে জুন মাসে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। এতদিন নির্দিষ্ট কোনও জীবিকা ছিল না তাঁর। যুদ্ধ তাঁর অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সাময়িক ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে যদিও, স্থানীয় স্কুলগুলিতে জার্মান পড়ানোর জন্যে তিনি নিয়োজিত হচ্ছেন। ২৭ সেপ্টেম্বর চার মাসের মধ্যেই তিনি রুশ ভাষা শেখানোর সুযোগও পেয়ে

যাচ্ছেন। যদিও মাতৃভাষায় শিক্ষকতা করার অনুমতিপত্র তাঁর ছিল না, যুদ্ধপরিস্থিতি এই সুযোগ এনে দিচ্ছে।

১৯৪২...: ১৯ জানুয়ারি থেকে জার্মানের সঙ্গে রুশ ভাষায় শিক্ষকতা করার যে সুযোগ তিনি পেয়েছেন, ১৯৪৫-এর ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা বহাল থাকছে। এতে অবশ্য লেখার সময় অনেকটা কমে যাচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর মর্যাদা অনেকটা বাড়ছে।

১৯৪৪...: স্থানীয় পার্টি কমিটি তাঁকে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

১৯৪৫...: যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সারান্স্কের পেডাগগিক্যাল ইন্স্টিটিউটে পুরোনো পদে যোগ দিচ্ছেন। এমনকী ৬ জুলাই পদোন্নতি হচ্ছে তাঁর। সাধারণ সাহিত্য বিভাগের সভাপতি হিসেবে নিযুক্তি পাচ্ছেন। আর, ১৮ সেপ্টেম্বর আরও উচ্চতর পদে তাঁকে উন্নীত করা হচ্ছে। বাসস্থানের সমস্যা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্যে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করছে।

১৯৪৬...: সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরে ঝ্দানোভের যুগ শুরু। নভেম্বরে বাখতিন আবার রাবেলে সম্পর্কিত গবেষণার মৌখিক পরীক্ষা দিতে তৈরি হচ্ছেন। কার্নিভাল ও লোকায়ত হাস্যরস সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক বয়ান পরীক্ষকদের মতাদর্শগত রক্ষণশীলতার জন্যে সমস্যা তৈরি করছে। এক ধরনের উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদ প্রতীচ্যের তত্ত্বভাবনা সম্পর্কে অযৌক্তিকভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। ফলে বাখতিনের অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে নানা ধরনের আপত্তি উঠছে।

১৯৪৭...: মে মাসের শেষে বাখতিনকে যখন অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিগুলির প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে, ততদিনে সাংস্কৃতিক উদারনীতির অবসান হয়ে গেছে। সরকারি মতাদর্শের বিরোধিতা সম্পর্কে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাখতিনের অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাই ১৯৫১-এর জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে। ১২ সেপ্টেম্বরের আগে জানানো হয়নি যে কর্তৃপক্ষ বাখতিনকে ডক্টরেট ডিগ্রির পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁকে ক্যান্ডিডেট ডিগ্রি দিতে মনস্থ করেছে। আবার অক্টোবরে মরডোভিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েত বাখতিনকে দীর্ঘ পরিষেবার জন্যে শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করছে।

১৯৫২...: এবছর ২ জুনের আগে ক্যান্ডিডেট ডিগ্রিও তাঁকে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে বাখতিন তাঁর জীবিকা ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব নির্বাহ করছেন। বহু শৈক্ষিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন এবং অজস্র সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তৃতাও দিয়েছেন। বিশিষ্ট বাগ্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষণীয়ভাবে স্ট্যালিনের সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের বক্তৃতাও তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন এবং মার্ক্স-এঙ্গেলস্-স্ট্যালিন সম্পর্কে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ছাত্রদের কাছে তিনি শিক্ষক হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। দান্তে-শেক্সপিয়র-সার্ভেন্তেস্-সোফোক্লিস্ এবং নন্দনতত্ত্ব ও নাট্য ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা বিশেষ আকর্ষণীয় হত।

১৯৫৩...: এই সময় থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বাখতিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিরিখে

উত্তরোত্তর বিশেষ মর্যাদা অর্জন করছেন। বক্তৃতা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে খুব বেশি লেখার সময় তিনি পাননি। তবে The problem of speech genres শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হয়েছে। এ ছাড়া 'বাচনিক সৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব' সম্পর্কে বেশ কিছু খসড়াও পঞ্চাশের দশকের শেষে তৈরি হয়েছে। এবছর মার্চে স্ট্যালিনের মৃত্যু হওয়ার পরে বৌদ্ধিক পরিবেশ অনেকটা পাল্টে গেছে। বিশেষত নিকিতা ক্রুশ্চেভের সময় থেকে বৌদ্ধিক বর্গের মধ্যে নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। তবে বাখতিন সহজে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে পারেননি। রাজধানী মস্কো থেকে বহুদূরে থাকার ফলে মহানাগরিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর পরিচিতিও ঈপ্সিত মাত্রায় বিস্তৃত হতে পারেনি। কিন্তু যে-অভূতপূর্ব সম্মান তিনি সারান্‌স্কে পেয়েছিলেন, অন্য কোথাও তা পাননি। মাঝেমাঝে মস্কোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁর হত, পুরোনো দিনের সহযোগী বন্ধুরা সারান্‌স্কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা পাওয়ার উদ্যম তিনি কখনো গ্রহণ করেন নি।

১৯৫৫... : এবছর ছাপার অক্ষরে বাখতিন সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করছেন ভ্লাদিমির সেডুরো; এই মার্কিন গবেষক তাঁর একটি বইতে বাখতিনের ডস্টয়েভস্কি বিষয়ক বইটির আলোচনা করেছেন।

১৯৫৬... : প্রকরণবাদী হিসেবে একদা-সুপরিচিত রোমান য়্যাকবসন মে-মাসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনেল কমিটি অফ শ্লাভিস্ট দ্বারা প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের একটি প্রস্তুতিসভায় বাখতিনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

১৯৫৭... : বাখতিন যে-প্রতিষ্ঠানে পড়াতেন, সেই মোর্ডোভিয়ার পেডাগগিক্যাল ইনস্টিটিউট এবছর ১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। এর নতুন নামকরণ হয়েছে মোর্ডোভিয়ার ওগারেভ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রখ্যাত প্রকরণবাদী ভিক্টর শ্কলোভস্কি এসময় *Pro and Contra : Notes on Dostoevksy* বইতে বাখতিনের ডস্টয়েভস্কি-বিশ্লেষণের সপ্রশংস সমালোচনা করছেন। এভাবে তিন দশক পরে শ্কলোভস্কি ও বাখতিনের সৃজনশীল দ্বিরালাপ নতুনভাবে শুরু হচ্ছে। বস্তুত এই প্রথম কোনও সোভিয়েট রাশিয়ার চিন্তাবিদ বাখতিনের উল্লেখ করছেন।

১৯৫৮... : ১৪ মার্চ নবোন্নীত ওগারেভ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাখতিন রুশ ও বৈদেশিক সাহিত্য বিভাগের সভাপতি পদে উন্নীত হচ্ছেন। নতুন বাসস্থান তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট হচ্ছে। নিজের লেখাপত্র সম্পর্কে আরও সময় দেওয়ার কথা ভাবছেন। এমনকী, মস্কো বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিষয়ও বিবেচনা করছেন। কিন্ত অন্যদিকে তাঁর ব্যাধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্ত্রী এলেনার হৃৎ-পীড়ার সূচনা হচ্ছে। কয়েক বছর ধরেই তাঁরা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে মস্কো-সংলগ্ন স্বাস্থ্যনিবাসে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে আসছেন। অতএব সারান্‌স্ক শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। এবছর সেপ্টেম্বরে মস্কোয় অনুষ্ঠিত শ্লাভ-বিদ্যা অধ্যয়নের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে য়্যাকবসন তাঁর একটি প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমালোচনার বয়ান সভ্যদের মধ্যে বিলি

করেন। স্কলোভস্কির প্রাগুক্ত বইটি সমালোচনা করতে গিয়ে আলোচক বাখতিন সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছিলেন, তাতে প্রথম সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বাখতিনের নাম বিপুল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫৯...: এবছর য়্যাকবসনের নিবন্ধটি International Journal of Slavic Linguistics and Poetics-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বাখতিন আলোচিত হতে শুরু করেন। প্রকাশিত হওয়ার তিন দশক পরে ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কিত বইটিও যেন পুনর্জন্ম লাভ করে। এই ছাত্রদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ভাডিম ভালোরিয়ানোভিচ কোঝিনোভ, যিনি পরে রুশ কবিতা ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচুর বই রচনা করেন। গোর্কি ইনস্টিটিউটে স্নাতক শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি *ডস্কয়েভস্কি ও তাঁর নন্দন* বইটি খুঁজে পান। বাখতিন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে জানতে পারেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাখতিন শিক্ষক ছিলেন। সেখানকার পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে কোঝিনোভ বাখতিনের রাবেলে-সম্পর্কিত অভিসন্দর্ভটিও আবিষ্কার করেন। তিনি অবশ্য ধরে নিয়েছিলেন, বাখতিন আর বেঁচে নেই।

১৯৬০...: বাখতিনের অনন্য বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কোঝিনোভ-কে এতই চমৎকৃত করে যে তিনি বাখতিনের বইগুলি পুনঃপ্রকাশ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করেন। তাঁর সব চেষ্টাই সেবছর ব্যর্থ হয়। তবে একাজে তিনি দু'জন সতীর্থকে সঙ্গে পান : সের্গেই জর্জিভিচ বোচারোভ ও জর্জি ডিমিট্রিয়েভিচ গাচেভ।

১৯৬১...: বছরের গোড়ায় কোঝিনোভ আবিষ্কার করেন যে বাখতিন এখনও জীবিত। তখন শুরু হয় চিঠিপত্রে যোগাযোগ করার চেষ্টা। নিজের স্বভাব অনুযায়ী বাখতিন অবশ্য উত্তর দেননি। কিন্তু সংবেদনশীল এলেনা এই যোগাযোগের সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। ৬ জুন কোঝিনোভ এলেনার কাছ থেকে চিঠি পাচ্ছেন। তাঁর অনুরোধে কোঝিনোভ, বোচারোভ ও গাচেভ বাখতিনের সঙ্গে দেখা করতে সারান্স্কে যান। এরপর তাঁরা আরও বহুবার বাখতিন-দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বাখতিনের রূপকথাতুল্য পুনরুজ্জীবনের পালা শুরু। ধীরে ধীরে এই তিনজন গুণমুগ্ধ ছাড়াও নতুন নতুন তরুণ ভক্তেরা সারান্স্কে যেতে শুরু করছেন। ২৪ জুলাই রাখতিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার জন্যে কর্তপক্ষের কাছে অনুমতি চাইছেন। ইতিমধ্যে কোঝিনোভের সঙ্গে বাখতিনের আলোচনা শুরু হয়েছে কীভাবে ডস্টয়েভস্কি বিষয়ক বইটি পুনঃপ্রকাশ করা যায়। সুতরাং অবসরের জন্যে স্বাস্থ্যহানি কারণ হলেও বাখতিন আসলে পুনর্লিখনের জন্যে সময় দিতে চাইছিলেন। ডিসেম্বরের গোড়ায় রাবেলে-সম্পর্কিত অভিসন্দর্ভ নিয়েও দুজনের আলোচনা হচ্ছে। কোঝিনোভ অবশ্য ভাবছিলেন, আগে 'ডস্টয়েভস্কি ও তাঁর নন্দন' প্রকাশিত হলে দ্বিতীয় বইটি প্রকাশ করা সহজ হবে। কেননা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সরকারি অনুমোদন ছাড়া বই প্রকাশ করার পক্ষে বাধা ছিল অনেক।

১৯৬২...: সে-সময়কার বিখ্যাত সাহিত্য-গবেষক ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ টারবিন সারানস্কে যাচ্ছেন। বাখতিনের সঙ্গে আলাপ করে এত অভিভূত হচ্ছেন যে কিছুদিন পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সাফল্যপ্রসূ আলোচনাচক্রে তিনি বাখতিনের কথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করছেন। ফলে তাঁর ছাত্রী এল. এম. মেলিখোবা নিয়মিত ভাবে বাখতিনের কাছে যেতে শুরু করছেন। এবছর বাখতিনের লেখাপত্র প্রকাশ করার তাগিদ গুণমুগ্ধদের মধ্যে বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন। কোঝিনোভ ও বোচারোভ বাখতিনের বই প্রকাশ এবং তাঁর খসড়া পাণ্ডুলিপি দেখাশোনার কাজ করছেন, টারবিন তাঁকে মস্কোয় পুনর্বাসন দেওয়ার সমস্যা নিয়ে ভাবছেন এবং মেলিখোবা বাখতিন-দম্পতির স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রয়োজন দেখাশোনা করছেন। এর আগের বছর কোঝিনোভ ডস্টয়েভস্কি বিষয়ে পরিমার্জিত বইটি প্রকাশ করার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করে গেছেন। ইতালীয় প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিপত্র মস্কোর কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে তাঁদের প্রভাবিত করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি। নানা টালবাহানার পরে শেষপর্যন্ত তাঁর উদ্যম সার্থক হচ্ছে। বইটির প্রকাশ ত্বরান্বিত করার জন্যে কোঝিনোভ সংবাদপত্রের মধ্য দিয়েও প্রচার চালিয়েছেন।

১৯৬৩...: ২৬ সেপ্টেম্বর বাখতিন কোঝিনোভকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন যে তিনি *ডস্টয়েভস্কি ও তাঁর নন্দন*-এর নতুন সংস্করণের আগাম কপি পেয়ে যাবেন। কোঝিনোভের অদম্য চেষ্টার ফলে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পেরেছে।

১৯৬৪...: একটি বিশেষ সন্ধ্যায় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে রাবেলে-সম্পর্কিত বইটি সহ অন্যান্য রচনা প্রকাশের উদ্যমও চলছে। পরিমার্জনের কাজে কোঝিনোভ সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছেন বাখতিনকে।

১৯৬৫...: বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পরেও সারানস্কের বাইরে আসা সম্ভব হয়নি মূলত আবাসন সম্পর্কিত সোভিয়েত নিয়মের জন্যে। ততদিনে তিনি অবশ্য ছাত্র ও সমকর্মীদের কাছে ঈশ্বরপ্রতিম হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্যে বাখতিন তাদের সময় দিতে কার্পণ্য করেননি। এদিকে স্বাস্থ্য ক্রমশ বেশি উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। এবছর নভেম্বরে কোঝিনোভকে লেখা একটি চিঠিতে পরিমার্জনের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বাখতিন।

১৯৬৬...: বাখতিন ও এলেনা—দুজনেরই স্বাস্থ্যর দ্রুত অবনতি ঘটছে। বাড়ির বাইরে যাওয়া ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। তাঁর অন্য পা-ও পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছে। এবছর দু'জনকেই বেশ কয়েকবার হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে গুণমুগ্ধদের সাহায্য যদিও অবারিত ছিল। মস্কোর তরুণ শিষ্যেরা বুঝতে পারছেন যে দম্পতিকে এবার মস্কোয় উপযুক্ত পরিচর্যার মধ্যে রাখতে হবে। নিজের উদ্বেগজনক হৃদ্‌পীড়া সত্ত্বেও এলেনা সমস্ত কাজই নিজে করতে চাইতেন। গার্হস্থ্য কাজে গুণমুগ্ধদের কোনও ধরনের সাহায্য তিনি নিতে

চাইতেন না। এই দম্পতির পারস্পরিক অনুরাগ এত প্রগাঢ় ছিল যে চিকিৎসার প্রয়োজনেও দু'জনে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইতেন না।

১৯৬৭-৬৮ : একদিকে দম্পতির পীড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে সারান্স্ক থেকে তাঁদের মস্কোয় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলেছে। এই অবস্থাতেও বাখতিন পড়ছেন, পুরোনো খসড়া সংশোধন করছেন।

১৯৬৯...: পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি আন্দ্রোপোভ তখন রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কে জি বি-এর প্রধান। তাঁর মেয়ে টারবিনের আলোচনাচক্রে বাখতিনের কথা জেনেছেন। তিনি বাবাকে রাজি করালেন যাতে মস্কোর ক্রেমলিন হাসপাতালে বাখতিন ও এলেনাকে চিকিৎসা করানো যায়। স্পষ্টত তা ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে সংরক্ষিত। অক্টোবরে বাখতিন-দম্পতিকে ক্রেমলিন হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই অবস্থাতেও বাখতিন তাঁর লেখার কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

১৯৭০...: নিয়ম অনুযায়ী বাখতিনদের দীর্ঘদিন ক্রেমলিন হাসপাতালে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৫ মে তাঁরা মস্কোর খুব কাছেই একটি বৃদ্ধাবাসে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। এই নতুন বাসস্থান খুব সুবিধাজনক না হলেও যথারীতি বাখতিনের পড়াশোনা অব্যাহত। এবছর তাঁর পঁচাত্তরতম জন্মদিনে তিনি প্রচুর শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছেন। ফলে স্থানীয় মানুষদের কৌতূহল মেটাতে এত অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। আগস্টের এই বক্তৃতাই তাঁর জীবনের শেষ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান।

১৯৭১...: এলেনার হৃদ্‌পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করছে। নভেম্বরের শেষে তাঁকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। সেখানেও দম্পতিকে একসঙ্গে রাখার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অবশেষে ১৩ ডিসেম্বর রাত্রে বাখতিনের চিরসঙ্গিনী এলেনা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন। মৃত্যুর একটু আগেও স্বামীর জন্যে চা তৈরির কথাই ভাবছিলেন তিনি। এলেনার মৃত্যু বাখতিনের বেঁচে থাকার ইচ্ছাই শুষে নিয়েছে। শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে সোভিয়েত লেখক সংঘের সদস্য হতে অনুরোধ করছেন। কেননা এতে আবাসন ও চিকিৎসার সমস্যা অনেকটা সমাধান হবে। বছরের শেষে নতুন বাসস্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১৯৭২...: মস্কোয় বাখতিনকে যাতে স্থায়ী আবাসিক বলে গণ্য করা হয় এজন্যে শুভানুধ্যায়ীরা রীতিমতো প্রচার আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাঁদের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত ৩১ জুলাই বাখতিনের বাসস্থান নির্দিষ্ট হচ্ছে। বই থেকে পাওয়া লভ্যাংশ এবং এলেনা দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে লেখক সংঘের একটা বাসগৃহ কিনে নেওয়া হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের সমস্ত সাহিত্যবোদ্ধার কাছে বাখতিন কার্যত ভাববিগ্রহে পরিণত হয়েছেন।

১৯৭৩...: মুখ্যত কোঝিনোভের চেষ্টায় সারান্স্ক থেকে আরও কিছু পুরোনো পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। শুভানুধ্যায়ীদের সমবেত চেষ্টায় কিছু কিছু প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। অসুস্থতার মধ্যেও বাখতিন নিজে পরিমার্জনের কাজ

করছেন। এবছর গ্রীষ্মে সময়-প্রকরণ ও ক্রনোটোপ সম্পর্কিত প্রতিবেদনের উপসংহার লিখেছেন। গোর্কি ইনস্টিটিউটের পত্রিকা *কনটেক্সট*-এর কর্ণধারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। স্কলোভস্কি তখনও জীবিত; বাড়ি কাছাকাছি বলে প্রায়ই বাখতিনের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

১৯৭৪...: সাহিত্য-গবেষণার পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখছেন তিনি। এবছরেই তা *কনটেক্সট* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটাই তাঁর জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত শেষ নিবন্ধ। বছরের শেষে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় বাড়িতে দিন-রাত নার্সের ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তিনি গোগোল সম্পর্কিত একটি নতুন বইয়ের কাজ শুরু করেছেন। এবং ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কিত আরেকটি বইয়ের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করছেন। স্বভাবত এই দুটি রচনাপ্রকল্পের কিছু কিছু খসড়া মাত্র পাওয়া গেছে। এসময় নানা বিষয়ে বহু চিন্তা তিনি সূত্রাকারে রেখে গেছেন। তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে মৌলিক চিন্তনের গভীরতা আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আগস্ট মাসের পরে অবশ্য বাখতিনের ফুসফুসের পীড়া এত সঙ্কটজনক হয়ে উঠছে যে তিনি আর লেখার কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন না।

১৯৭৫...: ৭ মার্চ রাত দুটোয় বাখতিনের দেহাবসান। মৃত্যুর আগে তাঁর অন্তিম উচ্চারণ : 'আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।' সারা জীবন ধরে দ্বিবাচনিকতার কর্ষণ যাঁর একমাত্র ধর্ম, তাঁর উচ্চারণে অমেয় ঈশ্বর নয়, প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা সম্পন্ন অপর পরিসরের সঙ্গে সংযোগের অন্তহীন সম্ভাবনাই দ্যোতিত হয়েছে। দু'দিন পরে ৯ মার্চ, তাঁকে এলেনার পাশেই সমাহিত করা হয়। শেষকৃত্যে উপস্থিত রয়েছেন স্কলোভস্কি এবং বাখতিনের প্রিয় শিষ্য-ত্রয়ী কোঝিনোভ, বোচারোভ ও গাচেভ। তরুণ প্রজন্মের কাছে বাখতিন যুগস্রষ্টা গুরুর মর্যাদা পেয়েছেন বলে তাঁর মৃত্যু আলোড়ন তৈরি করেছে। যিনি বিশ্বাস করতেন, দ্বিবাচনিকতার পরিসর অনন্ত, তাঁর মরজীবনের অবসান হওয়ার পরেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে চিন্তাজীবনের পরম্পরা। তাই বিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে তাঁর বইয়ের প্রকাশনা—রুশ ও ইংরেজি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়।

জীবন সন্ধানের তাত্ত্বিক

প্রতিটি তাৎপর্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয় : এই উচ্চারণ যাঁর, সেই মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন জীবন ও তত্ত্বের যুগলবন্দি রচনা করেছেন যেন। সোভিয়েত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর জীবন প্রবাহিত হয়েছে বলে একদিকে তাঁর জীবনযাপন এবং অন্যদিকে তাঁর ভাববিশ্ব বিচিত্র উচ্চাবচতায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৫ সালের ১৬ নভেম্বর যে-যাত্রার সূচনা হয়েছিল,১৯৭৫ সালের ৭ মার্চ তাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। বাখতিনের চিন্তাসূত্র অনুযায়ী তাঁর জীবনের ঐ সমাপ্তিও আপাত-সমাপ্তি মাত্র, অন্তত অবসান নয় কোনো। কেননা বাখতিনের জীবন-ব্যাপী সন্ধান ও সংগ্রামের তাৎপর্য মৃত্যুর দ্বিবাচনিক দর্পণে আমাদের কাছে আজ ক্রমশ নতুন প্রতীতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বাখতিনের তত্ত্ব-ভাবনায় কোনো নির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক প্রকরণ নেই, এ নিয়ে আক্ষেপেরও কারণ নেই কিছু। এত অজস্র বিনির্মাণ ঘটেছে বাখতিনের সময়ে ও সমাজে যে, কোনো ধরনের রৈখিকতা তাতে আরোপ করা অসম্ভব। ইতিহাসের ছন্দে যেহেতু তাঁর ব্যক্তিজীবনের লয়ও গাঁথা হয়ে গেছে, বাখতিন বারবার জিজ্ঞাসা ও সত্যকে পরখ করে দেখেছেন। জেনেছেন, এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে প্রবহমান জীবনে অনুসন্ধিৎসাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো দায়। রৈখিকতার নিয়ম তাতে বজায় থাকল কি থাকল না এবিষয়ে উদ্বিগ্ন তিনি ছিলেন না কখনো।

অবশ্য এতে গবেষক ও ভাষ্যকারদের প্রচুর অসুবিধে হয়েছে, সংশয়ও জেগেছে নানা রকম। এতবার যিনি নিজেকে ভেঙেছেন, তাঁর কোন্ বিশ্বাসকে প্রধান বলে মনে করব এবং কোনগুলিকে তুলনামূলকভাবে মনে করব অপ্রধান—এবিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে জোর বিতর্ক চলছে। তাছাড়া বাখতিনের চিন্তা যেহেতু নানাধরনের তত্ত্ব-কথার সীমানাকে ছুঁয়ে গেছে, সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে তাঁর বক্তব্য বিচিত্রভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হচ্ছে। অনেক সময় বাখতিনের সামগ্রিক ভাববিশ্ব আড়ালে পড়ে যাচ্ছে, বড়ো হয়ে উঠছে কোনো উজ্জ্বল ও সুনির্বাচিত বিচ্ছিন্ন অংশ। ছ'জন অন্ধের হাতি দেখার বিখ্যাত গল্পটা এখানে হয়তো মনে আসে। সত্যের দ্বিবাচনিক স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় যিনি ক্লান্তিহীন ছিলেন, তাঁর তত্ত্ববিশ্বের সঙ্গে জীবনের সমান্তরাল অবস্থান কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ সে-কথা ভালোভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। স্বভাবত বাখতিনের জীবনব্যাপী আত্ম-উন্মোচন এবং সেই সূত্রে বিশ্ব-উন্মোচন আমাদের মনোযোগের বিষয় হতে পারে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর প্রধানতম বক্তব্য এই যে পার্থক্য ও সমান্তরালতার উপলব্ধি অস্তিত্বের মৌল প্রাক্‌শর্ত। এর কারণ, বাখতিন জীবন-ব্যাপী অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিলেন, একটি জগৎ থেকে ক্রমাগত উঠে আসে অনেক জগতের আদল এবং এক জীবনের অন্তরালে রয়ে যায় অজস্র বিকল্প-জীবনের সম্ভাবনা। স্বভাবত এদের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে, তাৎপর্য এক নয়, অনেক। এই অনেকান্তিকতা ভেঙে দিচ্ছে সব রৈখিকতা এবং একবাচনিক আয়তন। ফলে জীবন থেকে যে-প্রতিবেদন গড়ে উঠছে অহরহ, তার মধ্যে একক উচ্চারণ অসম্ভব। দৃষ্টিকোনের ভিন্নতা থেকে অনিবার্যভাবে জেগে উঠছে

উচ্চারণের বহুত্ব। বস্তুত সাম্প্রতিক পৃথিবীতে মিখায়েল বাখতিনের মতো খুব কম চিন্তাবিদই পার্থক্যের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন অস্তিত্বের সমান্তরাল অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। উচ্চারণের বহুত্ব তাঁর বিশ্বাসের বিষয় ছিল না কেবল, তাঁর জীবনের অজস্র আপাত-স্ববিরোধিতা ও কূটাভাসের মধ্যেও অনেকার্থ-দ্যোতনার প্রত্যয় অদ্ভুতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বাখতিনের ভাববিশ্বে একক অস্তিত্ব যতখানি সত্য, ঠিক ততখানি অনিবার্য অনেকের প্রাসঙ্গিকতা। সম্ভবত এইজন্যে সারা জীবন ধরে তিনি মানবিক বিদ্যার নানা বিচিত্র পথে বিচরণ করেছেন। কোথাও তিনি নব্য-কান্টবাদী দর্শনের ঐতিহ্য স্বীকার করে নিয়েছেন, কোথাও মার্ক্সীয় চেতনার অনুষঙ্গে নিজের যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন, আবার কোথাও একধরনের বস্তু-অতিযায়ী চিন্তা দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন। সুতরাং অনেকটা মৌলিকস্তরেই, পাঠকৃতির গভীরে, একাধিক বাখতিনের অবয়ব ফুটে উঠেছে; এইজন্যে বাখতিন-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দেখা যায় পরস্পর-বিরোধী অবস্থান। আর, এই সংশয়ের জন্যে বরং বাখতিনকে দায়ী করতে হয়। কেননা লেনিনগ্রাদে থাকার সময়ে যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, এমন কয়েক জনের নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। অবশ্য এ সম্পর্কেও কোনো নিঃসন্দিগ্ধ অবস্থানে পৌঁছানো সহজ নয় আজও।

একুশ শতকের সূচনা-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বিশ শতকের প্রধান চিন্তাবিদদের মধ্যে বাখতিন অন্যতম নন শুধু, অগ্রণীও। বিশেষত গত কয়েক বছরে মানবিক চিন্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে প্রথাগত সীমানা যখন দ্রুত মুছে যাচ্ছে, সে-সময় বাখতিনের চিন্তা অনুসরণ করে আমাদের মনে হয়, তিনি বুঝিবা মানববিশ্বের এই সম্ভাবনার দিকে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। সংশয়-পীড়িত এক সময়-পর্বে থেকেও জীবন ও মননের সমাপ্তিবিহীন সন্দর্ভ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। এইজন্যে ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ঐতিহাসিক নন্দনতত্ত্ব, সত্তা-সম্পর্কিত দার্শনিক জিজ্ঞাসা—এই সবই তাঁর প্রতিবেদনে আত্তীকৃত হয়েছে। নব্য কান্টবাদ, প্রকরণবাদ, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব যেমন তাঁর কৌতূহল আকর্ষণ করেছে, তেমনি ডস্কয়েভস্কি, গ্যয়ঠে, রাবেলের মতো সাহিত্যস্রষ্টা সম্পর্কে তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণ সমালোচনা-তত্ত্বের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সাম্প্রতিক পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব, নারীচেতনাবাদ ও আকরণোত্তরবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বাখতিনের বক্তব্য পুনঃপাঠ করে নতুন নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করে চলেছে। স্বভাবত আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বাখতিনের বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রচ্ছন্ন অনেকার্থদ্যোতনার স্বরূপ ঠিক কী যার ফলে নৃতত্ত্ববিদ, লোকতত্ত্ববিদ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা তাঁদের নিজস্ব জিজ্ঞাসার সূত্র ও সমর্থন বাখতিনের বিভিন্ন সন্দর্ভে খুঁজে পাচ্ছেন? এই প্রশ্নের জবাব পেতে চাই যদি, তাঁর জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক কীভাবে নানা স্বরন্যাসে ব্যক্ত হলো—তা সতর্কভাবে বুঝে নিতে হবে।

আসলে বাখতিন পৌঁছাতে চান মানবিক চেতনার এক অনন্য সমবায়ী অভিব্যক্তিতে যাকে বলা যেতে পারে 'দার্শনিক নৃতত্ত্ব'। বিভিন্ন উৎস-জাত স্রোতোধারা এসে মিলিত হোক ঐ মোহনায়, এই চেয়েছেন তিনি। সমস্ত কিছুর ওপরে বাখতিন গুরুত্ব আরোপ করেছেন মানবিক উচ্চারণের সামাজিক স্বভাবে কেননা তাঁর অস্খলিত প্রত্যয় এই যে,

কথ্য বা লেখ্য— যে-রূপেই প্রকাশ হোক না কেন, সমস্ত উচ্চারণই উৎসে-বিকাশে-পরিণতিতে সামাজিক। বিপুল ও নিরবচ্ছিন্ন দ্বিবাচনিকতার প্রক্রিয়ায় মানুষের উচ্চারণ লক্ষ্যের দিকে ছুটে যায় এবং খুঁজে পায় ঈপ্সিত পরিসর। এই প্রক্রিয়া জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, তাই সক্রিয় ভাবে যারা তাতে যোগ দেয় কিংবা নিষ্ক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কেবল—নানা উচ্চারণের বহুমুখী বিচ্ছুরণে তারা প্রত্যেকে অনিবার্যভাবে সামাজিক প্রতাপ ও আধিপত্যের যুক্তিশৃঙ্খলায় সংযুক্ত হয়ে পড়ে। কোনো প্রতিবেদনকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, এই হলো বাখতিনের মৌলিক পাঠ। স্বভাবত এই সূত্র অনুযায়ী বাখতিনের নিজস্ব উচ্চারণকেও দেখতে হয় তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানের সঙ্গে দ্বিবাচনিক সম্পর্কের বিন্যাসে। বস্তুত বাখতিনের মহাসূত্র হলো, সত্য দ্বিবাচনিক। যে-সমস্ত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা অন্যদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে চাই, তাদের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য, শক্তি ও গুরুত্ব সর্বদা নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। বাখতিনের উচ্চাবচ জীবন-বৃত্তান্তের দিকে যদি তাকাই, এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাখতিন একে বলেন উচ্চারণের অনিবার্য যথাপ্রাপ্ত স্থিতি। সামাজিক জীবনের জটিল গ্রন্থি এবং দ্বন্দ্বময় ঐতিহাসিক সময় প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে স্বতন্ত্র করে দেয়। বাখতিনও এর ব্যতিক্রম নন।

দুই

ক্যাটেরিনা ক্লার্ক ও মাইকেল হলক্যুইস্ট-এর অন্তর্দীপ্ত গবেষণার ফলে আমরা বাখতিনের বৌদ্ধিক জীবন সম্পর্কে যে-চমৎকার বইটি পেয়েছি (১৯৮৪), তার ফলে বাখতিন এবং তাঁর চিন্তাবৃত্ত সম্পর্কে পরবর্তী বিশ্লেষণী বিস্তারের পথ সুগম হয়েছে। এক জীবনে জন্ম-জন্মান্তর ঘটে যাওয়ার কথা বাঙালি পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছেন। এই উচ্চারণকে নিছক ভাবুক কবির অতিরেক বলে ধরে নিতে পারেন অনেকেই। কিন্তু যখন লক্ষ করি, বাখতিনের নাটকীয় জীবনপ্রবাহে এই উচ্চারণ অনেকখানি সত্য হয়ে উঠেছিল—বিস্মিত না হয়ে পারি না। চীনা সমাজে বয়স্কজনেরা নাকি এই আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন, 'আগ্রহ উদ্দীপক (অর্থাৎ ঘটনাসংকুল) সময়ে তোমাদের যেন বাঁচতে না হয়!' অথচ বাখতিনকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল ঠিক সেরকম সময়েরই আবর্তে যখন রুশদেশের সমাজ, বাস্তবতা, ভাবাদর্শ—সমস্ত ভূমিকম্প ও ঝড়ের যৌথ আলোড়নে উথাল-পাথাল হয়ে যাচ্ছিল। রাশিয়ায় যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটছিল, সেই ১৯১৭-তে বাখতিনের বয়স বাইশ; স্পষ্টত বিপ্লবের দিনগুলিতে তিনি এর অনিশ্চয়তা ও উত্তাপ, সংশয় ও স্বপ্ন—সব কিছুর শরিক হচ্ছিলেন। নতুন ধরনের পুনর্নির্মাণের উদ্দীপনাকে বোঝার জন্যে বিপুলভাবে আত্মবিনির্মাণও যে করতে হচ্ছিল তাঁকে, একথা অনুমান করা কঠিন নয়। তারপর এল গৃহযুদ্ধের দুরূহ দিনগুলি; সেই পর্ব শেষ হতে না হতেই দেখা দিল স্ট্যালিনবাদের প্রাথমিক পর্যায়। ত্রিশের দশকে নেমে এল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্ধকার এবং তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জার্মান আক্রমণ। হিমযুদ্ধের পর্বে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা হলো প্রবলতর; স্ট্যালিন-পরবর্তী রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভের নয়া জমানাও দেখলেন বাখতিন। আর, মৃত্যুর আগে, ব্রেজনেভের পর্যায়ে রুশ-সমাজে অবসাদের বিস্তারও তিনি দেখে

গেছেন। এত সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে পৌঁছানো অবিস্মরণীয়। সুতরাং বাখতিনের উচ্চারণকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমিক পালাবদলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ না-করে উপায় নেই। এ তাঁর গভীর উপলব্ধিতে অর্জিত আবিষ্কার যে, প্রতিটি তাৎপর্যকে আত্মস্থ করতে হয় নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর ক্রমিক বিবর্তনকে বোঝার জন্যেও চাই সামাজিক ইতিহাসের নিবিড় পরিচয়, প্রেক্ষিতের সঙ্গে সত্যের সম্পর্কের গুরুত্ব বিচার। তাঁর চেয়ে বেশি আগ্রহ-উদ্দীপক, ঘটনাসংকুল সময়ে কে বেঁচেছিলেন আর! তাঁর মতো এত বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়েও আর কাউকে যেতে হয়নি।

বিশের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার বৌদ্ধিক সমাজে বাখতিন ছিলেন নিতান্ত প্রান্তিক ব্যক্তিত্ব; কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। শুধুমাত্র কয়েকজন সহযোগী বন্ধু ও গুণমুগ্ধ জনের কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম মৌল নির্যাস—'প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা' আর 'অস্তিত্ব কখনো স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়,' 'অস্তিত্বকে অপর সত্তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়'—এসব জীবনের দুরূহ পর্বের উপলব্ধি থেকেই আহরণ করেছিলেন তিনি। বস্তুত জীবনকে যে বাখতিন 'উপন্যাসত্ব' বলেন এবং বারবার শৈল্পিক প্রতিবেদন ও জীবনের সন্দর্ভকে অভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, এর সূত্রও রয়েছে এখানে। ত্রিশের দশকের প্রথম কয়েক বছর তাঁকে কাজাখাস্তানে রাজনৈতিক কারণে নির্বাসন ভোগ করতে হয়; ১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ সামান্য সময়ের জন্যে তিনি মোর্দোভিয়ায় একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। অর্থাৎ এই দশকটা তাঁকে কাটাতে হয় বৌদ্ধিক চর্চার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতায়। এর পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত বাখতিন মস্কোর নিকটবর্তী একটি ছোট্ট শহরে দিন কাটিয়েছেন। সম্ভবত এইজন্যে রুশ বুদ্ধিজীবীদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তিনি এড়াতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের পরে অবশ্য তিনি মোর্দোভিয়ায় ফিরে যান এবং ১৯৬১-তে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত শিক্ষকতাই ছিল তাঁর জীবিকা। এই উথাল-পাথালের মধ্যেও বাখতিন কিন্তু কখনো বৌদ্ধিক জীবনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হননি। লাগাতার তিনি লিখে গেছেন যদিও তাদের খুব কম অংশই ছাপা হয়েছে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে একটি অখ্যাত সংবাদপত্রে ছোট্ট নিবন্ধ ছাপানো ছাড়া স্বনামে তিনি কিছুই প্রকাশ করেননি। সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়ায় বিশেষ পরিস্থিতি এবং তাঁর অবস্থানগত জটিলতার জন্যে অনিবার্য আড়াল তাঁকে তৈরি করতে হয়েছিল। এই পর্বে ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনদের নাম তিনি ব্যবহার করেছেন যাতে রচনা প্রকাশে কোনো অসুবিধা না হয়। অবশ্য এতে বাংলা সাহিত্যের 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'র মতো, কিংবা তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল, 'বাখতিন-সমস্যা' তৈরি হয়ে গেছে এবং বিশেষজ্ঞরা পুরোপুরি দুটি দিকে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

এ বিষয়ে আরো কিছু বলার আগে বাখতিন সংক্রান্ত অন্যান্য জরুরি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ায় বাখতিন কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকের শেষে দু'তিন জন নাছোড়বান্দা গবেষকের কল্যাণে যেন মৃত্যুর দূরত্ব থেকে ফিরে এলেন তিনি জীবনে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এধরনের পুনর্বাসন, বলা ভালো নবজন্ম গ্রহণ, নিতান্ত বিরল ঘটনা। এরপর যা ঘটল, তার মধ্যে

যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে রূপকথার দ্যোতনা। যেন বা বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় উপায়ে বাখতিনের জীবন তাঁর তত্ত্বের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠল : সমাপ্তি বলে কিছু নেই কোথাও, নেই কোনো চূড়ান্ত বিন্দু। তা না-হলে অনেকদিন আগে—সেই ১৯২৯-এই তাঁর জীবন রূঢ় অকাল-সমাপ্তিতে শেষ হতে পারত। ঐ বছর বাখতিনের ডস্টয়েভস্কি-বিষয়ক বিখ্যাত বইটি স্বনামে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই লেনিনগ্রাদের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর মতো বাখতিনকেও গ্রেপ্তার হতে হলো। স্ট্যালিনের শাসনকালে তাঁর একটি মাত্র নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল যদিও সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। ত্রিশের দশকের শেষে বাখতিন রাবেলে সম্পর্কে গবেষণা নিবন্ধ লিখে সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের মূলস্রোতে পুনঃপ্রবেশ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু নানা অজুহাতে ঐ নিবন্ধের স্বীকৃতি কয়েক বছর পিছিয়ে গেল। এমন কি স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও বাখতিনের প্রকাশনাভাগ্য খুব একটা পাল্টায়নি। মোর্দোভিয়ার পরিচিতি কাজে লাগিয়ে তিনি একটি দু'টি নিবন্ধ মাত্র ছাপতে পেরেছিলেন। সুতরাং ১৯২৯-এর পরে বৌদ্ধিক জগতের কাছে বাখতিন কার্যত ছিলেন অস্তিত্বহীন। ষাটের দশকের গোড়ায় অবস্থাটা নাটকীয়ভাবে বদলে গেল। মূলত তিন-চারজন অনুরাগীর প্রবল চেষ্টায় ১৯৬৩-তে ডস্টয়েভস্কি-বিষয়ক বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল এবং ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হলো রাবেলে-বিষয়ক বইটি। অতিদ্রুত বাখতিন তরুণতর প্রজন্মের কাছে হয়ে উঠলেন নতুন ভাবনা-প্রস্থানের কৃষ্টি-নেতা। শুরু হলো অতীতের বিলীয়মান দিগন্ত থেকে বাখতিনের পুনরাবিষ্কার এবং তাঁর চিন্তাবৃত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁর এই বিস্ময়কর পুনর্বাসনের চেয়ে ইংরেজি-জানা দুনিয়ায় আবিষ্কার অনেক বেশি আশ্চর্যজনক। ১৯৬৮-তে *রাবেলে ও তাঁর জগৎ* প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রতীচ্যের ভাববিশ্বে অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। প্রকৃতপক্ষে গত চল্লিশ বছর ধরে বাখতিনের প্রভাব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে গেছে। রাশিয়ায় ও বহির্বিশ্বের গবেষকদের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাঁর বিভিন্ন বই ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছে এবং তাঁর ভাববৃত্ত বিশ্লেষণে ও পুনর্বিশ্লেষণে ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলেছে। সাহিত্যতত্ত্ব ছাড়াও ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্বের বিচিত্র ক্ষেত্রে এবং নারীচেতনাবাদ, উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ, আকরণোত্তরবাদ প্রভৃতিতেও দেখা যাচ্ছে দিগন্ত-বিস্তারের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বাখতিনের জীবনের নানা অনুপুঙ্খ এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের নানা স্তর পুরোপুরি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বস্তুত বাখতিন আজ এক নন, অনেক। তাই লেনিনগ্রাদের দিনগুলিতে বাখতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত পাভেল নিকোলায়েভিচ মেডভেডেভ (১৮৯১-১৯৩৮) ও ভ্যালেনটিন নিকোলায়েভিচ ভোলোশিনোভ (১৮৮৪/৮৫-১৯৩৬) যদিও তিনটে বই-এর রচয়িতা, তাঁদের ঘিরে এখন গড়ে উঠেছে বিচিত্র এক রহস্য-বলয়। কেননা মনে করা হচ্ছে যে ঐ বইগুলি আসলে বাখতিনেরই লেখা এবং ভোলোশিনোভ ও মেডভেডেভ রচনা-প্রক্রিয়ায় নামমাত্র অংশ নিয়ে থাকবেন। স্বভাবত পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসার আগে দৃঢ় তথ্যের যে জরুরি সমর্থন প্রয়োজন, তা এখন আর পাওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং বাখতিন ও বাখতিনের পত্নী কিছু কিছু সাক্ষাৎকারে যে-সমস্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেইটুকুই আজ আমাদের একমাত্র ভরসা। বিশ ও ত্রিশের

দশকে মেডভেডেভ ও ভোলোশিনোভ মোটামুটি সামাজিক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত সমাজের প্রবল বাত্যা-বিক্ষোভে সেইসব খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। মেডভেডেভ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ১৯৩৮-এ মৃত্যুদণ্ড বরণ করেন আর ভোলোশিনোভ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৬-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাখতিনের প্রথম জীবনের বন্ধু এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে কেউই জীবিত নন। সত্তরের দশকে বাখতিন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, গবেষকরা বহু চেষ্টা করেও কয়েকটি চিঠি ছাড়া বাখতিনের ডায়েরি বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত নথি খুঁজে পাননি। সে-সময় কানায়েভ যদিও জীবিত ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে বিশেষজ্ঞরা বিশেষ কোনো সহযোগিতা পাননি। একমাত্র বাখতিনের শেষ জীবনের কিছু কিছু অন্তরঙ্গ জনের স্মৃতিচারণ ও ব্যক্তিগত রচনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

তিন

এভাবে অনিবার্যভাবে ক্রমশ গাঢ়তর হয়েছে বাখতিন নামক কিংবদন্তির ছায়া। জীবন ও তত্ত্বকে যিনি নিরন্তর মেশাবার চেষ্টা করে গেছেন, তাঁর জীবনের তাৎপর্যকে আজ বুঝতে হবে তাঁরই প্রস্তাবিত তত্ত্বের আলোয় এবং ঠিক একই ভাবে তাঁর তত্ত্বের উপযোগিতা সমর্থন করার সূত্র খুঁজতে হবে তাঁরই জীবনের বহুস্বরন্যাসে। জীবনকে যিনি সত্যের নিরন্তর দ্বিবাচনিক অভিব্যক্তি বলে জানেন, প্রতিটি উচ্চারণকে জানেন সামাজিক কণ্ঠস্বরের প্রকাশ হিসেবে, প্রতিটি সত্তাকে যিনি বিশ্বাস করেন অপর কোনো সত্তার সহযোগী বলে এবং লেখকের লিখন-প্রক্রিয়াকেও যিনি সমবায়ী অস্তিত্বের অভিব্যক্তি হিসেবে মনে করেন—ভোলোশিনোভ বা মেডভেডেভের লেখক-সত্তাকে সহযোগী হিসেবে পাওয়াকে তিনিই মর্যাদা দিতে পারেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে। ইউরোপীয় তাত্ত্বিকেরা যদিও স্ট্যালিনের আমলের নিপীড়নকে এই আত্মগোপনের জন্যে প্রধানত দায়ী ভেবেছেন, বাখতিনের সমগ্র জীবনের বার্তাকে মনে রাখলে একথা মানা যায় না। সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক বাখতিনের কাছে স্বতঃসিদ্ধ—কী জীবনে কী মননে কী অভিব্যক্তিতে। দ্বিতীয়ত, যাঁরা মেডভেডেভ ও ভোলোশিনোভের রচনায় মার্ক্সীয় চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করে অস্বস্তি বোধ করেন এবং বাখতিনের তত্ত্ব-বিশ্বের সঙ্গে ঐ চিন্তার সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করতে চান—এর পেছনে প্রধানত তাঁদের প্রতিভাবাদর্শগত অবস্থানই সক্রিয়। বাখতিনের জীবনব্যাপী সন্ধানকে যদি তাঁরই পরিভাষা অনুযায়ী নির্মিতি-বিজ্ঞানের প্রামাণিক অভিব্যক্তি হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে তাঁর চিন্তার সামগ্রিক আকল্পে এমনকি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিপরীত ভাবনার সহাবস্থানও গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বাখতিনের জীবনব্যাপী সন্ধানের সম্ভারের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। নিচের ঐ তালিকা থেকে বাহ্যত যে-বিপ্রতীপের সমাহার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে যেন বাখতিনের অন্যতম মহাসূত্রের প্রতি সমর্থন : চূড়ান্ত বিন্দু বলে কিছু নেই জীবনে। মৃত্যু আসলে জীবনের বহমান দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াকেই সমর্থন করে।

ক. বাখতিনের স্বনামে প্রকাশিত রচনা :

1. *Art and Answerability: Early Philosophical Essays* (trans V

Liapunov, ed. M. Holquist and V. Liapunov), University of Texas Press, Austin, Texas, 1990.
2. *The Dialogic Imagination: Four Essays* (trans. C. Emerson and M Holquist ed. M Holquist), University of Texas Press, Austin, Texas, 1981.
3. *Problems of Dostoevsky's Poetics* (trans. and Ed. C.. Emerson), University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota, 1984.
4. *Rabelais and His World* (trans. H. Iswolsky), Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 1984.
5. *Speech Genres and other late Essays* (trans. V. W. McGee, eds. C. Emerson and M. Holquist), University of Texas Press, Austin, Texas, 1986.
6. 'Prefaces to Tolstoy' (trans. C. Emerson in G. S. Morson and C. Emerson eds.), *Rethinking Bakhtin : Extensions and Challenges*, Northwestern University Prss, Evanston, Illinois, 1989.
7. *Toward a Philosophy of the Act* (trans, Vadin Liapunov), University of Texas Press, Austin, Texas, 1993.

খ. সহযোগীদের নামে প্রকাশিত :
1. P. N. Medvedev : *The Formal Method in Literary Scholarship : A Critical Introduction to Sociological Poetics* (trans. A. G. Wehrle), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.
2. V. N. Voloshinov : *Marxism and the Philosophy of Language* (trans. L. Matejka and I. R. Titunik), Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1986.
3. *Freudianism : A Critical Sketch* (trans. I. R. Titunik, ed. I. R. Titunik with N. H. Bruss), Indiana University Press, Indianapolis, Indiana, 1987.
4. *Bakhtin School Papers* (ed. A. Shukman), University of Essex, Colchester, 1983.

(এতে রয়েছে মেডভেডেভ ও ভোলোশিনোভ স্বাক্ষরিত কয়েকটি নিবন্ধ)

কোনো সংশয় নেই যে উপন্যাসতত্ত্বের ক্ষেত্রে বাখতিন নতুন দিগন্ত খুলে দেননি কেবল, তিনি হয়ে উঠেছেন উপন্যাস-তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনতিক্রম্য এক শীর্ষবিন্দু। জীবনকে তিনি মনে করেন উপন্যাসত্বের ধারাবাহিক অভিব্যক্তি; এইজন্যে এই শিল্প-মাধ্যমে অজস্র উচ্চাবচতাই তাঁর নজরে পড়ে না শুধু, জীবন ও উপন্যাসের সমান্তরাল প্রতিবেদনে তিনি খুঁজে পান অনেকার্থদ্যোতনার প্রতিষ্ঠা। স্বর থেকে স্বরান্তরে যেতে-যেতে অনবরত সমৃদ্ধ হয় জীবন, উপন্যাসের প্রকরণও হয়ে ওঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই জীবনের মতোই উপন্যাসও চিরমুক্ত, সমস্ত সমাপ্তি তাতে আপাত-সমাপ্তি। প্রসঙ্গত বাখতিনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি বিলডুঙ্গস্ রোমান, কার্নিভাল এবং আখ্যানে বহুস্বর সন্নিবেশের ধারণা। তাঁর বিশ্বাসের গভীরে চির জাগ্রত ছিল এই মৌল প্রেরণা যে সত্তা

আসলে সমান্তরালতার বোধ আর, সমান্তরালতা হলো অপরতার উপলব্ধি। এই জগতে কেউই নিজে-নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জগৎ ও জীবন সত্য হয়ে ওঠে শুধুমাত্র অপর সত্তার প্রতীতিতে। এমন কোনো উচ্চারণ নেই যা বৃন্তহীন পুষ্পের মতো নিজের মধ্যে জাগে এবং নিজের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। প্রতিটি উচ্চারণ অনিবার্যভাবে ধাবিত হয় সম্ভাব্য গ্রহীতা হিসেবে উপস্থিত বা অনুপস্থিত অপর সত্তার প্রতি। এইজন্যে কোনো বাচন একান্তিক নয় কখনো, প্রতিটি বাচন মর্মগত ভাবে দ্বিবাচনিক। যেহেতু জীবন এক প্রবহমান উপন্যাসতত্ত্বের অন্য নাম, উপন্যাসের সন্দর্ভও আদ্যন্ত দ্বিবাচনিক। সহযোগিতায় পূর্ণ হয় সত্তা আর সহযোগের অভাব তাকে রিক্ত করে কেবলই—এই সত্য যেমন একদিকে উন্মোচন করে উপন্যাস, তেমনি অন্যদিকে জীবনের সার্থকতা প্রমাণিত হয় ব্যক্তিস্বর ও সামাজিক স্বরন্যাসের দ্বিবাচনিকতায়, বহু উচ্চারণের মধ্যে সঙ্গতির প্রয়াসে।

চার

তবু এই উপন্যাস-ভাবনাই মানুষের ভাববিশ্বে বাখতিনের একমাত্র অবদান নয়। বিশেষজ্ঞদের মোটামুটি সবাই লক্ষ করেছেন যে বাখতিনের প্রতিবেদনে রৈখিকতা বিরল। তাঁর জীবনীকারেরা জানিয়েছেন যে মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি আবার জীবনের প্রথম পর্যায়ের চিন্তাবৃত্ত সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। আসল বাখতিন তত্ত্বের বিন্যাসে যেভাবে তাৎপর্য সন্ধান করেছেন, ঠিক একই ভাবে নিজের জীবনেও খুঁজেছেন। তাঁর কাছে অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা আর জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এক ও অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। দ্বিবাচনিকতা যেহেতু তাঁর কাছে অস্তিত্বের সারাৎসার, সব-খোলো-চাবির মতো এই পরাতত্ত্বকে তিনি ব্যবহার করেছেন। বাখতিনের চিন্তাধারা অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি বহমান কালের মাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বর্তমানের একক মুহূর্ত বা অবস্থান তাঁর কাছে যথেষ্ট নয় কখনো। বাখতিন সেই দ্বিবাচনিক জগতের অধিবাসী যেখানে সার্বিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি নিজের পথে কেউ কখনো বিকশিত হতে পারে না। প্রতিনিয়ত আমাদের অজস্র অপর সত্তার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, দ্বন্দ্বে-সংগ্রামে যুক্ত হতে হয়। এমনকি নিজেরই সঙ্গে নিজের ব্যবধান তৈরি হয় কখনো কখনো; সেইসব মুহূর্তে নিজেরই মধ্যে অনুভব করি সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া।

অতএব নিবিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাখতিন-কথিত দ্বিবাচনিকতা আসলে সামাজিক অস্তিত্বের প্রাধান্যকে যথাপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করে নেয়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক। কেননা প্রতিটি উচ্চারণই সামাজিক উচ্চারণ। এহেন দ্বিবাচনিক জগতে কোনো তাৎপর্য স্বতশ্চল ভাবে দেখা দেয় না; নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাকে অর্জন করে নিতে হয়। তার মানে, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি শেষ হয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায় না তাৎপর্য। দ্বিবাচনিকতার সীমা নেই কোথাও : এই অনুভূতি-নিবিড় উচ্চারণের সূত্রেই ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে সাম্প্রতিক আয়তনে। তেমনি ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনাও প্রতিফলিত হচ্ছে আজকের দর্পণে। দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে যে-তাৎপর্য, তাকে চূড়ান্ত বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। পরবর্তী মুহূর্ত-পরম্পরায় বিধৃত জীবনের প্রতিবেদনে আবারও নতুন হয়ে উঠতে

পারে সব। কিংবা, বাখতিনের চিন্তাসূত্র অনুযায়ী, উঠতে পারে নয়—বলা ভালো, হয়ে উঠবে। স্মৃতি আমাদের সত্তার সূত্রধার, সত্তা যেমন ভবিষ্যতের। চলতে-চলতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে কত অজস্র বিস্মৃতির নিঃশব্দ আয়তন, কোনো-এক অদূরবর্তী ভবিষ্যতে পুনর্জীবিত হবে বলে। বাখতিনও তাই জীবনের গোধূলিবেলায় পৌঁছে ফিরিয়ে এনেছিলেন বিস্মৃত তারুণ্যের ভাবনা; আসলে এভাবে, ভাবনার পুনর্নবায়নের মধ্য দিয়ে, তাৎপর্য-সন্ধানের দ্বিবাচনিকতাকে প্রমাণিত করেছিলেন তিনি। বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, সমস্ত উত্তাপের সূত্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে মানুষের স্মৃতিসত্তায়। উপন্যাসত্বের প্রকাশ হিসেবে যিনি জীবনকে দেখছেন, তাঁর কাছে তাই সব মুহূর্তই নতুন সূচনার মাহেন্দ্রক্ষণ: শেষ কথা বলে কিছু নেই। প্রতিটি ধারাই মোহনায় পৌঁছে উৎসে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। পুরোপুরি হারিয়ে যায় না কিছুই, প্রতিটি তাৎপর্য গড়ে ওঠে প্রত্যাবর্তনের উৎসব-মুখরতায় যাতে চলমানতা একমাত্র আধেয়।

পাঁচ

স্বনামে কিংবা সহযোগীদের নামে প্রকাশিত রচনাগুলি অভিনিবেশের সঙ্গে যখন পড়ি, সাম্প্রতিক পাঠক-কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতাও যেন আরো একটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবেদনের তাৎপর্য মূলত গ্রহীতা পাঠকের ভাবাদর্শগত অবস্থানের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। বস্তুত বাখতিন যে দ্বিবাচনিক সত্যকে জীবনের ও সাহিত্যিক পাঠকৃতিতে অধ্যয়ন করতে চান, তা নিরন্তর বিচরণশীল উচ্চারণের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বে প্রতিবেদন খুব গুরুত্বপূর্ণ; পাঠকৃতির নির্মিতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণী পাঠ আমরা বাখতিনের কাছে পেয়েছি। যিনি বলেছেন, অস্তিত্ব আসলে সংগঠন, তাঁর কাছে প্রতিবেদনও মূলত দুটি সামাজিক সত্তার মধ্যবর্তী সেতু। অপরতার সঙ্গে সত্তার নিরন্তর জায়মান দ্বিবাচনিক সম্পর্ক অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ভাষায়, চেতনায়। বাখতিনের বিখ্যাত সূত্র—চেতনা মানে অপরতার বোধ—এখানে উল্লেখ করতে পারি। এই বোধ যখন ভাষায় প্রতিফলিত হয়, সৃষ্টি হয় নতুন তাৎপর্য। মানব-চৈতন্যের বহুরৈখিক ও সৃজনশীল সীমান্ত অঞ্চলে ভাষা নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়। উচ্চারণ সোচ্চার হোক বা নিরুচ্চার, গ্রহীতা সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়—ভাষার প্রায়োগিক বলয় গড়ে ওঠে ঐ অপর সত্তার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিতে। অস্তিত্বের মতো ভাষাও তাই নিশ্চিত সংগঠন ছাড়া ব্যক্ত হতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাখতিনের বইগুলিতে কয়েকটি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত মৌলিক ধারণা বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন: সত্তা ও অপর, ঘটনা ও মুক্ত উপসংহার সম্পন্ন ধারাবাহিকতা, চেতনার প্রান্তরেখা ও বহিরঙ্গতা, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াময় সৃজন-পদ্ধতি ও সামাজিক মূল্যায়ন, একবাচনিকতা ও দ্বিবাচনিকতা ইত্যাদি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বাখতিনের চিন্তায় এইসব ধারণা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকে। এইজন্যে পাঠকের দায়ও বেড়ে যায় অনেকটা কেননা তাঁকে সর্বদা বাখতিনের সামগ্রিক আকল্প সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হয়। মনে রাখতে হয় যে বাখতিন প্রচলিত অর্থে কোনো ভাব-প্রস্থানের প্রবক্তা নন। এমনকি তাঁকে অভ্যস্ত আকরণেও বন্দি করা যায় না। অথচ মানবিক

নির্মিতির বিশ্লেষণে তিনি আমাদের সত্যকে শনাক্ত করার মতো যথেষ্ট উপযোগী কৃৎকৌশল উপহার দিয়েছেন।

মননশীলতার সূচনা থেকে পরিণতিতে পৌঁছানো পর্যন্ত নিজের নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাসকে বাখতিন বারবার পরখ করেছেন, যুক্ত করেছেন নতুন নতুন বিভঙ্গ। তাই *Art and Answerability* বইতে নান্দনিক প্রক্রিয়ায় লেখক ও নায়ক-সত্তার গুরুত্ব সম্পর্কিত নিবন্ধে (১৯৯০ : ২২) তিনি লিখেছেন, কোনো নান্দনিক প্রক্রিয়া তখনই সাকার হয়ে ওঠে যখন তাতে অন্তত দু'জন ব্যক্তি তাদের সমান্তরাল চেতনা নিয়ে উপস্থিত থাকে। তাঁর মতে, কোনো নিঃসঙ্গ চেতনায় কখনো সত্তার উপলব্ধি হতে পারে না; ব্যক্তি যখন নিজের বাইরে অপর চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠে, তখনই তার মধ্যে তৈরি হয় সত্তার সাংগঠনিক তাৎপর্য সম্পর্কে উপলব্ধি। ঐ বইতে বাখতিন আরো লিখেছেন, আমরা যখন কাউকে দেখি বা জানি, সেই দেখা বা জানা নির্দিষ্ট একটা অবস্থান থেকেই হয়ে থাকে। তার মানে, আমরা যা দেখতে পাই, তা আবার ঐ মনোযোগের কেন্দ্রস্থিত মানুষটি তার নিজের সম্পর্কে দেখতে বা জানতে পারে না। আমরা যখন পরস্পরের দিকে তাকাই, আমাদের চোখের তারায় দুটি ভিন্ন জগৎ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এই ভিন্নতাকে যদি পুরোপুরি মুছে ফেলতে হয়, পরস্পরের মধ্যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে মিশে যেতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের অবস্থানে অনন্য ও অপরিবর্তনীয় আবার এই মৌলিক উপলব্ধির জন্যেও চাই অপর সত্তার উপস্থিতি। অন্তর্জীবনকে যদি প্রাণবান করে তুলতে চাই, যেতে হবে বহির্বৃত জগতে অর্থাৎ ভিন্ন-এক চেতনার স্তরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার করে বলা যায়, এ যেন চোখের আলোয় চোখের বাহিরকে দেখা এবং বাইরে যখন নিরালোক, সে-সময় অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করা। এই বিন্দুতে শুরু হয়ে যায় প্রতিবেদনে পাঠকের নিজস্ব পরিসর-সন্ধান এবং সেই সঙ্গে, অন্য এক পর্যায়ে, প্রমাণিত হয় বিষয়বস্তুর আকরণ থেকে লেখকেরও কৃৎকৌশলে পৌঁছানোর অনিবার্যতা।

বাখতিনের চিন্তা অনুসরণ করে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। তা হলো, সাহিত্যে কিংবা জীবনে কারো আত্মগত অভিজ্ঞতা কখনো সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত ও সার্বিক তৃপ্তি-সম্পন্ন হয় না; সত্তার কোনো উপস্থাপনাই সত্যের সমগ্রতাকে তুলে ধরতে পারে না। বাখতিনের অননুকরণীয় ভাষায় 'I always have a loophole' (তদেব : ৪০) কেননা 'আমার' তাৎপর্য সর্বদা পূর্ণতার প্রতীক্ষা করছে। এবিষয়ে আরো বিস্তারিত বয়ান পাই ডস্কয়েভস্কির নন্দন সম্পর্কিত আলোচনায় (১৯৮৪ : ২৩২-২৩৬)। তাৎপর্যের চূড়ান্ত প্রতীতি যখন কোনো লেখকের অন্বিষ্ট, তিনি তখন তাঁর রচনায় সানুপুঙ্খ গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে এক নায়কের পরিপূর্ণ উপস্থিতিকে তুলে ধরেন। এই উপস্থাপনায় আবিষ্কারযোগ্য কোনো রহস্য থাকে না কোথাও; সমস্ত তাৎপর্য তাই পাঠকৃতিতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। নায়কের সব দিক জানার আগ্রহে তাকে লেখক এমনভাবে নিঙড়ে নেন যে পাঠকের কিছুই করার থাকে না আর। ফলে ঐ চরিত্রটি কার্যত মৃত হয়ে পড়ে। বাখতিন এই প্রসঙ্গে ভেবেছেন, মৃত্যুকে তাহলে বলা যেতে পারে 'the form of aesthetic consumation of an individual' (১৯৯০ : ১৩১)। এই চিন্তাকে পরবর্তী পর্যায়ে আরো অনেকটা প্রসারিত হতে দেখি। কোনো ধরনের চূড়ান্ত বিন্দুতে বাখতিনের অবিশ্বাস যখন গাঢ়তর

হয়েছে, সাহিত্যিক প্রতিবেদনের বিশ্লেষণে মৃত্যুর উপস্থাপনাকে গণ্য করা হয়েছে লেখকসত্তার আতিশয্যপ্রবণ নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ হিসেবে। তাই ডস্টয়েভস্কি-বিষয়ক বইতে বাখতিন টলস্টয়কে সমালোচনা করেছেন তাঁর লেখক-দৃষ্টির চূড়ান্ত অতিরেকের জন্যে; বিভিন্ন চরিত্রের মৃত্যু-বর্ণনায় টলস্টয়, বাখতিনের মতে, একবাচনিক সমাপ্তির বার্তা এনে দিয়েছেন। অন্যদিকে ডস্টয়েভস্কি তাঁর চরিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোপুরি নতুন ধরনের লেখক-সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন; আত্মচৈতন্যের মুক্ত সমাপ্তির প্রতি ঐ সম্পর্ক যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এইজন্যে ডস্টয়েভস্কির ঔপন্যাসিক অণুবিশ্বে দ্বিবাচনিক কল্পনার শিল্পসার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে বলে বাখতিন মনে করেন। যথাপ্রাপ্ত জগতের সঙ্গে মানবসত্তার নিরন্তর সংঘর্ষের ধারণাকে তিনি নান্দনিক নির্মিতির বিষয় করে তুলেছেন; তাঁর ভাষায়, 'organizing form-and-content center of artistic vision' (১৯৯০ : ১৮৭)। শব্দ বা বাক্য কথনশিল্পের নিয়ন্তা নয়; বরং শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি শব্দ ও বাক্যকে সংগঠিত করে মানবসত্তার নিবিড় উপলব্ধিকে মূর্ত করে তোলে।

ছয়

আখ্যানে বিভিন্ন চরিত্রের প্রত্যক্ষ উক্তিতে প্রতিফলিত হয় তাদের স্বরন্যাসের বৈচিত্র্য, জগতের প্রতি তাদের আবেগ ও মনন-জাত প্রতিক্রিয়া। আবার লেখকের পরোক্ষ উক্তিতে ঐসব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন ধরা পড়ে। সুতরাং উপন্যাসের আখ্যানে ভাষা ও চেতনা দ্বিস্বরিক, অবশ্য দ্বিস্বরিক প্রতিবেদনের এই ধারণা আরো বিকশিত হয়েছে Marxism and the Philosophy of Language বইতে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাতে ক্রমশ গভীরতা ও ব্যাপ্তি যুক্ত হতে দেখি। যাই হোক, প্রাথমিক পর্যায়ের ঐ রচনায় বাখতিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন : 'Every word in narrative literature expresses a reaction to another reaction, the author's reaction to the reaction of the hero; that is every concept, image, and object lives on two planes, is rendered meaningful in two value contexts—in the context of the hero and in that of the author' (তদেব : ২১৮)। এভাবে তাঁর চিন্তাবিশ্বের প্রথম থেকেই শিল্প ও জীবনের মধ্যবর্তী বিভাজনরেখা ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। সত্তা ও অপরতার সৃষ্টিশীল অন্যোন্যনির্ভরতা সম্পর্কিত ধারণায় যে নৈতিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তাকে গভীরভাবে পরীক্ষা করা যায় যখন লেখক ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নান্দনিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, ভোলোশিনোভ স্বাক্ষরিত 'Discourse in the Life and Discourse in Art' (১৯২৬) নামক নিবন্ধে পুরোপুরি বিপরীত বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে। তখন বাক্‌-শিল্পের উপলব্ধিতে পৌঁছানোর জন্যে দৈনন্দিন উচ্চারণের বিশ্লেষণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা প্রকরণবাদী সমালোচনায় শিল্প-অভিব্যক্তিকে বিশুদ্ধ ভাষাগত নির্মিতি হিসেবে কার্যত বিমূর্তায়িত করে তোলা হচ্ছিল এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের চলিষ্ণুতা থেকে তা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। অন্য আরেক ধরনের সমালোচনায় কোনো একক স্রষ্টার ব্যক্তিগত অহং বা মনস্তত্ত্বের দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছিল শিল্পকর্ম। দুটোকেই সমানভাবে ভ্রান্ত মনে করেছেন বাখতিন, কেননা, তাঁর মতে, প্রতিটি নির্মিতি ভাবাদর্শের নির্মিতি এবং বাক্‌শিল্পও তার

ব্যতিক্রম নয়। যেহেতু সৃষ্টিপ্রক্রিয়া মূলত অস্তিত্বের সংগঠন, এক মুহূর্তের জন্যেও ঐ প্রক্রিয়ায় জীবন্ত সামাজিক সংযোগ শিথিল হয় না। প্রতিটি মুহূর্ত মুখর থাকে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমাজসংবিদের সোচ্চার ও নিরুচ্চার গুঞ্জনে। প্রতিটি ভাবাদর্শবাহিত প্রকরণের মতো বাচনিক শিল্পও 'intrinsically, immanently sociological' (১৯৮৭ : ৯৫)। প্রথম পর্যায়ের রচনা থেকে 'Freudianism' শীর্ষক বইতে অন্তর্ভুক্ত ঐ রচনায় পৌঁছাতে-পৌঁছাতে বাখতিনের বক্তব্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাৎপর্য এবার আর অপর (লেখক) দ্বারা নির্মিত নয় যাকে নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা সত্তার (নায়ক) কাছে দান হিসেবে তুলে দেওয়া যায়। এই পর্যায়ে তাৎপর্য মূলত সামাজিক উপলব্ধি যাকে সৃষ্টিশীল সংগঠনে যোগদানকারীদের সম্পূর্ণ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফসল বলা যেতে পারে। স্বভাবত এখানে সামাজিক প্রতাপ ও তার বহুস্তরান্বিত কৃৎকৌশল বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয় সত্য এবং তার প্রাকরণিক কাঠামো। অতএব বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বে দ্বিবাচনিক আন্তঃসম্পর্ক বিমূর্তায়িত ধারণা নয় কোনো, বস্তুগত ইতিহাস ও সামাজিক আকরণে নিহিত প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলা তার চরিত্র ও অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত এবং মেডভেডেভ-স্বাক্ষরিত *The Formal Method in Literary Scholarship* বইতে প্রকরণবাদী নন্দনের সমালোচনা এবং মার্ক্সীয় সমাজতাত্ত্বিক নন্দনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এতে প্রকরণবাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের একপেশে ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বিষয়বস্তু ও প্রকরণের অবিভাজ্যতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক ভাবাদর্শগত অণুবিশ্বের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সাহিত্য কীভাবে অন্যান্য প্রকাশ-মাধ্যমের বিচ্ছুরণকে আত্মস্থ করে নেয় এবং আর্থসামাজিক বাস্তবতার স্বরূপকে উন্মোচিত করে—এটা দেখাতে চেয়েছেন বাখতিন/মেডভেডেভ। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে বাক্‌শিল্পের জটিল সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাখতিন জীবনের শেষপর্বে 'মহাসময়' ও 'অণুসময়'-এর যে দ্বিবাচনিক দর্শন উত্থাপন করেছিলেন (১৯৮৬ : ৪), তার প্রাথমিক সূত্রপাত হয়েছিল এখানে। ভোলোশিনোভ স্বাক্ষরিত *Marxism and the Philosophy of Language* (১৯২৯) বইতে ভাষাতত্ত্বের আকরণবাদী (সোস্যুরীয়) ব্যাখ্যা সমালোচিত হয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মতাবাদ ও বিমূর্ত বস্তুবাদকে ভাষাবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দু'ধরনের বাধা হিসেবে দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, ব্যক্তির সৃষ্টিপ্রতিভা বা ভাষাগত আকরণে বিপুল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ—আকরণবাদ তা বিশ্লেষণে অক্ষম। বরং ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার মধ্যে অযৌক্তিক বৈরিতা কল্পনা করে ভাষাচেতনায় নিহিত সত্যকে তা উন্মূল করে দেয়। ভাষা মূলত ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া; প্রতিটি বাচনিক একক আসলে একেকটি চিহ্নায়ক। কিন্তু এদের বির্মূত ভাবে, প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন করে, বোঝা যায় না; বুঝতে হয় পারস্পরিক সম্পর্কের অন্বয় বা অনন্বয়ে। এইজন্যে ভাষা-আলোচনায়ও বাখতিনের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে ঘটনা ও ধারাবাহিকতা, উদ্ভব-প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন, সীমারেখা ইত্যাদির পারিভাষিক প্রয়োগ। তবে তখনই প্রথম একবাচনিকতার বিপ্রতীপে উত্থাপিত হলো দ্বিবাচনিকতার ধারণা। আকরণবাদীদের মতো ভাষাকে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, বাচনিক ও প্রকৃত প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত, একান্তিক উচ্চারণ হিসেবে ভাবেননি

তিনি। তাই এখানে আমরা পেলাম তাঁর মৌলিক বক্তব্য : 'Any true understanding is dialogic in nature' (১৯৭৩ : ১০২)। ভাষার সঙ্গে চেতনা স্বভাবত সম্পৃক্ত; তাই মানবচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্যও পাওয়া গেল : চেতনা অন্তর্বৃতভাবে সক্রিয়, সৃষ্টিশীল ও সামাজিক ('The individual consciousness is a socio-ideological fact' (তদেব : ১২)। চেতনা মানে তাৎপর্য, আর তাৎপর্য মানে মূল্যায়ন। বলা বাহুল্য, মূল্যায়ন সম্ভব শুধুমাত্র সামাজিক ও ভাবাদর্শগত অবস্থানের স্পষ্টতায়।

সাত

আমরা যাকে আত্মগত ভাবনা বলি, তার উৎস হলো সেই 'সীমান্ত অঞ্চল' যেখানে অন্তর্বৃত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক জগৎ পরস্পরের সঙ্গে মেশে। এই মিলন ঘটে চিহ্নায়কের অর্থাৎ শব্দের মধ্য দিয়ে। সুতরাং উপলব্ধি মানে এক ধরনের চিহ্নায়কের সঙ্গে অন্য ধরনের চিহ্নায়কের অন্বয়। ভালোভাবে লক্ষ করলেই বুঝব, কেবলমাত্র চিহ্নায়ক অর্থ বহন করে থাকে। নিজের বাইরে গিয়ে অপরের প্রতীতি করানো তার দায়। যদি কখনো চেতনা থেকে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করা যায়, তাৎপর্যের পরিসরও শূন্যে মিলিয়ে যাবে। চিহ্নায়কের প্রতি চেতনার সাড়া দেওয়াতে দ্বিবাচনিকতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বহিঃপৃথিবীর অভিজ্ঞতা যখন অন্তর্জগতে আলোড়ন তোলে, প্রতিটি শব্দ থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে সামাজিক স্বরন্যাসের নানা বিভঙ্গ। এই প্রতীতি নিষ্ক্রিয় নয় কখনো, আবার এই সক্রিয়তাতেও নিহিত থাকে বিচিত্র বিপ্রতীপের সন্নিবেশ; একটি বাচন থেকে জেগে ওঠে প্রতিবাচন। এই তত্ত্বীজকে বাখতিন পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে জীবনের শেষ পর্বে, বাচনিক মাধ্যম সম্পর্কিত আলোচনায় আরো বিশদ করেছেন (দ্রষ্টব্য, ১৯৮৬ : ৬০-১০২)। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আকরণ সামূহিক মিথষ্ক্রিয়াকে নিরন্তর বদলে দেয় বলে বিভিন্ন বাচনিক প্রতিবেদনে উচ্চারণের গতি ও প্রবণতা বিচিত্রগামী হয়ে ওঠে। একে ভোলোশিনোভ/বাখতিন চিহ্নায়কের 'সামাজিক বহুস্বরিকতা' ('Social multiaccentuality' : ১৯৭৩ : ২৩) বলেছেন যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে শ্রেণী-বাস্তবতা অনুপ্রাণিত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বিবাচনিক আয়তন। প্রতিটি যুগে সামাজিক প্রতাপের নিয়ন্তা শ্রেণী সমস্ত উচ্চারণকে একবাচনিক করে তুলতে চায়, নিজেদের সুবিধা-মাফিক একক তাৎপর্য চাপিয়ে দিতে চায় ভাষার উপর; কিন্তু সত্য যেহেতু দ্বিবাচনিক, প্রতিবাদী ভাবাদর্শ থেকে জন্ম নেয় সংঘর্ষপ্রবণ চিহ্নায়ক। এই প্রসঙ্গে বাখতিন আরো জানিয়েছেন, শব্দ আসলে দ্বিমুখী ক্রিয়া: বক্তা ও শ্রোতা, সম্বোধক ও সম্বোধিত— এই দুই মেরুর বিনিময়-নির্ভর সম্পর্কই শব্দের উৎস। প্রতিটি শব্দ তাই সত্তা ও অপরতার মধ্যে সেতু গড়ে দেয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উপলব্ধি; নিরন্তর বাচনিক সংযোগের শৃঙ্খলায় প্রতিটি উচ্চারণ তখন হয়ে ওঠে একক মুহূর্তের নির্মাণ।

এই প্রসঙ্গে বাখতিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাচন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বলে একে অপরের মধ্যে অনেক সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সাহিত্যিক ও সামাজিক পাঠকৃতিতে

বক্তার লেখক বা কথক সুলভ আধিপত্য প্রায়ই পরোক্ষ বাচনের স্বরবৈচিত্র্যে ধ্বস্ত হয়ে যায়। এই বক্তব্যকে ডস্টয়েভস্কি-সংক্রান্ত আলোচনায় বাখতিন আরো ব্যাপ্ত, গভীর ও শানিত করে তুলেছেন। সীমারেখায় ক্ষয় যেহেতু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাচনের ক্রমবর্ধমান দ্বিবাচনিকতাকে স্বতঃসিদ্ধ করে, প্রতিবেদন হয়ে ওঠে দ্বিস্বরিক। একই ধরনের শব্দবিন্যাসে দুটি ভিন্ন প্রকাশযুক্ত কথনক্রিয়ার উপস্থিতি আভাসিত হয় তখন। বাখতিন যেহেতু টলস্টয়ের তুলনায় ডস্টয়েভস্কিকে উপন্যাস নামক শিল্পরূপের সার্থকতর স্থপতি বলে মনে করেন, ঐ দ্বিস্বরিক প্রতিবেদনকে তিনি প্রিয় ঔপন্যাসিকের সৃজনশীল নির্মিতির প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত 'Marxism and the Philosophy of Language' বইতে বাখতিনের ধারাবাহিক চিন্তা পরিণতির একটি পর্যায় সমাপ্ত করল যেন। তিনি এই প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন যে প্রতিবেদন ও চেতনার মৌল স্বভাব দ্বিবাচনিক। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সমান্তরাল অভিব্যক্তি লক্ষ করতে করতে তিনি এবার তাঁর প্রত্যয়কে উপন্যাসের প্রকরণ বিশ্লেষণে প্রয়োগ করলেন। ডস্টয়েভস্কির আখ্যান-প্রকরণের লক্ষণীয় অভিনবত্ব থেকে নন্দনসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে বাখতিন নতুন একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন : 'বহুস্বরসঙ্গতি' (polyphony)। সমস্ত প্রতিবেদনের বহুস্বরিকতা সম্পর্কে ডস্টয়েভস্কির তীক্ষ্ণ সচেতনতা পর্যবেক্ষণ করেই তিনি এই পরিভাষার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করেন। তিনি জানিয়েছেন, ডস্টয়েভস্কি চিত্রিত পাত্র-পাত্রীর প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি চিন্তা অন্তর্বৃতভাবে দ্বিবাচনিক, নানা ধরনের বাচনে তারা অভ্যস্ত, তাদের অস্তিত্ব সংঘর্ষে পূর্ণ। মনে হয় যেন লেখক উপন্যাসশিল্পের নিজস্ব ভাষায় চেতনার সমাজতত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। বিশেষভাবে তাঁর প্রধান চরিত্রেরা অসমাপ্য দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার শরিক হয়ে বিষয় ও আঙ্গিকের অবিচ্ছেদ্যতাকে প্রমাণ করেছে। সেই সঙ্গে উপন্যাসের অনেকান্তিকতা কোনো ধরনের বদ্ধ সমাপ্তির অসম্ভাব্যতাকেও দেখিয়ে দিচ্ছে।

একদিকে দ্বিবাচনিক মুক্ত সমাপ্তি আর অন্যদিকে চেতনার ভাবাদর্শগত ভিত্তি : এই দুটি দিক বাখতিন লক্ষ করেছেন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে। তাঁর মতে, এই মহান লেখকের প্রতিটি চরিত্রের শেকড় ভাবাদর্শে প্রোথিত; তাদের বিশ্ববীক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অভিন্ন। ঐসব চরিত্রের সামাজিক বীক্ষণে জীবনের নিভৃত মুহূর্তও স্পন্দিত হয়েছে। আসলে ডস্টয়েভস্কি তাঁর যুগের মধ্যে নিহিত দেখেছেন বিভিন্ন ভাবাদর্শবাহী উচ্চারণের আবেগতপ্ত সংঘর্ষ। লক্ষ করেছেন বিপুল দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার ছায়ায় সমকালের সমস্ত পরিসর আকীর্ণ। ব্যক্তি ও সমাজের পার্থক্য এবং সমান্তরালতা জনিত মিথস্ক্রিয়ায়— 'he heard both the land, recognised reigning voices of the epoch, that is, the reigning dominant ideas (official and unofficial), as well as voices still weak, ideas not yet fully emerged, latent ideas heard as yet by no one but himself, and ideas which just beginning to ripen, embryos of future world-views.' (১৯৮৪ : ৯০)। এখানে যেমন 'বহুস্বরসঙ্গতি' আর বিভিন্ন স্বরের দ্বিবাচনিক সংঘর্ষ বিষয়ক ধারণাকে ব্যবহার করে উপন্যাস-আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন বাখতিন, তেমনি 'Discourse in the Novel' নামক পরবর্তী বিখ্যাত নিবন্ধে তিনি আরো কিছু নতুন তত্ত্ববীজ উত্থাপন করেছেন। এই

রচনাটিকে আমরা ভাষা ও চেতনা বিষয়ে বাখতিনের অন্যতম মুখ্য সন্দর্ভ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এখানে তিনি বলেছেন, পরস্পর-বিরোধী ও ভিন্ন-ভিন্ন কণ্ঠস্বরের মিথস্ক্রিয়া সৃজনী উদ্যোগের উৎস। যদি কোনো উপলব্ধি বিশুদ্ধ গ্রহীতার কাছেও নিষ্ক্রিয় থেকে যায়, তা বাচনকে নতুন কিছু দিতে পারে না। সামাজিক বিন্যাসের ব্যক্ত স্বরে পরস্পরভিন্ন উপকরণের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলেছে, এই নিবন্ধ সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বস্তুত উপন্যাসের প্রতিবেদনে দুটি সমান্তরাল শক্তির সংঘর্ষ নানা অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয়ে থাকে বলে অনবরত বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা অর্থের দ্যোতনা। এভাবে এই নিবন্ধে বাখতিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নতুন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন—'heteroglossia' বা অনেকার্থদ্যোতনা। পাম মোরিস একে বর্ণনা করেছেন সেই শক্তি হিসেবে যা 'stratifies and fragments Ideological thought into multiple views of the world' (১৯১৪ : ১৫)। তাঁর মতে, এ হলো ভাষাকে 'ideologically saturated and stratified' বলে পর্যবেক্ষণের বিশেষ ধরন। অর্থাৎ ঐ অনেকার্থদ্যোতনার মধ্য দিয়ে আমরা উপন্যাসের ভাষাকে চিনতে পারি সামাজিক সংবেদনার বিশ্বস্ত প্রকাশ হিসেবে।

বহুমুখী সামাজিক অন্তর্বয়নে গড়ে ওঠে প্রতিবেদনের অনেকার্থদ্যোতনা; স্বভাবত তাদের মধ্যে ভাবাদর্শের বিচ্ছুরণও অনিবার্য। কোনো-একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বাচন থেকে একান্তিক সত্য কখনো প্রবল হয়ে ওঠে না উপন্যাসে কারণ অপর সব বিশ্ববীক্ষার উপস্থিতিতে প্রতিটি একক স্বরন্যাস আপেক্ষিক সম্পর্কসূত্রে জড়িত। এই পর্যায়ে বাখতিন আবার ফিরিয়ে এনেছেন দ্বিস্বরিক সন্দর্ভের প্রসঙ্গ। অনেকার্থদ্যোতনার পরিসরেও সক্রিয় থাকে আধিপত্য-বিরোধী প্রতিবাচন; জেগে ওঠে কার্নিভাল। হাসি ও ব্যঙ্গ হয়ে ওঠে তখন মুক্তিকামী শক্তির প্রতীক। প্রতিবেদনে সামূহিক প্রতাপের সমস্ত সংকেতকে অন্তর্ঘাত করে ঐ কার্নিভাল। মনে রাখা প্রয়োজন, বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বে গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিবাচনিকতার পরেই কার্নিভালের স্থান। *Rabelais and His world* বইতে বাখতিন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সংঘর্ষের পটভূমিতে যখন রাবেলেকে উপস্থাপিত করেছিলেন, সেসময় তাঁর কাছে সরকারি মধ্যযুগ ও লোকায়ত সংস্কৃতির মৌলিক দ্বন্দ্ব বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকামী লোকায়ত মনন 'কানির্ভাল চেতনা'র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এই হলো বাখতিনের বক্তব্য। তার মানে, এখানেও চেতনার দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিবাচনিক সংঘর্ষ। একদিকে মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি অপরিবর্তনীয় জগৎ-বিধির স্থবির অচলায়তনকে চাপিয়ে দিতে চাইছে, অন্যদিকে কার্নিভাল চেতনা দাঁড়াচ্ছে গতি ও পরিবর্তনের চলিষ্ণুতার পক্ষে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে বাখতিন অনির্দেশ্য কোনো নৈরাজ্যবাদী শক্তিকে ভাষায় উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। বরং তিনি কার্নিভালকে দেখাতে চেয়েছেন তাৎপর্য-প্রতীতির জটিল পদ্ধতি হিসেবে। এটা কিন্তু সাহিত্যের প্রকরণ থেকে উদ্ভুত নয়; বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চিত লোক-ঐতিহ্য (যেমন লোক-উৎসব, কথকতা, গাথানাট্য, গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান ইত্যাদি) থেকে আহৃত উপকরণের সংশ্লেষণে অর্জিত প্রতীকী অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকরণ এর উৎসভূমি। এছাড়া আঞ্চলিক জনজীবনে প্রচলিত ব্যঙ্গ-পরিহাসময় আখ্যান থেকেও কার্নিভালের প্রতীতি হতে পারে। বাখতিন বিশেষভাবে তিনটে প্রাচীন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন কার্নিভাল চেতনা ও দ্বিবাচনিকতার

উৎস। সাহিত্যে যে-সমস্ত ধূর্ত, বিদূষক, শঠ চরিত্রদের দেখা যায়-তাদের প্রেরণা কার্নিভাল চেতনা। বাখতিনের মতে এই ঐতিহ্যই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের পূর্বসূরি। লোকায়ত আঙ্গিকের মধ্যে হাস্যরস সক্রিয় ছিল মুক্তিদাতা শক্তি হিসেবে : 'they freed consciousness from the power of the direct word, destroyed the thick walls that had imprisoned consciousness within its own discourse.' (১৯৮১ : ৬০)। উপন্যাসে যখন অন্তর্বয়ন হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে কার্নিভাল, প্রশস্ততর হয় দ্বিবাচনিকতার ক্ষেত্র।

এই পর্যায়ে 'ক্রনোটোপ' নামে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববীজের অবতারণা করেছেন বাখতিন। এই পারিভাষিক শব্দটির মানে হলো সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রম। শিল্পী মানুষের জীবনকে সর্বদা জগতের নির্দিষ্ট পরিসরে ও সময়ে যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে পর্যবেক্ষণ করেন। উপন্যাসের প্রতিবেদনে নায়ক নায়িকা অনৈতিহাসিক নয় কখনো, তেমনি নয় অসামাজিক বা সময়নিরপেক্ষ। মানবিক অস্তিত্বকে ইতিহাসের পরিসরে ও কালের মাত্রায় দেখানোর দায়িত্ব নেয় উপন্যাস। বাখতিন মনে করেন, উপন্যাস প্রকরণের ক্রমবিকাশ প্রধানত হচ্ছে 'a chronotopic understanding of the human being as saturated in historical existence.' (মোরিস : ১৯৯৪ : ১৯)। 'Epic and Novel' নামক নিবন্ধে বাখতিন কার্নিভাল-চেতনা ও ক্রনোটোপের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। মহাকাব্যের দুর্ভেদ্য জগৎ বদ্ধ উপসংহারে বিন্যস্ত কেননা তা সমসাময়িক বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন চূড়ান্ত অতীতে গ্রথিত; অন্যদিকে উপন্যাসের জগৎ বিকাশমান আর অসমাপ্ত। যেন উতরোল পরিহাসের মধ্য দিয়ে তা বর্তমানকে কেবলই পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিশ্লেষণ করে চলেছে (১৯৮১ : ১৭)। ইতিহাসের সন্দর্ভে প্রধান উচ্চারণ হিসেবে যা কিছু একান্তিকভাবে মান্য ছিল বহুদিন, তাকেই দূরীকৃত অপর হিসেবে পরিচিত কার্নিভাল বদলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া তাই সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তার কিংবা গভীরতার অভিযাত্রায় অনস্বীকার্য।

আশ্চর্য এক জীবন পেয়েছিলেন বাখতিন। ইতিহাসের এত বাঁক-ফেরা একই জীবনে দেখা ও বোঝার সুযোগ বড়ো একটা পাওয়া যায় না। তত্ত্ব ও জীবন তাঁর কাছে তাই হয়ে উঠেছিল অনেকার্থদ্যোতনার দুটি ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি। জীবনানন্দের ভাষা অনুসরণ করে বলা যায়, একই জিনিসের দু'রকম উৎসারণ। তাঁর জীবনব্যাপী অর্জিত উচ্চারণ-সমবায় থেকে কোনো-একটি বিশেষ বিন্দুকে বেশি গ্রাহ্য বা বেশি উজ্জ্বল বলে গুরুত্ব দেওয়াটা সমীচীন নয়। তাঁর মৃত্যুতেও চূড়ান্ত মীমাংসা হলো না কেননা সমাপ্তি বলে তো কিছু নেই সত্য-সন্ধানের ক্ষেত্রে। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, সমস্ত সমাপ্তি আসলে আপাত-সমাপ্তি। দ্বিবাচনিকতার প্রেক্ষিতে সীমা নেই কোনো। এই মুহূর্তে যদি কিছু বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়ও কোনো-এক উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে স্মৃতিগ্রথিত হয়ে ফিরে আসবে তাও। পুনর্মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে মুহূর্ত-পরম্পরার জীবনে। অনিশ্চিত এই আধুনিকোত্তর সময়পর্বে এখানেই বাখতিনের চিন্তাবৃত্তের প্রাসঙ্গিকতা।

মুক্ত বাচনের প্রতীতি

মিখায়েল বাখতিন। কোনো নিরিখেই নিছক নাম নয় শুধু, নিয়ত বিকাশমান চিন্তাপ্রস্থানের কেন্দ্র। কয়েক বছর আগেও অগ্রণী বাঙালি পড়ুয়ারা বাখতিনকে তত্ত্ববিদদের জমায়েতে নিছক আরো একজন কেউ বলে ভাবতেন। দেবেশ রায়ের পথ-প্রদর্শক বিশ্লেষণের পরে বাংলায় বাখতিন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বই বেরিয়েছে। এবং এই সময় বাখতিন সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এছাড়া আরো কয়েকটি ছোট পত্রিকা বাখতিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা-ঋদ্ধ প্রবন্ধ ছেপেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই জায়মান চিন্তাপ্রস্থান অনুশীলন করে উপন্যাস-আলোচকেরা নতুন-নতুন ভাববীজ নিয়ে আসছেন তাঁদের প্রতিবেদনে। তবু এত কিছু সত্ত্বেও এখনো তো গেল না আঁধার, এখনো দ্বিধা ও সংশয় কারো কারো পদচারণাকে কুণ্ঠিত করে রাখে। বিশেষত বাঙালি বৌদ্ধিক সমাজের একটি বিচিত্র ব্যাধি একুশ শতকেও অটুট রয়ে গেছে। সব কিছুকেই টুকরো করে দেখতে ও দেখাতে অভ্যস্ত বলে কোথাও সামগ্রিকতার প্রতীতি এদের অনেকের মনেই কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সর্বগ্রাসী অনিকেত বোধ ও অনবস্থার প্রবণতায় স্বেচ্ছা-সমর্পিত হওয়ার ফলে নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শশূন্য পরিসরে এদের বিচরণ। সব কিছুকে সন্দেহ করার মধ্যে কোনো দার্শনিক প্রণালী ব্যক্ত হয় না; এদের বয়ানে আত্মিক নৈরাজ্য, চূড়ান্ত অগভীরতা ও একরৈখিক ভাবনার কৃষ্ণ-বিবর শুধু উন্মোচিত হয়। তৃতীয়ত এরা বাখতিনকে অন্য সাধারণ চিন্তা-প্রস্থানের প্রবক্তাদের মতো মনে করেন। এরা ভুলে যান, বাখতিনীয় চিন্তা-প্রকল্প মূলত বহুবাচনিক ও অনেকান্তিক। জীবনের পাঠকৃতি কী বিস্ময়কর ভাবে মুক্ত—এই উপলব্ধির তাৎপর্য কত বিচিত্রভাবে অনুসরণ করা সম্ভব, বাখতিনীয় ভাববীজ সেই সত্য বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু এরা সেকথা মানতে নারাজ।

আসলে সব ধরনের অগভীর সফরীসঞ্চরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা যথার্থ বাখতিন-অনুশীলন থেকে পাওয়া সম্ভব। জিজ্ঞাসু সত্তা জীবন ও জগতের সঙ্গে কীভাবে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে, সময় ও পরিসরের প্রতীয়মান অবয়বের নির্মোক ভেদ করে কীভাবেই বা গড়ে তুলবে অস্তিত্বের একক ও সামূহিক বোধ—এই অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্ব-সম্পন্ন পাঠও বাখতিন-ভাবনা থেকে পাওয়া সম্ভব। যতক্ষণ এই জরুরি প্রাথমিক কথাটি না বুঝতে পারছি, অন্তত ততক্ষণ ছ'জন অন্ধের হাতি দেখার রূপকটি ফিরে ফিরে আসবে। আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালী যখন ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি সমাজে নানা ধরনের জটিল স্ববিরোধিতা'ও কূটাভাস, অনন্বয় ও মরীচিকা-প্রীতির সূচনা করেছে, বাখতিন-ভাবনাকে উত্তরোত্তর বিকশিত করার স্বার্থে নতুন পুনঃপাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কেউই ইতিহাসের বাইরে নই; বাখতিনের চিন্তা-প্রবাহও ইতিহাসের নির্মিতি। আবার বাখতিন তাঁর বহুস্বরিক চেতনা দিয়ে ভাবনার ইতিহাসকেও আমূল পুনর্বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। তেমনি আমরাও আধিপত্যবাদ-স্পৃষ্ট নির্মিতিকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ভাবনার জায়মান ইতিহাসকে পুনর্গঠন করতে পারি। এই প্রক্রিয়া যতক্ষণ সচল থাকে, ততক্ষণই আমাদের অস্তিত্ব স্পন্দমান। একটাই শর্ত শুধু; সাহিত্যতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক-

প্রতিবেদনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসুদের বহুকৌণিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমরা বাঙালিরাও যেন দেশজ সাংস্কৃতিক স্বভাব ও আন্তর্জাতিক চেতনা-প্রেক্ষিতের দ্বিবাচনিকতার ক্ষেত্রগুলি আবিষ্কার করে নিতে পারি।

এই দ্বিবাচনিকতা ও ডায়লগের প্রামাণিকতা নিয়ে যাঁরা কিছুতেই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, তাঁদের উদ্দেশে একটিমাত্র কথা বলা যেতে পারে। তাঁর যেন বইয়ের পাতায় নিজেদের সীমাবদ্ধ না-রেখে জীবন ও জগতের অন্তহীন আবহে ঐ কেন্দ্রীয় ভাববীজটির তাৎপর্য সন্ধান করেন। যে-তত্ত্ব জীবনকে উদ্‌ভাসিত করে না, তা কোনো তত্ত্বই নয়। এই নিরিখে বাখতিন অদ্বিতীয় চিন্তাবিদ নন কেবল, তিনি জীবনের আশ্চর্য অনন্যতার আবিষ্কারক ও ভাষ্যকার। তাঁর ভাবনা আজকের চরম উৎকেন্দ্রিক পৃথিবীতে, আক্ষরিক ও রূপক অর্থে, মনঃপীড়ার আরোগ্য হয়ে আসে। জীবনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস-গোধূলিতে আচ্ছন্ন হতে দেন না তিনি, সম্ভাবনার নবায়মান নির্মিতি-বিজ্ঞানই তাঁর অন্বিষ্ট। জীবন নামক পাঠকৃতিতে তিনি খুঁজতে চান নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নমালার যথার্থ উত্থাপন এবং তাদের মীমাংসা-যোগ্যতার বিচিত্র কর্ষণ। সত্তা ও সমাজ-সংস্থার মিথষ্ক্রিয়া সর্বদা পূর্ব-নির্ধারিত পথে ঘটে না বলে এদের দ্বিবাচনিকতা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা চলে না। প্রতিটি ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামাজিক-অস্তিত্বের উচ্চারণ একই সঙ্গে প্রাগুক্ত মিথষ্ক্রিয়ার ফসল এবং অনন্য, স্বাধীন, চূড়ান্ততাহীন। জীবন-সম্পর্কিত বীক্ষণ বাচনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয় বলে উচ্চারণ ও সত্তা-বিষয়ক জিজ্ঞাসা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। বাখতিনীয় ভাববিশ্বে মানবিক অস্তিত্ব অফুরান বিস্ময়ের আকর, কেননা তাতে সমাপ্তি বা চূড়ান্ত-বিন্দু বলে কিছু নেই। সাম্প্রতিক নির্মাণবায়নের প্রেক্ষিতে বাখতিন-ভাবনার গুরুত্ব তাই অসামান্য। যতক্ষণ এই সত্যের উদ্ভাসন না ঘটছে, ততক্ষণ এই অদ্বিতীয় তত্ত্ববিশ্বের প্রকৃত তাৎপর্য অধরা রয়ে যাবে। বাখতিনের চিন্তা-জীবনে প্রারম্ভিক পর্যায় ও পরিণত পর্যায় অনেক সময় জটিলতা তৈরি করলেও কিছু কিছু কেন্দ্রীয় ভাবকল্প সম্পর্কে আগাগোড়া সচেতন থাকতে হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হল জীবনকে চিরনির্মীয়মান প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করার তাগিদ। বিশ্বাস নয় কেবল, সংহত চর্যার কথাও বলতে চান এই জীবন-তাত্ত্বিক : আমাদের পৃথিবীতে কখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয় না। জগতের কোনো কথাই শেষ কথা নয়; বস্তুত এই পৃথিবী সম্পর্কে চূড়ান্ত কথাটি কেউ বলতে পারে না কখনো। এই জগৎ আমরাই তৈরি করেছি অথচ বারবার তা যেন আমাদের মুঠো থেকে ঝরে যায়। অস্তিত্বের মধ্যে যতটুকু এই পৃথিবীকে বুঝি, তার বাইরে এর কোনো উপস্থিতি নেই কোথাও। এ জগৎ মুক্ত এবং স্বাধীন; বর্তমানের দর্পণে এর প্রতিবিম্ব দেখছি যখন, ততক্ষণে সেই মুহূর্তের অবসান হয়ে গেছে। আসন্ন অথচ অস্থির ভবিষ্যতের পটে সত্তা ও জগৎ বিধৃত যেন। উপলব্ধির সব আয়তন উচ্চারণে ধরা পড়ে না; তবু উচ্চারণের নিরন্তর নির্মাণই মানুষের ভবিতব্য।

এই বিন্দুতে মনে পড়ে মিশেল ফুকোর The Order of Things বইয়ের একটি মন্তব্য: বস্তুবিশ্বের জ্ঞানে ভাষা সম্পৃক্ত নয় আর, ভাষার সম্পর্ক এখন মুক্তির সঙ্গে (Language is no longer linked to the knowning of things, but to men's freedom)। অর্থাৎ ভাষা আর ভাবের স্বচ্ছ মাধ্যমমাত্র নয়; তারও আছে নিজস্ব জীবন ও বিধিবিন্যাস। বাচনের নিবিড়তা ও সূক্ষ্ম ব্যাপ্তির তাৎপর্য পুনরাবিষ্কার আসলে অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসাকে সুসংহত ও প্রণালীবদ্ধ করার জন্যেই আবশ্যিক। এই বক্তব্য-সূত্রে ফুকো অনেকটা পরিমাণে বাখতিনের

কাছাকাছি চলে আসেন। বিষয়টি অবশ্য এমন যা খুব সতর্ক ও অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ দাবি করে। এখানে তার অবকাশ নেই। তবে দুরূহ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, শব্দ নিছক জ্ঞানের আধার নয় : এই উপলব্ধি কীভাবে আমাদের শৃঙ্খলমুক্ত করে, তা স্বতশ্চলভাবে স্পষ্ট নয়। বস্তুবিশ্বে গ্রথিত বলেই তো ভাষা কার্যকরী ও বার্তাবাহক হতে পারে; কিন্তু অনস্বীকার্য এই নির্ভরতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা কোথাও রয়ে যায় বলেই পরাভাষার অস্তিত্বও প্রাসঙ্গিক। হয়তো বস্তু-গ্রন্থনার অতিরেক থেকে সংক্রান্তির চেষ্টার মূলে রয়েছে এক ধরনের ক্ষতিপূরণ অর্জনের প্রবণতা; এ যেন যুগপৎ ভাষার নিজস্ব আত্মসমালোচনা ও আত্মদীপ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বয়ান গড়ে ওঠে চেতনা ও অবচেতনার, শাব্দিকতা ও নৈঃশব্দ্যের নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্বয়নে। শুধু বস্তুর বহিরঙ্গ জ্ঞানে নয়, তাকে বুঝি বস্তুস্বরূপের অনুভূতিতে। প্রতিবেদনের অবচেতন উপকরণ বা নিঃশব্দ পরিসর কি ভাষার শুদ্ধতার উৎস? জানার প্রক্রিয়ায় তবে কি রয়ে যায় অনতিক্রম্য অশুদ্ধতার ছায়া? এইসব কূট প্রশ্নের সহজ মীমাংসা নেই কোনো। তাছাড়া কেবলমাত্র দার্শনিক ও তাত্ত্বিকদের কাছে যাব না মীমাংসার জন্যে; যেতে হবে কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিকদের কাছে। তাঁদের সৃষ্টিশীল ভাষাচেতনা থেকে সম্ভাব্য মীমাংসাসূত্র খোঁজার জন্যে।

দুই

বাচনের পরিধি ও কার্যকারিতা নিয়ে যে-সমস্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিতর্ক হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে এখানে স্মরণ করছি : 'It had to be either made transparent to the forms of knowledge, or thrust down into the contents of the un-conscious.' (প্রাগুক্ত : ২২৯)। ভাষার কার্যকারিতায় এই যে দ্বিমেরু-বিষম বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হলো, তা থেকে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্বতাত্ত্বিক প্রবণতারও ধারণা তৈরি করে নেওয়া যায়। স্বচ্ছ প্রকাশমাধ্যম হিসেবে ভাষা কি কেবল জ্ঞানের অভিব্যক্তির পক্ষে সহায়ক হবে? একসময় তাহলে তা যান্ত্রিক উপস্থাপন রীতিতে শৃঙ্খলিত হয়ে নির্দিষ্ট আকল্পের বাহক মাত্র হয়ে পড়বে। একক বাচন ও সামূহিক বাচনের দ্বিরালাপ যেহেতু অক্ষুণ্ণ থাকে, সময় ও পরিসরের নতুন গ্রন্থনায় পুরোনো আকল্পগুলি বিনির্মিত হতে বাধ্য। একদিকে বিধিবিন্যাসের রুদ্ধতা এবং অন্যদিকে রূপান্তরের অনিবার্য প্রেরণা, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভাষার গভীরে জন্ম নেয় 'a whole landscape of shadow' (তদেব : ৩২৬)। এই ছায়া-প্রপঞ্চের তাড়নাতেই কি পরাভাষার উন্মেষ সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে ভাষাকেই আশ্রয় করতে হয় আবার। ভাষার আলোয় দেখতে হয় ভাষার বাহিরকেও। 'বাহির' বলতে বোঝাতে চাইছি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গগুলিকে। একথা না লিখলেও চলে যে, এইসব অনুষঙ্গ অনবরত বদলে যাচ্ছে; কখনো সূক্ষ্ম আর কখনো প্রকটভাবে। তাদের চাপ তৈরি হচ্ছে ভাষারই অন্দর মহলে। লক্ষ করলেই বুঝব, অন্তর ও বাহিরের সম্পর্ক বিন্যাসে পরিবর্তন যথার্থই অভ্যাসের ধারাবাহিকতায় বড়ো বড়ো ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে। তবু ভাষা নিজেরই গভীরে নতুন দিক-নির্ণয়ের চেতনা আবিষ্কার করে নেয়।

ভাষা প্রতিটি মুহূর্তেই ছেদ ও ধারাবাহিকতার মধ্যে নতুন সেতু রচনার কৃৎকৌশল খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যায়। এক মুহূর্ত থেকে অন্যমুহূর্তের দিকে বয়ে যেতে-যেতে একদিকে নিজের সামাজিকভাবে নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাবকে মান্যতা দেয় ভাষা, অন্যদিকে নতুন বার্তার

উপযোগী অনন্য উচ্চারণ সৃষ্টির তাগিদে নিজেই ঐ মান্যতার বিরুদ্ধাচারণ করে। এই প্রক্রিয়াটিকে আপাতদৃষ্টিতে খুব জটিল বলে মনে হলেও তা ঘটে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সারা জীবন ধরে যে-প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে, তারই নিরিখে ভাষা-ব্যবহারকারী সত্তাকেও চিনে নিই। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতিতেই সত্তার অভিজ্ঞান নির্ধারিত হয়। অভ্যস্ত বাচনের বাঁধাধরা প্রকরণে যারা স্বেচ্ছাবন্দী, তাদের অস্তিত্বও রুদ্ধ। প্রতিবেদনের মধ্যে অস্তিত্বের ঈপ্সিত মুক্তি সে-ই সঞ্চারিত করতে পারে যার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বতন্ত্র উচ্চারণ নির্মাণের দক্ষতা প্রমাণিত। বলা বাহুল্য, এ এক বিশেষ ধরনের নির্মাণ; কেননা তাতে পুনর্মূল্যায়নের প্রেরণাই মূল চালিকাশক্তি। বাচন মানেই সংযোগের প্রয়াস নিশ্চয়, তবে সেই সংযোগ মূল্যনিরপেক্ষ হতে পারে না কখনো। যতক্ষণ মূল্যায়নের আকাঙ্ক্ষা উচ্চারণের সঞ্চালক না হচ্ছে অন্তত ততক্ষণ অভিব্যক্তি তাৎপর্যবহ ও লক্ষ্যাভিমুখী হবে না। ভাষার নিরপেক্ষতা একটি কথার কথা মাত্র; চিহ্নায়ক ও অন্তঃসারের নিরিখে তা অসম্ভব। ভাষা কখনো উদ্ভাসিত করে আবার কখনো আবৃতও করে। উচ্চারণে অন্তর্বর্তী অন্ধবিন্দুগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সমস্ত প্রতিবেদক হয়তো অবহিত নন; কিন্তু তাতে পরাবাচনের সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় না। সত্তা ও জগতের মধ্যবর্তী দৃশ্য ও অদৃশ্য পরিসরের চলমান দ্বিরালাপকে অনুভব করতে পারি একমাত্র বাচন ও পরাবাচনের আততিতে। বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের কাছে আমরা ঋণী এইজন্যে যে, এইসব সূক্ষ্ম, গভীর ও সুদূরপ্রসারী উপলব্ধিকে আজীবন নিরন্তর অনুশীলন করার প্রেরণা তাঁর কাছে পাচ্ছি।

বাখতিনের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাবাক্য হলো : 'Language enters life through concrete utterances'। জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত আলো-ছায়ার বিন্যাসে যখন প্রতিবেদন গড়ে ওঠে, তাতে বিধি-বিন্যাসের যান্ত্রিকতা ব্যক্ত হয় না কেবল। কারণ, প্রতিবেদন শুধুই প্রণালীবদ্ধ বাচনের ফসল নয়; তা মূলত 'ঘটনা'। অস্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রা ছুঁয়ে আসে যে-দ্বিরালাপের ক্রিয়া, প্রতিবেদন তারই প্রতিনিধি। এইজন্যে তা সর্বদা সম্ভাব্য এক উদ্‌ভাসন; একদিকে বাচক ও অন্যদিকে গ্রহীতার উপস্থিতিতে তার অবস্থান নিত্য জায়মান। যতক্ষণ উচ্চারণ সজীব, ততক্ষণই তার আয়ুষ্কাল। ভাষার সংযোগ-ক্ষমতাও এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেহেতু গ্রহীতা বাচকের দ্বিবাচনিক অংশীদার, ভাষা-বয়ান-প্রতিবেদনে অপরতার বোধ অন্তঃশায়ী। তাই উচ্চারণ মানে সম্বোধ্যমানতার প্রত্যয়। সম্বোধক ও সম্বোধিতের সম্পর্ক অনবরত রূপান্তরিত হচ্ছে বলেই ভাষায় বিনির্মাণের প্রবণতা স্বতঃসিদ্ধ। বাখতিন/ভোলোশিনোভ রচিত *Marxism and the Philosophy of Language* বইটির নিবিড় পাঠ আবশ্যিক। তবে বাখতিন-ভাবনা কোনো-একটি বইয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় বলে এবং ভাবকল্পগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঊর্ণাতন্তুর মতো অন্যোন্য-সম্পৃক্ত বলে তাঁর অন্য সব বয়ান সম্পর্কেও মনোযোগী হতে হয়।

বাখতিনের কোনো বক্তব্যই আকস্মিকভাবে উদ্ভূত নয় বলে প্রাগুক্ত সম্বোধ্যমানতা এবং দ্বিবাচনিক উচ্চারণের তাৎপর্যকে সর্বদা বুঝে নিতে হয় নান্দনিক সংযোগের সামগ্রিকতায়। যেহেতু তাঁর মতে প্রসঙ্গ চায় প্রেক্ষিতের সমর্থন, বাচনিক উপাদানের গুরুত্ব নির্ণয় করতে হলে উচ্চারণের বাচনাতিরিক্ত পটভূমির কথাও পরীক্ষা করে দেখতে হয়। উচ্চারণ যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রক্রিয়া; তবে এই দুইয়ের আনুপাতিক গুরুত্ব নির্ণয় করতে হলে

দ্বিরালাপের বহুরৈখিকতাকে অনুধাবন করতে হবে আগে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে বাখতিন-কথিত আরো একটি কেন্দ্রীয় ভাববীজের কথাও। তা হলো সমান্তরাল পার্থক্য বা 'simultaneous differences' সম্পর্কিত। সত্তা যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কখনো, সত্তার উচ্চারণও সহযোগী অপর সত্তার মুখাপেক্ষী। উচ্চারণ আসলে নিত্যনবায়মান সেতু যা সত্তাকে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। অস্তিত্বগত ভিন্নতার জন্যে এই দুটি স্থিতির বীক্ষণে যে দ্বিমেরু-বিষমতা থাকে, তাদের মৌল স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার না করেও উচ্চারণ তাদের মিলিয়ে দেয় আশ্চর্য সমান্তরালতায়। অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত বাচনের এই পার্থক্য ও সমান্তরালতা সবচেয়ে সার্থকভাবে কবিতায় ধরা পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, এই হলো কবিতার ঈপ্সিত দ্বিবাচনিক প্রকরণ যাকে কেউ কেউ শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের যুগলবন্দি বলেও বর্ণনা করেন।

সার্থক ছোটগল্পের বয়ানেও উচ্চারণের এই সম্বোধ্যমানতা স্পষ্ট। প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে কোনো-একটি শব্দের যত মূল্যই থাক বা স্বয়ংপ্রভ বলে তাকে যত মান্যতাই দিই—নিছক আত্মগত নিরিখে তার প্রকৃত তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। নিরুচ্চার ও সোচ্চারের সম্পর্ক যখন বিশ্লেষণ করি, বাচনিক নির্মিতির কৃৎকৌশল ও অন্তঃসার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। অর্থাৎ যা কথিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, উচ্চারণ তা নয়; উচ্চারণ হলো কথিত ও অকথিতের অন্যোন্যসম্পৃক্ত সমগ্রতা। কী জীবনে কী শিল্পিত পাঠকৃতিতে অজস্র উচ্চারণে গ্রথিত প্রতিবেদন থেকে আমরা ঐ সমগ্রতাই আশা করি। বলা ভালো, সমগ্রতার প্রতি আভিমুখ্য ও সক্রিয়তা কাঙ্ক্ষিত বলেই সম্বোধক নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্বোধিতকে খোঁজে। সম্বোধ্যমানতা যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকছে, ততক্ষণই সৃষ্টিশীলতা। প্রতিবেদন তাই অনবরত পরিস্থিতি নির্মাণ করে; সময় ও পরিসরে ক্রিয়াত্মক হয়ে শেষ পর্যন্ত 'হাসতে হাসতে হাঁস হলো'-র মতো নিজেই হয়ে ওঠে বিশিষ্ট বাচনিক পরিস্থিতি। বাখতিন অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসায় যথাপ্রাপ্ত স্থিতি বা situatedness-এর ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিবেদনকে ঐ অস্তিত্ববোধের সূত্রে বুঝে নিতে হবে আমাদের। এই স্থিতিতে যুগপৎ সত্তা ও বস্তুবিশ্বের বিভিন্ন স্তর নিজেদের সমান্তরালতা ও পার্থক্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে উচ্চারণের মধ্যে দেখা যায় অজস্র বিচ্ছুরণ। এই বিচ্ছুরণ সম্বোধক, সম্বোধিত ও অবলম্বিত বিষয় কিংবা বস্তুবিশ্বের মধ্যে বিশেষ ধরনের নাট্য-আবহ তৈরি করে। অস্তিত্বের বহুবাচনিক অন্তর্নাট্য ও মিথস্ক্রিয়ায় যা কিছু কুশীলব হিসেবে যোগ দেয়, তাদের সমবায়ী স্থিতিতে সমস্ত উচ্চারণ জন্ম নেয়, জীবন ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত অধিস্থিতিতে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু উচ্চারণের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল থাকা সত্ত্বেও অবসান হয় না। অদূরবর্তী কোনো এক পুনরুজ্জীবনের মুহূর্তে তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় বাচন আবার ফিরে পায় নবীন উৎস-মুহূর্ত।

তিন

বাখতিন নিবিড় কাব্যিক উচ্চারণে জানিয়েছেন, প্রতিটি তাৎপর্যই মূলত প্রকল্প; তাকে কেউ কখনো চূড়ান্ততায় রুদ্ধ করতে পারে না। একদিকে মানুষের অভিজ্ঞতায় কোনো অন্তিম কথা নেই, অন্য দিকে মানুষের জগতে এমন কিছুই নেই যাকে 'absolutely dead' (১৯৮৬ : ১৭০) বলা যায়। আর, 'Every meaning will have its home coming festival'

(তদেব)। যেন বা নীড়ে ফেরার উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিটি তাৎপর্য ফিরে আসে উৎসে, এই উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা ভাষার অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিকতাকে অনন্ত করে তোলে। যে-সমস্ত বাচনিক উপকরণ ব্যক্তিগত ও সামূহিক অভিজ্ঞানকে সংগঠিত করে, তাদের বুঝে নিতে হয় রূপান্তরশীল সময়ের সঙ্গে অনস্বীকার্য দ্বিরালাপে। সময়-স্বভাবকে যদি স্বীকার না করি, পরিবর্তন অপ্রতিষ্ঠ হয়ে যাবে; যেখানে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, সেখানে পার্থক্য-প্রতীতিও নেই। আবার পার্থক্য-প্রতীতির অভাবে তাৎপর্য থাকতে পারে না কোথাও। যদি তাৎপর্য না থাকে, জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব।

এভাবে দৈনন্দিন জীবনের অজস্র দ্বিবাচনিকতা ব্যাপকতর ও গভীরতর চিহ্নায়ন প্রকরণের প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত। তাৎপর্যপূর্ণ সম্বোধ্যমানতার অতীত সক্রিয়তার স্মৃতিতে গড়ে ওঠে পরবর্তী সব চিহ্নায়ন প্রকরণ। এইজন্যে বলা হয়, দ্বিবাচনিকতার প্রেক্ষিত অন্তহীন। মহাসময় ও মহাপরিসরের মধ্যে অন্তর্বৃত খণ্ডকাল ও খণ্ডপরিসর দ্বিরালাপের মধ্য দিয়েই প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় ফিরিয়ে আনে স্বর ও অন্তঃস্বরের সমারোহ। তাই অতীতকে রুদ্ধ বলা যায় না, কারণ তা শেষ হয়ে যায়নি; বর্তমানও একইভাবে সমাপ্তিহীন। পূর্বসূরিদের জগৎ সাম্প্রতিক প্রজন্মের জগতে অনবরত পুনর্জন্ম লাভ করছে। এই সমান্তরালতা উচ্চারণকে দ্বিস্বরিক করে তোলে। একদিকে বর্তমান অতীতকে সম্বোধন করে, অন্যদিকে অতীতের দ্বারা সম্বোধিত হয়। বর্তমানের মধ্যে অতীতের অনুপস্থিত উপস্থিতি অনুভবগম্য; অতীত চিহ্নায়কদের উপস্থিতিকে কার্যত কখনো চূড়ান্ত করা যায় না। এইজন্যে বাখতিন বলেন : 'Every word is directed toward an answer and cannot escape the profound influnce of the answering word that anticipates.'(১৯৮১ : ২৮০)। এই মন্তব্যটির গুরুত্ব অসামান্য, কেননা এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তাই এই মন্তব্য নিবিড় পাঠ দাবি করে।

প্রতিটি শব্দই ছুটে চলেছে সম্ভাব্য প্রত্যুত্তরের দিকে : এর মানে হলো, বাচনমাত্রেই মীমাংসা-গর্ভ। সার্থক উচ্চারণ জন্মসূত্রেই সম্বোধ্যমানতার দ্যোতনা বয়ে আনে। অর্থাৎ সম্ভাব্য গ্রাহকদের সমাজে উদ্ভূত ও পুষ্ট হয়ে মানব-কেন্দ্রিক মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে কোনো উচ্চারণ অন্বিষ্টের প্রতি আভিমুখ্য অর্জন করে। সম্বোধক হিসেবে আমরা স্বতশ্চলভাবে আমাদের সম্ভাব্য গ্রাহক-শ্রোতা-সম্বোধিতদের অবস্থানও রচনা করে চলি। আমাদের কথা তাই মূলত বয়ন এবং এই বয়ন রচনার মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পুনর্গঠনের সক্রিয়তাও অর্জন করে নিই। এমন পুনর্গঠন ঘটে মানব-অস্তিত্বের নিজস্ব সময়ে ও পরিসরে। এইজন্যে বলা হয়েছে 'We anthropomorphize values'. (ক্লার্ক ও হলকুইস্ট : ১৯৮৪ : ২০৫)।

মানব সমাজ মানেই মূল্যবোধের পুষ্পায়নের অংশীদারদের সংলগ্নতা। যাকে বাচনের প্রেক্ষিত বলি, তা ঐ সামাজিকতার সূত্রে বিধৃত। এতে রৈখিকতার অবকাশ নেই কারণ দৃশ্য ও অদৃশ্য আয়তনের সংঘর্ষ থেকেই জাগে উচ্চারণ। তাতে সত্তা ও অপরতার সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন সোচ্চার ও নিরুচ্চারের অন্তর্বয়ন ধরা পড়ে। এই অন্তর্বয়ন স্বর ও প্রতিস্বরের সমারোহে সৃষ্ট হয়; অস্তিত্বের বিভিন্ন আয়তনের সমান্তরাল উপস্থিতির মধ্যে পুনর্নির্মিত হয় জীবনের অভিজ্ঞান। তাই কোনো উচ্চারণ-ই বিচ্ছিন্ন এককমাত্র নয়। সত্তার গভীরে একক বাচন ও

সামূহিক বাচনের সঞ্চরমান পরিসর থেকেই জেগে ওঠে উচ্চারণের নিজস্ব নন্দন—তার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য। বাখতিন তাই লিখেছেন : 'Every utterance in the business of life is akin to a password.' (১৯৭৬ : ১০৬)।

এই অনন্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জীবন বাইরে থেকে উচ্চারণের উদ্ভব ও বিকাশকে প্রভাবিত করে না, অস্তিত্বের গহনে অন্তর্ভেদী আলো নিক্ষেপ করে সেখানেই সন্ধান করে চিহ্নায়নের উৎস। সত্তা ও অপরতা সম্পর্কে সামাজিক মূল্যায়নের প্রেরণাও তাতে সূক্ষ্মভাবে সম্পৃক্ত থাকে। উচ্চারণের নান্দনিক ও সামাজিক স্বভাবকে আলাদাভাবে দেখাতে ও দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু বাখতিনের ভাবনা-প্রস্থান যদি অনুসরণ করি, তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, নন্দন মূলত সামাজিক সংবেদনারই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। তাই শিল্প-সাহিত্য-উচ্চারণের তত্ত্ব মূলত সৃষ্টির সমাজতত্ত্ব। সংযোগের মধ্যেই সৃষ্টির সার্থকতা; আর, উচ্চারণ অনবরত রূপান্তরিত হয় সংযোগের সামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী। ঠিক এখানেই ভাবাদর্শের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাচকের চেতনা ও অবচেতনা ভাবাদর্শে গ্রথিত বলেই তার নিজস্ব উচ্চারণশৈলী বা প্রকাশভঙ্গি সে কখনো বদলাতে পারে না। আবার প্রেক্ষিত ও পাঠকৃতির মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক যেহেতু উচ্চারণের সূত্রেই নির্ণীত হয়ে থাকে, সত্তা ও অপরতার আকরণ ও সংশ্লিষ্ট মূল্য-প্রকরণ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। উচ্চারণের অনন্যতা সত্ত্বেও তাকে কখনো অনিকেত বা পৌর্বাপর্যহীন বলে ভাবা যায় না। বাখতিনের চিন্তাবিশ্বে জীবন ও তাৎপর্য একই সূত্রে গাঁথা বলে প্রেক্ষিতের রূপান্তরে জীবন ও তাৎপর্য রূপান্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবন ও তাৎপর্য রুদ্ধ নয়, তা মুক্ত ও স্বাধীন। কিন্তু এই মুক্তি বা স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয় কখনো। সত্তা বা পাঠকৃতির মৌল উপাদান হিসেবে উচ্চারণ কখনো সম্পূর্ণ সার্বভৌম হতে পারে না।

এর অন্যতম বড়ো কারণ হলো সাংস্কৃতিক রাজনীতির অমোঘ প্রভাব। তার মানে, উচ্চারণেরও রয়েছে নিজস্ব রাজনীতি। সরকারি ও বেসরকারি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শের সংঘর্ষ থেকে বিচ্ছুরিত বহুবাচনিক আবহে উচ্চারণ জন্ম নেয়, পুষ্ট হয় ও রূপান্তরের পথে যাত্রা করে। এই প্রক্রিয়ায় সত্তা ও অপরতার বহুস্তর-বিন্যস্ত সম্পর্কের জটিলতাও ব্যক্ত হয় বলে উচ্চারণ-শৈলীকে কখনো একটি পূর্বনির্দিষ্ট আকরণে রুদ্ধ করতে পারি না। অজস্র পার্থক্য-প্রতীতির উপলব্ধিতে উচ্চারণ গড়ে ওঠে বলে ঐ প্রতীতির মধ্যেই সাংস্কৃতিক রাজনীতির নির্যাস প্রতিফলিত হয়। বাখতিন লিখেছেন : 'The internal politics of a style is determined by its external politics'. (১৯৮১ : ২০৪)। অর্থাৎ শৈলীরও রয়েছে নিজস্ব রাজনীতি, অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত সংগ্রামের বাধ্যবাধকতা; বিবিধ বিকল্পের সম্ভাবনা থেকে অমোঘ অভিব্যক্তিতে পৌঁছানো। তার মানে, উচ্চারণের যেমন রাজনীতি আছে, তেমনি উচ্চারণ নিজেই হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট রাজনীতি। আর, এই ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব নন্দন, মুক্তির প্রতীতি। উচ্চারণে অন্তর্বৃত মুক্তি পাঠকৃতির নন্দনকে উত্তীর্ণ করছে মানব পরিসরে মুক্তির উৎসবে। ভাষার জন্ম ও বিকাশ সীমা নিরাকরণের মধ্য দিয়েই ঘটে। প্রসঙ্গের দ্বিবাচনিক ভূমিকা মেনে নিয়েও তা শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গাতীত হয়ে ওঠে বলেই ভাষার দ্যোতনা রহস্যগর্ভ ও উৎক্রান্তিসূচক। ব্যবহার-বিধি অনস্বীকার্য; কিন্তু সেই বিধি-বিন্যাসকে যদি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাহ্বান না জানায়, তাহলে আকরণগত রুদ্ধতা শুধু শৃঙ্খলই তৈরি করবে।

শৃঙ্খলা ও সীমানার প্রতি অবহিত থেকেও বাচন অনিবার্যভাবে মুক্তিপ্রয়াসী। আমরা যখন কোনো উচ্চারণে মুগ্ধ ও প্রাণিত হই, শুধু কি শব্দগত অর্থ খুঁজি? না, আমরা খুঁজি প্রতীতি। বক্তা ও শ্রোতা কিংবা সম্বোধক ও সম্বোধিতের নির্দিষ্ট সময় ও পরিসরে ঐ প্রতীতি নির্ধারিত হয়। আবার আমরা তেমন উচ্চারণও খুঁজি, যার প্রতীতি সর্বজনীন ও সর্বকালীন হতে পারে। অর্থাৎ প্রতীতির প্রক্রিয়াও স্বভাবে দ্বিবাচনিক। শব্দ যখন চিহ্নায়কে রূপান্তরিত হয়, স্বতঃশ্চলভাবে অনেক প্রথাসিদ্ধ বাধ্যবাধকতা নিরাকৃত হয়ে যায়। অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিকতার শক্তিতেই বাচন চিহ্নায়িত হতে পারে। স্থিরতা ও নিশ্চয়তার নামে অচলায়তনকে প্রশ্রয় না দিয়ে সার্থক উচ্চারণ নিজের মধ্যে গতি সঞ্চারিত করে এবং সম্ভাব্য গ্রহীতা-সত্তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে অর্জন করে কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা।

চার

এই প্রসঙ্গে বাখতিন/ ভোলোশিনোভ রচিত *Marxism and the Philosophy of Language* বইয়ের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এতে অজস্র সম্ভাব্য প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দের অর্থদ্যোতনা পরিবর্তনে তাদের ক্ষমতা অনন্ত নয়। দু'জন বাচক বা সম্বোধকের স্বাতন্ত্র্যসূচক পরিসরেই শব্দের অর্থপরিবর্তন কার্যকরী হতে পারে। কোনোভাবেই এই ন্যূনতম শর্তটি লঙ্ঘন করা চলে না। একদিকে ব্যাকরণগত প্রণালীবদ্ধ ভাষাবিন্যাস ও তজ্জনিত শব্দার্থের নির্দিষ্টতা এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট নিয়মরহিত প্রেক্ষিতের প্রায় অন্তহীন উপস্থিতি: এই দুইয়ের ব্যবধান অনতিক্রম্য।

বাখতিন এই ব্যবধান নিরসনের উপায় নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, শব্দ সর্বদাই সম্বোধিতের প্রতি ধাবমান—'toward who that addressee might be...each person's inner world and thought has its stabilized social audience that comprises the environment in which reasons, motives, values and so on are fashioned...the word is a two-sided act. It is determined equally by whose word it is and for whom it is meant. As word, it is precisely the product of the reciprocal relationship between speaker and listener, and addresser and addressee. Each act and every word expresses the one in relation to the other.' (১৯৭৩ : ৮৫-৮৬)।

বাখতিনের এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এতে শাব্দিক বাচনকে চলমান সম্বোধ্যমানতার দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সম্বোধকের বাচন গ্রাহক-সত্তার উপস্থিতি ছাড়া অকল্পনীয়। সম্ভাব্য কোনো-এক গ্রাহক বা সম্বোধিতের প্রতীতি ছাড়া বাচনের উদ্ভব হতেই পারে না। তার মানে, বাচকের অন্তর্জগৎ যদিবা উদ্ভাসনের সূচনা-বিন্দু হয়েও থাকে, স্থিরীকৃত বহির্জগতের অস্তিত্ব না থাকলে ঐ উদ্ভাসন নিরালম্ব হতে বাধ্য। তার মানে উচ্চারণের চাই নিজস্ব সমাজ, বহির্জগতে যার প্রতিষ্ঠা। যুক্তি-লক্ষ্য-মূল্য ইত্যাদি হয়তো অনেকটাই কল্পনা করে নিতে হয়, কিন্তু সেই কল্পনাও বিশিষ্ট এক বাস্তব বা অধিবাস্তব বলে গণ্য হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনায় যদিও, উচ্চারণের পুষ্টি ঘটে এহেন বিপ্রতীপের দ্বিরালাপে। সম্বোধক ও উদ্দিষ্ট সম্বোধিত এই দ্বিরালাপের অংশীদার বলে বাচন কখনো একমাত্রিক হতে পারে না। শব্দ যেখানে পৌঁছাতে চায়, সেই লক্ষ্য সক্রিয়তার গতি ও স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বক্তা ও

শ্রোতা, সম্বোধক ও সম্বোধিত, বাচক ও গ্রহীতার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই উচ্চারণ গড়ে উঠতে পারে। ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক অপরের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সম্পর্কের অভিব্যক্তিই হলো উচ্চারণ। অপরের দৃষ্টিকোন থেকে আপন অস্তিত্বের বাচনিক অভিব্যক্তি যখন তৈরি করতে চাই, আমরা আসলে সময় ও পরিসরে বিধৃত সামাজিক বীক্ষাকেই প্রকাশ করি। তাই বাখতিন শব্দকে সত্তা ও অপরতার সেতু বলে মনে করেছেন : 'a world is a bridge thrown between myself and another...it is territory shared by both addresser and addressee.' (তদেব)।

এই বক্তব্যের সূত্রে কবিতা ও ছোটগল্পের সংযোগ প্রকরণ সম্পর্কে আমাদের ভাবনা পুরোপুরি নতুন খাতে বয়ে যেতে পারে। বহুস্বরিক উচ্চারণের মধ্য দিয়েই জীবনের কোষে সঞ্চারিত হতে পারে ভাষা। তা যুগপৎ মূর্ত ও বিমূর্ত, সহজ ও জটিল, বাস্তব ও অধিবাস্তবকে ধারণ করতে পারে: এই বিস্ময়কর উপলব্ধি হয় আমাদের। কোনো কবি বা গল্পকার নিজস্ব ধরনে সম্বোধ্যমানতার নতুন প্রকরণ খুঁজে নিতে চান। ভাষার মধ্যে যা-কিছু যথাপ্রাপ্ত উপাদান সামূহিক বাচন হিসেবে সর্বদাই পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বাগত, তাদের ব্যবহারবিধিকে মান্যতা দিয়েও একক বচনের উপস্থাপয়িতা হিসেবে সম্বোধক সর্বদাই নতুন সজীব ভাষার আয়তন নির্মাণ করেন। তা যদি না হত, কোনো নির্দিষ্ট কাব্যভাষা বা গল্পভাষাকে আমরা কখনও অনন্য ভাবতে পারতাম না। এই অনন্যতার মানেই হলো, এইমাত্র এমন একক বাচন সৃষ্টি হয়েছে, যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বমুহূর্তেও অজানা ছিল। বাচনের মতো তার প্রেক্ষিতও অনবদ্য। আমরা যখন চিহ্নায়ন প্রকরণে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের দ্বিবাচনিকতা নিয়ে ভাবি, তাতেও একক ও সামূহিক বাচনের দ্বিরালাপ নানাভাবে সক্রিয় থাকে। কোনো কবি বা গল্পকার উচ্চারণের বিশিষ্টতায় বস্তুকে চিহ্নায়কে রূপান্তরিত করেন, সম্ভাব্য পাঠকের কাছে ন্যূনতম কিছু প্রত্যাশা তো থেকেই যায়। চিহ্নায়ন প্রকরণ সম্পূর্ণ ও সার্থক হতে পারে যদি সম্বোধিত জনেরা ঠিকমতো তাতে সাড়া দিতে পারেন—এ তো অনস্বীকার্য। বাচনের অর্থ এভাবে চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়, কেননা তাৎপর্য-প্রতীতিতে আপাতসম্পূর্ণ মাত্র আভাসিত হতে পারে। চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া বারবার পুনর্নবায়িত হয় নতুন গ্রাহকের চেষ্টায়, তার এই চেষ্টা আংশিক ও সাময়িক মাত্র। অতএব চূড়ান্ত মুহূর্ত কেবলই নাগাল এড়িয়ে যায়, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে যায়। নিজেকে কর্ষণ করে ভাষা, নিজের প্রথা-নির্দেশিত সীমাকে নিজেই চূর্ণ করে যায়। এই সূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিবিড় দ্বিরালাপের আবহ, কেননা তাৎপর্য প্রেক্ষিতের সীমানাকে মান্যতা দিলেও প্রেক্ষিত নিজের সীমাকে অনবরত প্রসারিত করে যায়। এ তো অনিবার্য; কারণ, পরিবর্তমান সময়-স্বভাব অনুযায়ী প্রেক্ষিত বদলে যেতে বাধ্য। প্রেক্ষিতের এই সীমাহীনতাই অনেকার্থদ্যোতনার উৎস। বাচনের নন্দনে তাই অচল অনড় আকরণ নেই, জিজ্ঞাসারহিত ধ্রুববিন্দুও নেই কোনো। আমরা চেতনার ফসল নই কেবল, চেতনাকে নির্মাণও করি। সময়-স্বভাব আমাদের রূপান্তরপ্রবণ নির্মিতি-প্রকরণে প্রতিফলিত হচ্ছে। আর, এই নির্মাণের সূত্রে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন উচ্চারণ আরো একবার বিনির্মিত হবে বলে। তাই মুক্ত ও স্বাধীন সঞ্চরণের প্রতীতি আমাদের সংযোগ প্রকরণে স্বতঃসিদ্ধ। আমরা যখন বাচনের প্রাকরণিক বিধির কথা বলি, তা কেবল নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার জন্যে। কিন্তু এইসব বিধি অভ্যস্ত আকরণের সঙ্গে ভাষার নিরন্তর সংঘর্ষকে নিরাকৃত করতে পারে না। এই সংঘর্ষের সূত্রে আমরা পৌঁছে যাই বাচনের অন্তর্বৃত রাজনীতির ধারণায়।

কেননা সংঘর্ষ কখনও নিছক ব্যক্তিগত আততির অভিব্যক্তি নয়, তার পেছনে সক্রিয় থাকে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য সামাজিক অভিজ্ঞতার টানাপোড়েন। বাখতিন/ভেলোশিনোভ লিখেছেন : 'each word...is a little arena for the clash of and criss-crossing differently oriented social accents. A word in the mouth of particular individual is a product of the living interaction of social forces.' (১৯৭৩ : ৪১)।

পাঁচ

বিভিন্ন সামাজিক স্বরের মিথস্ক্রিয়া কিংবা ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিটি উচ্চারণের অপরিহার্য আবহ। কোনো বিশেষ মুহূর্তে কোনো একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও একক উপলব্ধি নিঙড়ে নিয়ে কথা বলেন না। অজস্র সামাজিক শক্তির জীবন্ত মিথস্ক্রিয়ার বাচনিক ফসল হিসেবে উদ্ভূত হয় ব্যক্তির উচ্চারণ। প্রতিটি উচ্চারণের পশ্চাৎপট তাই বিপুল ও বিস্তৃত; সেই পরিসরে প্রত্যেকের একক বাচন সমান্তরাল অপরসত্তাদের বাচনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ও নিবিড় সংঘর্ষে লিপ্ত। তাই যিনি সম্বোধক, তাঁকে বাধ্যতামূলক ভাবে সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতেই হয়। তিনি সর্বতোভাবে সামাজিক উচ্চারণের সূত্রধার; কোনো-একটি মুহূর্তের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা প্রবণতার প্রকাশ ঘটে না শুধু। তিনি জটিল ও গতিময় সামাজিক প্রকরণেরও অংশীদার। তবে এমন ভাবার কারণ নেই যে, এতে তাঁর বাচনের মুক্ত ও স্বাধীন সঞ্চরণে কোনো বিঘ্ন ঘটছে। আসলে বাচনের অন্তর্বৃত সাংস্কৃতিক রাজনীতির অংশীদার হিসেবে সম্বোধককে শুধু মনে রাখতে হচ্ছে, ভাষা একই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের আয়ুধ ও যুদ্ধক্ষেত্র। যে-প্রতিবেদন তাঁর ঈপ্সিত, সেখানেও একই সত্যের বিচ্ছুরণ ঘটছে। তাঁকে সম্বোধিতের অস্তিত্ব ও সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিটি মুহূর্তে অবহিত থাকতে হচ্ছে; বুঝে নিতে হচ্ছে মুক্তি ও স্বাধীনতা শুধু তাঁর একার প্রাপ্য নয়।

কোন সামাজিক পরিস্থিতি তাঁর অস্তিত্বের নিয়ামক এবং কোন বৃহত্তর ঐতিহাসিক অবস্থান ভেতরে ও বাইরে অস্তিত্বের উপরে ছায়াতপ ছড়িয়ে দিচ্ছে, তা খুবই জরুরি বিষয়। আর, না লিখলেও চলে, এতেই নিঃশ্বাস নিচ্ছে সামূহিক বাচন। একক বাচনের সূক্ষ্মতা ও স্বাতন্ত্র্য ঐ একই প্রেক্ষিতের দ্বিবাচনিক স্বভাব থেকে উৎসারিত হচ্ছে। সাধারণ বিচারে ভাষার বিধি-বিন্যাসে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ থাকলেও জায়মান উচ্চারণের নিরিখে তা নিয়ত-নির্মীয়মান বর্তমানের স্পন্দিত অভিব্যক্তি। এতেই আভাসিত হয় ভবিষ্যৎ এবং পুনরুত্থাপিত হয় অতীতের স্মৃতিসত্তা। বর্তমান বলতে এখানে সময়ের সঙ্গে পরিসরকেও বোঝাতে চাইছি। সময় এবং পরিসরের অজস্র আকল্প থেকে চিহ্নায়ন প্রকরণের নতুন নতুন অনুপুঙ্খ ও কৃৎকৌশল আহরণ করে নেয় ভাষা। এখানেই তার বদ্ধতা থেকে মুক্তির দিকে প্রবহমান থাকার শক্তির উৎস।

ফলে সার্থক বাচনে কখনও নিছক বিবরণ থাকে না, থাকে বিবরণ পেরিয়ে যাওয়ার আর্তি। উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত করার আকাঙ্ক্ষা যখন সঞ্চারিত হয় বাচনের কোষে-কোষে, আমরা বলি, উচ্চারণের জন্ম হলো। এ এক নতুন জগৎ যাতে বস্তুবিশ্ব চিহ্নবিশ্বে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরে নন্দনের প্রেরণা আসলে ভাবাদর্শের প্রবর্তনা, যেহেতু চিন্তাবীজ পুষ্পিত না-হলে বস্তু কখনও চিহ্নায়কের মর্যাদা অর্জন করে না। বাখতিনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

স্মরণ করা যায় : 'Everything ideological has semiotic value...The domain of ideology coincides with the domain of signs.' (তদেব : ১০)। ঘাস থেকে নক্ষত্র, ধুলো থেকে ছায়াপথ—সব কিছুই চিন্তার আকর; তাই অণীয়ান থেকে মহীয়ান চিহ্নায়কে পরিণত হতে পারে। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নির্ণীত হয় এদের মূল্য। আমাদের বাচনে এদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য যখন প্রতিফলিত হয়—সময় ও পরিসরের নির্যাস থাকে স্বাতন্ত্র্যবোধে। তা যুগপৎ ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক, সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক। চিহ্নের পর চিহ্ন জমে ওঠে; চিন্তার সঙ্গে বস্তুবিশ্বের সেতু রচনার নতুন নতুন আকল্প দেখা দেয়।

সব শেষে যা থাকে, তা হলো উচ্চারণ; অনুভূতি থেকে ভাবাদর্শ অর্থাৎ সত্তা থেকে জগৎ পর্যন্ত তার বিস্তার, তারপর পুষ্পায়ন। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আমাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে একই তালে-লয় গাঁথে। তাই বাচন মানে গ্রন্থনা—এপার আর ওপারের সেতু। মনশ্চর্যা ও ভাবাদর্শের মধ্যে কোনো সীমান্ত নেই, থাকতে পারে না। উচ্চারণের সত্তাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব তাই বাহির ও ভেতরের মধ্যে নিরন্তর যাতায়াতের নিদর্শন। অন্তর্বৃত চিহ্নায়কেরা যেন ডুবুরির মতো; এরা যখন বহির্বৃত হতে থাকে, নানাভাবে তাদের অভিব্যক্তি তৈরি হয়। বাস্তব ও রূপকের মধ্যে চিরাগত দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ে না কেবল, পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে নব্য সমগ্রতার দ্যোতনা গড়ে তোলে। এই যে পুনর্নবায়ন বা পুনর্গঠন—তাতেই উচ্চারণের নতুন নতুন তাৎপর্যের সম্ভাবনা দেখা দিতে থাকে।

বাখতিনের ভাষা-ভাবনা ও উচ্চারণতত্ত্ব তাই সাহিত্যিক পাঠকৃতির অনুষঙ্গে বিচার্য নয় কেবল; জীবনের নবায়মান বয়ানের নিরিখে তা অনুশীলনযোগ্য। বাচন রয়েছে মুক্ত অস্তিত্বের কেন্দ্রে; তার প্রতীতি মানে মুক্তি ও স্বাধীনতার উপলব্ধি। এমন উপলব্ধি যাকে সম্বোধ্যমানতার অর্থাৎ দ্বিবাচনিক প্রেক্ষিতের বাইরে অর্জন করা যায় না কখনও। সক্রিয়তার বহুরৈখিক প্রকরণে, নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যুত্তর প্রত্যাশার আবহে, আত্ম-অভিজ্ঞান ও জগৎ-সন্ধানের যুগলবন্দিতে চিনি ঐ প্রেক্ষিতকে। জানি, প্রতিটি উচ্চারণ আরও সম্ভাব্য উচ্চারণমালার অনুষঙ্গে তাৎপর্যবহ হয়ে উঠছে। তাৎপর্যকে নতুন করে পাব বলে ক্ষণে-ক্ষণে তাকে হারিয়ে ফেলছি। স্বাধীন মুক্ত সক্রিয়তায় নিজেকে গড়ছি, নিজেকে ভাঙছি। বাখতিন-ভাবনায় মীমাংসার অর্জন নয়, প্রত্যাশাই বড়ো। আর, সূক্ষ্মভাবে এই প্রত্যাশায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে যোগ্যতার অনুভব। সার্থক উচ্চারণের মধ্যে ঐ যোগ্যতাকে নির্মাণ করি আমরা, কী সৃষ্টিতে কী মননে। যোগ্য হয়ে ওঠার অনুভবই সত্তার নান্দনিক জিজ্ঞাসায় ব্যক্ত হতে থাকে; উচ্চারণ তাই চিরদীপ্যমান, চিরনবীন।

সম্ভাব্য জবাবের নির্মিতি

সওয়াল-জবাব। এই শব্দবন্ধকে বিতর্কসভা আর বিচারালয়ের অনুষঙ্গ ছাড়া ভাবতেই পারি না। যদিও ভারতীয় দর্শনের উপস্থাপনা-পদ্ধতিতে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ নামক বিন্যাস-প্রতিন্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বপক্ষের প্রত্যুত্তর হিসেবে সুপরিকল্পিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে নির্মিত হয় উত্তরপক্ষ। অতএব নিশ্ছিদ্র যুক্তি ও পিনদ্ধ বিশ্বাস তার মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু এইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হয় যে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের যৌক্তিক উপস্থাপনা হিসেবে পরিকল্পিত পূর্বপক্ষও মূলত মীমাংসা-প্রয়াসীর নির্মিতি। ফলে পূর্বপক্ষের বাচনে পদে-পদে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রতিবাচন যা নিরাকৃত হওয়ার জন্যেই উত্থাপিত। কারণ, মীমাংসা-প্রয়াসী নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রতিপক্ষের হাতে কখনও তেমন অস্ত্র তুলে দেবে না যাকে প্রতিহত করা অসম্ভব। তার মানে, যাকে ভাবছি পূর্বপক্ষের সওয়াল, তার প্রত্যাখ্যান পূর্ব-নির্ধারিত। দার্শনিক প্রতিবেদন নির্মাণ ও বিনির্মাণের এই পরম্পরায় গঠিত হয়ে থাকে। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে বিন্যাস-প্রতিন্যাসের এই ধরন হয়তো প্রকাশ্য নয়। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে, ইশারায়, ব্যক্ত ও অব্যক্তের ধূসর সীমান্তে প্রশ্নমালার বিস্তার ও সম্ভাব্য মীমাংসার প্রতি আগ্রহ ফুটে ওঠে। আসলে আমাদের জীবন নামক পাঠকৃতিও তাই। পর্যায়ে পর্যায়ে কখনও সোচ্চার আর কখনও নিরুচ্চারভাবে জেগে থাকে জিজ্ঞাসার উত্থাপন আর সম্ভাব্য প্রত্যুত্তরের উন্মোচন।

মিখায়েল বাখতিন নেভেল শহর থেকে প্রকাশিত 'The Day of Art' নামক একটি পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ সংখ্যায় 'Art and Answerability' নামে ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। চিন্তা-জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে রচিত হলেও নানা কারণে এই প্রবন্ধটি বাখতিন-চিন্তাবিশ্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৮ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে বাখতিনের চিন্তাজগৎ যখন সংগঠিত হচ্ছিল, বাচন-মূলক সৃষ্টি-প্রকরণ সম্পর্কে নান্দনিক ও দার্শনিক ভাববীজ নানাভাবে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। বাচনিক সৃষ্টির অন্তর্বস্তু, উপাদান ও প্রকরণ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন বাখতিন। ঐসময়কার রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ডস্টয়েভস্কির নন্দন সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত বইয়ের প্রস্তুতিও চলছিল তখন। নৈতিক দর্শন, বিষয়ীসত্তা, আইন, নন্দনভাবনা : নানা দিকে তাঁর অভিনিবেশ ছিল। ঐ সময়কার যেসব খসড়া উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো তারিখ বা শিরোনাম পাওয়া যায়নি। বাখতিন বিভিন্ন বিষয়ে নানা সময়ে যা-কিছু ভেবেছেন, সেই সব তাঁর চিন্তার প্রধান আকল্পগুলিকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এদের বলা যায়, প্রাক্-সন্দর্ভ স্তরের রচনা।

বাখতিনের চিন্তাবিশ্ব সম্পর্কে যাঁরা বিশেষভাবে অবহিত, তাঁদের কাছে 'Art and Answerability' শীর্ষক রচনাটির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ। এতে ঐক্য-বিষয়ক দুটি ভিন্ন ধারণার বিরোধিতা দিয়ে লেখক তাঁর বয়ান শুরু করেছেন। প্রথম ধরনের ঐক্য হলো যান্ত্রিক; যে-সব অংশ কোনো সমগ্রকে নির্মাণ করে, তাদের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় পুরোপুরি বহির্বৃত উচ্চারণ। এরা

বিচ্ছিন্ন একক ও ভ্রামণিক; স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই অন্য অংশের পক্ষে নিতান্ত পরবাসীর মতো সুদূর। দ্বিতীয় ধরনের ঐক্যে যান্ত্রিকতা নেই; বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রতীতিতে, ধারণার নিরিখে। ব্যক্তি-অস্তিত্বের চিন্তন-প্রক্রিয়ায় যেমন বিবিধ উৎস-জাত ভাববীজ সম্পৃক্ত হয়, প্রতিটি অংশ একে অপরের সম্পর্কে সংবেদনশীল এবং মিথষ্ক্রিয়ায় উন্মুখ। বাখতিন লক্ষ করেছেন, শিল্পে অভিব্যক্ত সময় ও পরিসর এমন-এক জগতের ইঙ্গিত দেয় যা বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত সময় ও পরিসর থেকে অনেক স্বতন্ত্র। এই দুইয়ের মধ্যে তিনি বিচ্ছেদ ভেবে নিয়েছেন : 'When a man is in art, he is not in life and vice versa!' তাঁর মতে, শিল্প-স্বভাবে এবং মানবব্যক্তিত্বের স্বভাবে কিছুই যথাপ্রাপ্ত নয়; তাই স্বতশ্চল ভাবে এদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত হয় না। সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, দিতে হয় আকার ও চরিত্র, নির্দিষ্ট ধারণাভিত্তিক সমর্থন। মন যেহেতু নির্মিতি-নিপুণ কারুকৃৎ, শুধুমাত্র তারই প্রণালীবদ্ধ সক্রিয়তায় সৃষ্টি হয় ঐক্যবোধ। শিল্প ও জীবনের সম্পর্ক রচিত হয় তখনই যখন কোনো পর্যবেক্ষক মানুষ তা গড়ে তোলে। সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব যখন ঐ পর্যবেক্ষক উপস্থাপনার মধ্যে খুঁজে পায় প্রত্যুত্তর-সম্ভাবনা। আর, সম্ভাবনা মানে যোগ্যতা, অনবরত যোগ্য হয়ে ওঠা।

শিল্পের প্রতিবেদন যেন প্রশ্নমালা আর জীবন সেইসব জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য প্রত্যুত্তর। শিল্প থেকে যে-অভিজ্ঞতা ও প্রতীতি অর্জন করি, জীবনে তার জবাব দিয়ে যেতে হয়। নইলে জীবন উদ্‌ভাসিত হবে না। ব্যক্তিগত প্রত্যুত্তর-যোগ্যতার এই নন্দন সামূহিক ভূমিকার চেয়ে স্পষ্টত বেশি গুরুত্ব দেয় একক অস্তিত্বের সংগঠনকে। সেইসঙ্গে শিল্প ও জীবনের সম্পর্ক বিষয়ক চিরাগত ধারণা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। নিঃসন্দেহে শিল্প এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণত ভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা; তবে তাদের মধ্যে অন্তত একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। শিল্প-প্রকরণ সৃষ্টি বা জীবন-সৃষ্টির প্রক্রিয়া একে অপরের জটিল অস্তিত্ব উপেক্ষা করে নিজের কাজকে সরলীকৃত করতে চায় : 'For it is certainly easier to create without answering for life and easier to live without any consideration for art. Art and life are not one, but they must become united in myself in the unity of my answerability' (১৯৯৫ : ২)।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝি, শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টারা নান্দনিক দায়বোধের নামে জীবন থেকে উত্থাপিত প্রশ্নমালা সম্পর্কে নিরুত্তর থাকাকে গরীয়ান করেন। তেমনি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন থেকে জীবন নির্বাহ করাটা অধিকাংশ মানুষের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্প ও জীবন এক নয়; কিন্তু গ্রহীতা সত্তার মধ্যে তাদের অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হতেই হবে। এ কেবল আকাঙ্ক্ষা নয়, এ হলো ঔচিত্যের ঘোষণা। গ্রহীতার প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা থেকে উৎসারিত ঐক্যবোধে শিল্প ও জীবন প্রকৃত তাৎপর্যপ্রসূ হয়ে ওঠে। জীবন সাবভৌম ও আত্মদীপ, শিল্প-ও তা-ই। কিন্তু তাদের প্রকাশ ও বিচ্ছুরণ, অবস্থান ও প্রতীতির প্রকরণে রয়েছে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য।

মাত্র ছ'টি ছোট-ছোট অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত এই বয়ান যেন চিন্তাসূত্র হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে যে গভীর মনন-ঋদ্ধ প্রতিবেদন রচিত হবে, বাখতিন এখানে যেন বীজাকারে তার মুখ্য ভাববস্তু উপস্থাপিত করেছেন। নিবিড় পাঠে অন্তর্বৃত অনেকান্তিকতা

স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। 'The Architectonics of Answerabiltiy' বা প্রত্যুত্তরযোগ্যতার নির্মিতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুস্বরিক প্রতিবেদনের উৎস এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ। প্রতীচ্যের অধিবিদ্যার তিনটি প্রধান শাখা—জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব—তখন বাখতিনের চিন্তায় সমন্বিত হয়ে একটি অভিন্ন তাত্ত্বিক আকরণে বিন্যস্ত হতে শুরু করেছিল। শিল্পের অভিজ্ঞতা ও প্রায়োগিক ক্রিয়াকে কীভাবে অন্যান্য ধরনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়—এ বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। সমসাময়িক আরো কয়েকজন চিন্তাবিদ তখন জীবনে শিল্পের ভূমিকা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে বৌদ্ধিক ঘরানাগুলিতে যে বিপুল আলোড়ন ও পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তার সমস্ত অভিঘাত তখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে বিভিন্ন চিন্তা-প্রস্থানে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করাও সম্ভব হচ্ছিল না। একদিকে পরস্পরের দার্শনিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার রক্ষণশীল প্রয়াস এবং অন্যদিকে রূপান্তর-প্রবণ সময়স্বভাবের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা : এর ফলে পারস্পরিক পার্থক্য ও অনন্বয়ের বোধ থেকে বিতর্কও তৈরি হচ্ছিল। প্রকরণবাদীদের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সমালোচকদের বিরোধ কিংবা ভবিষ্যবাদী ও প্রতীকবাদী কবিদের বিতর্ক সমকালীন বৌদ্ধিক প্রেক্ষিতের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। এই পরিবেশে বাখতিনের চিন্তাজগতে তৈরি হলো নতুন নতুন বাঁক তৈরির প্রবণতা।

দুই

এই নিবন্ধের শুরুতে যে সওয়াল জবাব, পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি, সারা জীবন ধরে নানাভাবে তাদের সংরূপ নির্মাণ করে যেতে হয়। কিংবা, বলা ভালো, নির্মিতির উপযোগিতা পর্যায়ে পর্যায়ে পরীক্ষা করে অনবরত পুনর্নির্মাণ করতে হয়। বিশেষত যিনি অস্তিত্ব ও চিন্তাকে মূলত নির্মিতি বলে জানান, তাঁর পক্ষে এই প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাখতিন এইজন্যে অগ্রণী চিন্তাবিদ্‌দের অন্যতম যে তিনি জীবনের নিয়ত নির্মীয়মাণ প্রতিবেদনে একই ধরনের প্রশ্নমালার জন্যে ভিন্নভিন্ন প্রত্যুত্তর সন্ধানে বিরত হননি কখনও। সত্তা ও অপরতার সম্পর্ক কত ধরনের সমস্যার আকর হতে পারে কিংবা পার্থক্য-প্রতীতির ভিত্তিগত বাস্তবতা থেকে কত বিচিত্রভাবে সমরূপতার উদ্ভব হতে পারে—তা উপলব্ধির জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতি নির্ণয়ে কখনও ক্লান্ত বোধ করেননি তিনি। জীবন মানে নিত্য নবায়মান প্রকল্পের সন্ধান—এই অনুভব থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন জিজ্ঞাসার যথার্থ উপস্থাপনায়। আসলে জিজ্ঞাসার ধরন ও নির্যাস খুব একটা বদলে যায়নি, যদিও প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যথেষ্ট বিবর্তিত হয়েছে। বাখতিনের কাছে সমস্ত প্রত্যুত্তরই মীমাংসা নয়, তবে তেমন সম্ভাবনা জাগিয়ে দেওয়া যে তাঁর অন্বিষ্ট, এ-সম্পর্কে সংশয় নেই কোনো। সম্ভাব্য মীমাংসা বা প্রত্যুত্তরের নির্মিতি-বিজ্ঞান আবিষ্কার করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বাখতিনের ভাবনা দার্শনিক মননে উজ্জ্বল যদিও প্রচলিত দর্শন-প্রস্থানগুলির সঙ্গে তাঁর সরাসরি আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগৎ ও জীবন

থেকে তিনি আহরণ করেন তাঁর নীতিবোধ ও নন্দনের নির্যাস। বাখতিনের মতে নৈতিক সক্রিয়তাকে তত্ত্বগতভাবে উদ্যম বা কৃত্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উদ্যম-নিষ্পন্ন কর্মের ফল বা পরিণতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন না তিনি, জায়মান নৈতিক কৃত্যের প্রক্রিয়াই তাঁর মতে অভিনিবেশ-যোগ্য। যে-ঘটনাকে সৃষ্টি বা রচনা প্রক্রিয়ায় অনুধাবন করতে পারি, তারই পারিভাষিক নাম উদ্যম বা কৃত্য। তা শারীরিক ক্রিয়া, চিন্তা, উচ্চারণ বা লিখিত বয়ান হতে পারে। উচ্চারণ ও লিখিত বয়ান আসলে অভিন্ন পরিসরের দ্যোতক। সাহিত্যিক পাঠকৃতির প্রণালীবদ্ধ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় লেখক-সত্তার সক্রিয়তা যেভাবে ব্যক্ত হয়, তা নিবিড়ভাবে অনুশীলন করে বাখতিন এই তাত্ত্বিক ধারণায় পৌঁছেছেন। কল্পনা-প্রতিভা দ্বারা নির্মিত ও বহু উপাদানের সমন্বয়ে রচিত শিল্পকর্মে, বিশেষত আখ্যানে, সাহিত্যিক কীভাবে তাঁর প্রকল্পজাত চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নিজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সংগঠিত করেন, তা পরীক্ষা করে সত্তা ও অপরতার বহুরৈখিক সম্পর্ক বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা নিয়ে যাঁর চিন্তা-জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, তিনি জীবনাবসানের গোধূলি-বেলায় যখন নির্মিতি-বিজ্ঞান নিয়ে নিবন্ধ রচনা করেন, পরিণতির দ্বিবাচনিক দর্পণে সূচনা-মুহূর্তের ভাববীজগুলি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। সারা জীবন ধরে বাখতিন যা ভেবেছেন বা লিখেছেন, তাদের দার্শনিক ও নান্দনিক তাৎপর্য যেন নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়।

অবশ্যই এর মানে এই নয় যে মধ্যবর্তী দশকগুলিতে বাখতিনের ভাবনায় কোনো নতুন আকল্প দেখা দেয়নি। কিংবা তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মূল প্রতিপাদ্য যাচাই করতে গেলে শুধুমাত্র মীমাংসাযোগ্যতার নির্মিতি-বিজ্ঞানকেই ব্যবহার করতে হবে। চিন্তাবিদ হিসেবে যাঁর বহুমাত্রিক হয়ে ওঠার বিবরণ আমাদের বারবার বিস্মিত ও প্রাণিত করে—সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সেই প্রক্রিয়ার নিবিড় দ্বিবাচনিকতা অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। এইজন্যে আলোচকেরা নির্মিতি-বিজ্ঞানকে বাখতিন-অনুশীলনের পক্ষে উপযোগী বহুস্তর-বিন্যস্ত চিন্তাবলয় হিসেবে ভেবে নিয়েছেন। অর্থাৎ বাখতিনের চিন্তাবিশ্বে এই তত্ত্ববীজের উপস্থিতি এমন-এক জটিল ও বিশিষ্ট অবসংগঠন হিসেবে, যার বহুমাত্রিক তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্যে সম্পূর্ণ জীবনও যথেষ্ট নয় যেন। 'নির্মিতি-বিজ্ঞান' ও 'প্রত্যুত্তরযোগ্যতা'—এই দুটি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ জীবন ও মননের কত দিগন্ত স্পর্শ করে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অস্তিত্বের নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থনায় আমাদের প্রত্যেকের অনন্য অবস্থান থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রত্যুত্তরের যোগ্যতা ও সম্ভাবনা। যা-কিছু আমাদের অপরতার পরিসর হিসেবে ঘিরে রাখে, অনন্ত অনুপুঙ্খময় সেই জগতের সঙ্গে আমাদের আস্তিত্বিক অনন্যতাকে গ্রথিত করি ঐ প্রত্যুত্তরযোগ্যতা দিয়েই। আর, সম্ভাব্য প্রত্যুত্তরের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। বাখতিনের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাবাক্য হলো, আমরা প্রত্যেকেই 'without an alibi in existence'।

অস্তিত্বের বিপুল পরিসরে নিজেদের অনন্য অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে চাই উপযোগী দায়িত্ববোধ। কেননা অনন্যতার উপলব্ধি বা পার্থক্যপ্রতীতি সার্থক হতে পারে যদি সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত অপরতার পরিসর সম্পর্কে সচেতন হই। সত্তা যতক্ষণ নিজেকে অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত না করছে, ততক্ষণ নিজেকে অনন্য বলে বুঝতেও পারবে না। সময়ে ও পরিসরে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান সুনির্দিষ্ট। কিন্তু তার

তাৎপর্য বুঝতে পারি শুধু নানা ধরনের ও নানা পর্যায়ের সক্রিয়তার প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গে। আমরা কেউ একে অপরের অবস্থান পুনরাবৃত্তি করতে পারি না বলে তাকে সুনির্দিষ্ট বলছি। মহাবিশ্বে যেমন প্রতিটি গ্রহ-তারা-উপগ্রহ-ধূমকেতু-ছায়াপথের অবস্থান বিপুল আপেক্ষিকতার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট, সত্তার অবস্থানও তাই। আবার এই অমোঘতার মধ্যেও অনবরত রূপান্তরিত হচ্ছে অস্তিত্ব। পদার্থ জগতের মতো অন্যান্য মানবিক ও প্রাকৃতিক অস্তিত্বের দৃশ্য ও অদৃশ্য আততিতে সত্তার রূপান্তর ঘটছে অহরহ। তবে সবই ঘটছে প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট অবস্থানের ভিত্তিতে। বস্তুত প্রত্যেকের জীবনেই প্রকৃত উদ্যোগ বা ঘটনার প্রকল্প যেভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেভাবেই সত্তার নিজস্ব সংরূপ সংগঠিত হচ্ছে। এইজন্যে অস্তিত্ব মূলত অনুষ্ঠান, সংগঠন। অপর সব সত্তা ও জগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক গ্রন্থনায় একমাত্র সূত্রধার যেহেতু অস্মিতার পরিসর, সব সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্যে তাকেই দায়ী থাকতে হয়।

প্রতিটি সত্তা থেকে নিয়ত উৎসারিত সক্রিয়তা অস্মিতা ও অপরতার মধ্যে সর্বদা নিশ্চিত সংযোগ গড়ে তুলতে পারছে, তা কিন্তু নয়। তৈরি হতে-না-হতে হারিয়ে যাচ্ছে সম্পর্ক কিংবা সম্পর্ক তৈরি হওয়ার অবকাশ দেখা দিতে-না-দিতে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে বিন্যাস। এই যে হারিয়ে যাওয়া ও স্খলন, তাদের নিরন্তর অভিঘাতে হয়তো উদ্ভূত হচ্ছে সত্তার সক্রিয়তা। তাহলে সংযোগকে বলতে পারি ঘটমান সম্ভাবনা; অপরতা ও অস্মিতার পারস্পরিক নির্ভরতা কিংবা উন্মুখতার সূত্রে যাকে বুঝি, যাকে চিনি। কিংবা পুরোপুরি বুঝতে বা চিনতে কি পারি কখনো? তাহলে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নবায়মান জিজ্ঞাসা ও মীমাংসাপ্রয়াসের সূত্রে সংযোগের নির্মাণই জীবন। সমস্ত ব্যক্তিসত্তা ও সমস্ত অপরতার দ্বিবাচনিকতায় যত প্রতিবেদনের আদল তৈরি হচ্ছে, তাদের নির্যাস হলো ঐ সংযোগের অনুভব। আর, অনুভবের প্রকাশকে বলি উচ্চারণ। বলা ভালো, উচ্চারণ কেবল শব্দে বা পাঠকৃতিতে থাকে না; তা থাকে চিন্তায়, উদ্যমে। লেখকসত্তার ধারণা এইসব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। চেতনার পক্ষে অস্মিতা যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, পাঠকৃতির পক্ষে লেখক-স্রষ্টা ততটুকু অপরিহার্য। বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে যখন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনাও ব্যক্ত হচ্ছে। 'আমি' সর্বনামটি আমি ব্যবহার করতে পারি যখন বাচনকে গ্রহণ করার মতো কোনো একটি 'তুমি' উপস্থিত রয়েছে। সম্বোধন মানেই গ্রহীতা-সম্বোধিতের উপস্থিতি; আর, ভাষা মানে সম্বোধ্যমানতার ক্রিয়া ও প্রকরণ। সম্বোধকের অস্তিত্বের কেন্দ্র হলো 'আমি' সর্বনামের উপস্থিতি। স্বভাবত উপস্থিতি মানে নির্দিষ্ট পরিসর ও সময়ের ঘোষণা। একই সঙ্গে তা অন্যান্য উপস্থিতি থেকে স্পষ্ট পার্থক্য-প্রতীতিরও উপলব্ধি। এইসব অপর অস্তিত্ব যুগপৎ বস্তু এবং চিহ্ন। সক্রিয় উদ্যমের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সংযোগ তৈরি করে যাওয়া তাই বস্তুবিশ্ব ও চিহ্নবিশ্বে অবধারিত। না লিখলেও চলে, সম্বোধ্যমানতা আর মীমাংসা-প্রয়াসের ক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের, চেতনার, ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান।

তিন

যা-কিছু যথাপ্রাপ্ত এবং যা-কিছু সম্ভাব্য, তাদের মধ্যে নিরন্তর বিনিময় চলে বলেই তো জীবনের আর সাহিত্যের পাঠ চূড়ান্ত হয় না কখনও। আসলে সম্বোধ্যমানতা নিয়ত

আপেক্ষিক, নিয়ত চলমান। সম্বোধক নয়, সম্বোধিত অপরতাই মুখ্য এবং তা কেবলই নির্মীয়মান। যাকে বলেছি সম্বোধক সত্তা, তাও মূলত ঐ সম্বোধিতের দ্বারা উদ্দীপিত। বাখতিনীয় সত্তা কখনও সম্পূর্ণ নয়, কেননা দ্বিবাচনিক ভাবেই তার অস্তিত্ব বিকশিত হতে পারে। আমাদের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসার প্রত্যাশা যত রূপান্তরিত হয়, একদিকে পাল্‌টে যায় আমির স্বরূপ, অন্যদিকে যাবতীয় অপরতার সঙ্গে অস্মিতার সম্পর্কের নির্মিতি। একটু আগে যে পার্থক্য-প্রতীতির কথা লিখেছি, সত্তা ও অপরতার স্বাতন্ত্র্য তার প্রাথমিক ভিত্তি, অন্য সব পার্থক্য দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর। বাখতিন-কথিত কৃত্যের জগৎ হলো অস্মিতা ও অপরতার মূর্ত নির্মিতি— প্রকরণগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈপরীত্যের অভিব্যক্তি। নির্মিতির ধরন আমাদের উপস্থিতি, অভিব্যক্তি ও অভিপ্রায়ের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে। তলিয়ে ভাবলে দেখি, অপরতাই প্রকৃত নিয়ন্তা। গভীরতর অর্থে অপর পরিসর সত্তার বন্ধু; কেননা অপরতা আপাত-গ্রহীতা হলেও আসলে তা সত্তার রূপকার। অপর না থাকলে সত্তার প্রকাশ হত না। বাখতিনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য নিবিড় অভিনিবেশ দাবি করে, 'Dialogism celebrates alterity' (১৯৮৪ : ৬৫)। যত রূপান্তরিত হচ্ছি, তত আমার সত্তার গভীরে অন্তঃশায়ী সম্ভাবনা প্রসারিত হচ্ছে। এবং, তা ঘটছে অজস্র কৃত্যের মধ্য দিয়ে। তবু এ কেবল উদ্যমের প্রসার নয়, এ আসলে অস্তিত্বের নানা বৈকল্পিক স্থিতির প্রতিষ্ঠা। এ-সম্পর্কে বাখতিনের মন্তব্য লক্ষ করার মতো : 'As the world needs my alterity to give it meaning, I need the authority of others to define, or author, myself.' (তদেব)। সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে যে-সত্তা রয়েছে অস্তিত্বের কেন্দ্রে, জগতের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে গেলে তাকে কখনো নিরেট ও রুদ্ধ হলে চলে না। সত্তার মুক্ত উপস্থিতি মানে তার অভিব্যক্তি কোনো-একটি নির্দিষ্ট ধরনের হবে না; নানা বিকল্পের মধ্যে বিচ্ছুরিত হবে তার নির্মিতি-প্রকরণ, সম্ভাব্য মীমাংসার দিকে যাত্রা। জগৎ যখন সত্তাকে চায়, ঐ মুক্ত স্বভাবের নিরিখ ব্যবহারের জন্যেই চায়। যত বেশি বিকল্প অবস্থানের দর্পণে জগৎ নিজের সঙ্গে সত্তার সম্পর্ককে প্রতিবিম্বিত দেখে, তত তার তাৎপর্য অর্জন হয়ে ওঠে সার্থক। আবার নিজের সত্তাকে রচনা বা সংজ্ঞায়িত করতে চাই যখন, সমস্ত অপরের অনুমোদন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আসলে অনুমোদন নয়, অভিজ্ঞান। কেননা অপর পরিসর ব্যাপ্ত রয়েছে সর্বত্র, তার বাইরে কিছুই নেই। সত্তার সঙ্গে অপরের বন্ধুতা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত জীবন নিষ্ফল, নিষ্ক্রিয়।

চিন্তাজীবনের সূচনাপর্বে রচিত হলেও ঐতিহাসিক কারণে 'Art and Answerability' এবং 'Toward a Philosophy of the Act' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে ১৯৯০ ও ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ইংরেজি-জানা দুনিয়ার কাছে বাখতিনীয় চিন্তাবিশ্ব বিপুল উৎসাহে পঠিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। বাখতিনের তত্ত্ব-প্রস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু ধারণাও দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে গেছে। তাই তাঁর চিন্তাজীবনের সূচনাপর্বে রচিত এই দুটি যুগলবন্দি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে তাঁরই ভাবনার দর্পণে ভাববিশ্বের ক্রমিক উন্মোচন ও পুষ্পায়ন পুনঃপরীক্ষিত হওয়ার চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেছে। অবশ্য এতে কিছু কিছু সমস্যার দিকও আছে। কেননা ইতিমধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত বাখতিনীয় ভাববিশ্ব দ্বারা এই দুটি প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ প্রভাবিত হওয়াটা অনিবার্য। পূর্ব-নির্ধারিত

ধারণার সমর্থন খোঁজার জন্যে গবেষকেরা এই দুটি প্রতিবেদনকেই ব্যবহার করতে পারেন। ফলে বাখতিনের চিন্তাজীবনের সূচনাপর্ব তাঁর পরিণত পর্বের সঙ্গে কীভাবে ও কতখানি দ্বিবাচনিকতায় সম্পৃক্ত—তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পারে। এইজন্যে সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে নিয়ত প্রসারণশীল মুক্ত বয়ানের আপাত-স্বাতন্ত্র্যে প্রাগুক্ত দুটি প্রতিবেদনকে গ্রহণ করা। এই নিবন্ধ-প্রয়াসীও মূলত এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

আসলে বাখতিনের চিন্তাবিশ্বে উন্মুক্ততাই কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমস্ত প্রধান চিন্তাবীজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে মুক্ত পরিসরের প্রতীতি যা নিয়ত সঞ্চরমান ও চূড়ান্ত-বিন্দু বিহীন। তাই তাঁর চিন্তাবিশ্বে পর্যটন অনন্য এক অভিজ্ঞতা। যে-কোনো বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত ফিরে আসি সেই বিন্দুতেই। তাই এতে কোনো যাওয়া নেই, আসাও নেই। আছে এমন এক অনন্ত বিস্তার যার নিরিখে সত্তা নিজেই নিজেকে নির্মাণ করে অনবরত। অফুরান এই অধ্যবসায়ে কল্পিত এক শীর্ষবিন্দু থাকে হয়তো, কিন্তু তা কেবল কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্যে। কেননা সমগ্রতা বা পূর্ণতার ধারণা কখনো অর্জন করা যায় না। তাই মুহূর্তেই অবসান হয় কাঙ্ক্ষিত সেই পরমতার। বলা ভালো, পরমতাও এক নির্মিতি এবং সেইজন্যে দ্বিরালাপের অন্তহীন প্রক্রিয়ায় সেই নির্মিতিকেও নিরাকৃত হতে হয় কখনো-না-কখনো। স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো একীভূত অভিজ্ঞান সত্তা কখনো অর্জন করতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগতে কিংবা দ্বান্দ্বিক চিন্তার অতিশৃঙ্খলিত যৌক্তিক বিন্যাসে সম্পূর্ণতা ও চূড়ান্ততা পুরোপুরি অলীক। অতএব সম্ভাব্য সম্বোধিত গ্রাহক অস্তিত্বের দিকে অনবরত বয়ে যায় জীবন, নতুন নতুন কৃত্য ও উদ্যম নির্মাণের মধ্যে প্রমাণিত হয় জীবনের অস্তিত্ব। জীবজগৎ বিকশিত হয় তারই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত পরিবেশে যার বিচিত্র স্থিতির উদ্দেশে অনবরত প্রত্যুত্তর রচনার ক্ষমতাতেই পরীক্ষিত ও নির্ণীত হয় জীবনের শক্তি, অস্তিত্বের তাৎপর্য।

প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা ও উদ্যমের দর্শন আপাতভাবে দুটি আলাদা খাত ধরে একই মোহনার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। প্রতিবেদনের মধ্যে যেভাবে উপস্থাপিত বা পুনরুত্থাপিত হয় জগৎ এবং বিভিন্ন ঘটনা ও উদ্যমের অভিজ্ঞতায় যেভাবে ব্যক্ত হয় জীবন—তাদের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে বহুমাত্রিক ভাবনার সূত্রপাত করেছেন বাখতিন। এসেছে রচনা-প্রক্রিয়া, রচয়িতা, দায়বোধ, নন্দনের নৈতিকতা, সত্তা-বহির্ভূত অথচ সত্তায় সম্পৃক্ত বাহিরের প্রসঙ্গ। আর জেনেছি, কীভাবে কোনো প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েই নির্মাণ করতে হয় চিন্তাবিশ্বের স্থাপত্য। অস্তিত্বের বিপুল মহাপরিসরে তবু হুবহু পুনরাবৃত্ত হয় না কোনো কিছু; অনন্যতা পরাভূত হয় না কিছুতেই। সত্তা ও ভাষা, জগৎ ও মন, যথাপ্রাপ্ত ও সৃষ্টির মধ্যে চলমান দ্বিবাচনিকতার কেন্দ্রে পৌঁছানোর যাত্রা এভাবেই প্রাথমিক যুগল প্রতিবেদনে শুরু হলো। একদিকে বস্তুবিশ্ব এবং অন্যদিকে চিহ্নবিশ্বের গ্রন্থনা অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ক্রম ও উপস্থাপিত অভিজ্ঞতার নির্যাস-ক্রম : এই দুইয়ের অনস্বীকার্য ব্যবধান কীভাবে পেরিয়ে গেলেন বাখতিন? এদের পার্থক্যপ্রতীতিকে মান্যতা দিয়েও কীভাবে এবং কেন সংযোগের সেতু গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারলেন তিনি? এইসব আনুষঙ্গিক জিজ্ঞাসা এবং তাদের মীমাংসাপ্রয়াস সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলে এই যুগল প্রতিবেদন যাতে আমরা নিজেরা ক্রমশ প্রত্যুত্তরযোগ্যতা অর্জন করতে পারি। পৃথিবী-বিখ্যাত বাখতিন-বিশেষজ্ঞ মাইকেল হলকুই *Toward a Philosophy of the*

Act-এর প্রাক্‌কথন কাব্যিক ভাষায় লিখেছেন : 'Bakhtin in this volume is seeking to get back to the naked immediacy of experience as it is felt from within the utmost particularity of a specific life, the molten lava of events as they happen. He seeks the sheer quality of happening in life before the magma of such experience cools, hardening into igneous theories, or accounts of what has happened. And just as lava differs from the rock it will become, so the two states of lived experience, on the one hand, and systems for registering such experience on the other, are fundamentally different from each other.' (1995 : X)

অভিজ্ঞতার নগ্ন প্রত্যক্ষতাকে যখন অগ্ন্যুৎপাত জনিত লাভাস্রোত উদ্‌গীরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়, ভাষ্যকারের নিজস্ব দৃষ্টিকোন অস্পষ্ট থাকে না। ঘটনা যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটতে থাকে, পর্যবেক্ষক সত্তা ঘটমান বর্তমানের শরিক; তরল আগুনের স্রোত ও উত্তাপে বিহ্বল হবেন না তিনি। কোনো-না-কোনো ভাবে নিজেকে বিবিক্ত করে নেবেন উত্তাল প্রবাহ ও ঝল্‌সানো আঁচ থেকে; নইলে তিনি দেখবেন না কিছু। অর্জিত হবে না কোনো অভিজ্ঞতা। বিশেষ জীবনের চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট অবস্থানের গণ্ডি থেকে অনুভব করতে হয় ঘটনা-পরম্পরার তাৎপর্য। উদ্‌গীর্ণ লাভাস্রোত জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলাস্তরে পরিণত হয়; কিন্তু লাভা ও শিলা আলাদা। তেমনই অভিজ্ঞতাপুঞ্জ পাথরীভূত হয়ে ক্রমশ নানা ধরনের তত্ত্ববীজে রূপান্তর লাভ করে। একদিকে জীবনের অজস্র যথাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে সেইসব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রণালীবদ্ধ কৃৎকৌশল : এই দুইয়ের পার্থক্য অনস্বীকার্য। আবার সেইসঙ্গে সত্য তাদের দ্বিবাচনিক সম্পর্কও। অভিজ্ঞতা আমাদের তত্ত্বে পৌঁছে দেবেই যেহেতু তত্ত্বকে এড়ানোর কোনো জো নেই। যাঁরা অভিজ্ঞতার ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্বকে খারিজ করতে চান, তাঁদের একবাচনিক তত্ত্ব-বিরোধিতাও স্বভাবে তাত্ত্বিক। এইজন্যে প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা ও উদ্যমের মধ্যে সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাখতিনীয় আকল্প অনুযায়ী আমরা এক ধরনের আস্তিত্বিক বিবিক্ততার ইশারা পাই যেন। সময় ও পরিসরে ব্যাপ্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও যৌক্তিকতার বিন্যাস আমার লক্ষ করি কৃত্য বা উদ্যমের জগতে এবং সেই সঙ্গে তাদের তাৎপর্যসন্ধান প্রক্রিয়ায়। এই দুটির সমান্তরাল উপস্থিতি সত্য নিশ্চয়; কিন্তু ঐ উপস্থিতির মধ্যে যে ঐক্য-প্রতীতি ব্যক্ত হয়, তা কখনো আরোপিত নয়। এই প্রতীতিকে সর্বদা ও সর্বত্র প্রণালীবদ্ধ ভাবে অর্জন করতে হয়। এই অর্জনের সূত্রে আসে দায়বোধ ও নৈতিকতার প্রসঙ্গ, কথা ও কর্মের ব্যবধান দূর করে অস্তিত্বের সংগঠনে নন্দন ও দর্শনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করা তোলা। বাখতিনের একটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য আরো একবার স্মরণ করা যায় : 'It is only my nonalibi in being that transforms an empty possibility into an actual answerable act or deed.' (১৯৯৫ : ৮২)।

চার

এই মন্তব্যের নিষ্কর্ষ নিয়ে বাখতিন-বিশেজ্ঞরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা শুধু লক্ষ করব, শূন্য সম্ভাবনার রূপান্তর ঘটছে প্রকৃত বা বাস্তব কোনো প্রত্যুত্তরযোগ্য কর্মোদ্যমে। তার মানে এই শূন্য রিক্ত নয়; বরং সৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তের মতো গর্ভিত।

অস্তিত্বের অন্তহীন পরিসরে সত্তার অনন্যতাই ঐ বিশিষ্ট শূন্যায়তনে বীজাধান করতে পারে। আর, এই বীজতলি থেকে নিরন্তর অঙ্কুরিত হতে থাকে বাস্তব ও সেই বাস্তবের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবেদন। গ্রন্থনা রচিত হয় জিজ্ঞাসার, অনবরত মীমাংসা-প্রয়াসের বিস্তার ঘটবে বলে। যা কিছু ঘটছে ও ঘটতে পারে, তাদের গ্রন্থনায় রচিত হয় অনন্য জগৎ। এই জগতে অজস্র সমান্তরালতার মধ্য দিয়ে কেবলই উঠে আসতে থাকে ঐক্য-প্রতীতির নবায়মান পথরেখা। এতে অংশগ্রহণ করতেই হয় কেননা সত্তা মানে অংশীদার হওয়ার প্রত্যয়। অংশীদার না হয়ে কোনো উদ্যমে কিংবা চেতনায় পৌঁছানো যায় না। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজস্ব জগতের নির্মিতি-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। যতক্ষণ নতুন নতুন জিজ্ঞাসা উত্থাপন না করছি এবং তাদের মীমাংসা-যোগ্যতা নিজেদের অনন্য অস্তিত্বে পরীক্ষা না করছি—বিষয়ীসত্তা ও বিষয়বোধ অনায়ত্ত থেকে যাবে। এ প্রসঙ্গে বাখতিনের অসামান্য দ্যোতনাগর্ভ মন্তব্য স্মরণ করতে পারি : 'Life can be consciously comprehended only in concrete answerability. A philosophy of life can be only a moral philosophy. Life can be consciously comprehended only as an ongoing event, and not as Being qua a given. A life that has fallen away from answerability cannot have a philosophy : it is, in its very principle, fortuitous and incapable of being rooted.' (১৯৯৫ : ৫৬)।

বাখতিনের বাচন এখানে দার্শনিক দ্যুতিতে দীপ্যমান। যে-জীবন ঊষর, তাতে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না; অতএব মীমাংসার জন্যে কোনো প্রস্তুতি বা ব্যাকুলতা থাকে না। এই জীবন নিরুদ্যম ও ব্যর্থ, তার শেকড়ে নেই জলের তৃষ্ণা, শাখায়-শাখায় নেই আকাশের প্রত্যাশা। ছিন্নমূল জীবন মীমাংসা-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্যুত বলেই তা দর্শনবিহীন নন্দনরহিত। এমন অপ-জীবনের উদ্দেশে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক উচ্চারণ করেছিলেন ধিক্কার : 'অসূর্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।' অধিবিদ্যাগত অনুষঙ্গ বর্জন করে যদি পুনঃপাঠ করি, আত্মহনন মানে হতে পারে মীমাংসা-যোগ্যতা সম্পর্কে নিস্পৃহ নিরাবেগ নিরেট মানুষের সত্তাবলুপ্তি। আর, তার জন্যেই বরাদ্দ থাকে নিশ্ছিদ্র পারাপারহীন অন্ধকার। এই অপমানুষের উদ্যম নেই, অপরতার অস্তিত্ব সম্পর্কে বোধ নেই। তার এপার-ওপারও নেই; নেই কোনো আরম্ভ কিংবা বিস্তার। জীবনকে সচেতন ভাবে অনুধাবন করতে পারি কেবল চলমান ঘটনা-পরম্পরার নিরিখে, কল্পিত কোনো পরাসত্তার বিভঙ্গ হিসেবে নয়। বাখতিন যখন বলেন, জীবনের দর্শন শুধুমাত্র নৈতিক দর্শন হতে পারে—অস্তিত্বের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন শৃঙ্খলার উপলব্ধির প্রতি তিনি তর্জনি সংকেত করেন। যেহেতু এই বক্তব্যের সঙ্গে তিনি মূর্ত মীমাংসা-যোগ্যতার নিরিখে সচেতন ভাবে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধির বার্তাকে মিলিয়ে নিয়েছেন—কৃত্য বা উদ্যম, তত্ত্ববীজ বা চিন্তাপ্রণালী শুধুমাত্র সর্বাত্মক আস্তিত্বিক উপলব্ধির ভিন্নভিন্ন স্তর না-হয়ে সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও নৈতিক ইতিহাসের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক আধুনিকোত্তর নির্মাণবায়ন প্রবণতা যখন মানবসত্তার সমস্ত আদিকল্প ও আকল্পকে চরম তাচ্ছিল্য ও ঔদ্ধত্য দিয়ে নিরাকরণ করছে, বাখতিনের প্রাগুক্ত মন্তব্যকে আধিপত্যবাদের উদ্দেশে কার্যকরী প্রতিস্পর্ধা বলে পুনঃপাঠ করতে পারি আজ।

যেহেতু মানুষই শুধু জীবন ও বাচনের পাঠ নির্মাণ করতে পারে এবং সম্বোধিত সত্তার উদ্দেশে প্রেরিত বয়ানের দায়ও মানুষের পক্ষেই কেবল গ্রহণ করা সম্ভব—নির্মাণবায়ন প্রবণতাকে প্রতিস্পর্ধা জানানোর জন্যে বাখতিনীয় ভাবকল্পকে নতুন ভাবে কর্ষণ করা যেতে পারে। আজকের আধুনিকোত্তর অধিবাস্তব যখন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অভিনব উৎকর্ষকে ব্যবহার করে শুধু নিশ্চিহ্নায়নের তোড়ে সময় ও পরিসরের অনুষঙ্গকে অবান্তর করে দেওয়ার জন্যে, মানুষের সঙ্গে তার জগৎ-পরিবেশের সমস্ত সম্ভাব্য সম্পর্ক মুছে ফেলার জন্যে—বাখতিনের তত্ত্ব মানুষের নির্বাসন-আশঙ্কাকে প্রতিহত করতে পারে। সাম্প্রতিক উত্তর-মানবতন্ত্রী যুগে এই মানবিক নিষ্কর্ষ পুনঃপাঠ নিছক বৌদ্ধিক কৃত্য নয়; তা আসলে যুদ্ধের ঘোষণা। বস্তুত বাখতিনের আরেকটি মহাবাক্য যেন প্রতিষ্ঠিত হয় এতে; সমস্ত তাৎপর্যই সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। উদ্যম বা কৃত্য শুধু চিন্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা মাত্র নয়, তাকে বুঝে নিতে হবে প্রত্যুত্তর হিসেবে। জগতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ব্যক্তিসত্তা যখন নিজের জন্যে কোনো তাৎপর্য গড়ে নিতে চায়, তার প্রয়াসের প্রণালীবদ্ধ অভিব্যক্তি হলো ঐ উদ্যম। সুতরাং সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উৎসারিত জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যে সত্তা নিজেকে যখন নির্মাণ করে, একই সূত্রে তার প্রত্যুত্তর-মূলক বয়ানও নির্মিত হয়ে যায়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক অনবরত বদলে যেতে-যেতে ব্যক্তিসত্তার জিজ্ঞাসাকেও সংগঠিত করে। নির্মিতি-সংলগ্ন বিভিন্ন সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সত্তা নিজেকে চিনে নেয় এবং নিজস্ব অস্তিত্বের তাৎপর্যও সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টিতে কীভাবে অপরিহার্য অপর সত্তার উপস্থিতি, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু একথাই বলতে পারি যে উদ্ধত প্রতাপের যাবতীয় রুদ্ধতার চক্রান্ত প্রতিহত হয় নির্মাণের মানবিক দ্বিবাচনিকতায়। এই সূত্রে যত চিহ্নায়ক বা রূপকের কথা ভাবি না কেন, তা সক্রিয় পর্যবেক্ষকের নিজস্ব উপস্থাপনার তাগিদে রচিত হয়। চেতনার পক্ষে অজ্ঞেয় কিছু নেই; আড়াল তৈরি হয় দৃষ্টিক্ষীণতায়, ধারণার একবাচনিকতায়। দেখা মানে হওয়া—চিরাগত অধিবিদ্যার এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে বাখতিন আমাদের জানিয়েছেন : কোনো বস্তুর প্রতীতি সর্বদা পর্যবেক্ষকের সঙ্গে সমান্তরাল। অর্থাৎ কোনো কিছু জানার মানে হলো তাকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন।

সুতরাং কোনো উদ্যম বা কৃত্য জীবনে ও পাঠকৃতিতে সর্বদা দৃষ্টির ঘোষণা, দৃষ্টির নির্মিতিও। জীবন বা বয়ানকে আধিপত্যবাদ যখন রুদ্ধ করতে চায়, অস্তিত্বের প্রকরণ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক অপরতার পরিসরও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। বাখতিনীয় ভাবকল্প অনুযায়ী সত্তা যখন 'দৃষ্টির উদ্বৃত্ত'-তে আস্থা প্রকাশ করে, প্রতাপের একবাচনিক স্থিতি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। 'দৃষ্টির উদ্বৃত্ত' মানেই সীমাতিযায়ী অবস্থানে বিশ্বাস ঘোষণা। বহির্জগৎ সম্পর্কে সচেতন মানুষই কেবল তেমন দৃষ্টির অধিকারী। আর, উদ্বৃত্তে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে মানবিক পরিসরে একাধিপত্যের আশঙ্কাতেও বিচলিত হয় না পর্যবেক্ষক সত্তা। জীবনের নির্মিতি-প্রকল্প পরাভূত হয় না। সত্তাকে যেহেতু প্রকল্প হিসেবে ভেবে নিতে হয়, তার পুনর্নবায়ন অক্ষুণ্ণ থাকে সর্বদা। প্রতিটি সত্তাই যেহেতু সহযোগী সত্তা অর্থাৎ সত্তার ধারণা অনিবার্য ও নিষ্কর্ষগত ভাবে সামাজিক, সত্তার বয়ান নির্মাণে পারস্পরিক সহযোগ অব্যাহত থাকে। সর্বত্র ব্যাপ্ত

আধুনিকোত্তরবাদী চিন্তা-সন্ত্রাসের পর্যায়েও ঐ সংযোগের মৌল সম্ভাবনা আচ্ছন্ন হতে পারে না। এ কেবল বিশ্বাস নয়, এ হলো আস্তিত্বিক ও সামাজিক তথ্য। এই মৌল তথ্যের বিরুদ্ধে যাওয়া চলে না কেননা হওয়ার বিরুদ্ধে যেতে পারে না কেউ। বলা বাহুল্য, এই হওয়া কাঙ্ক্ষিত নয় শুধু, এ আসল জৈবিক ও ঐতিহাসিক ভাবে অপরিহার্য।

পাঁচ

বাখতিনের প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা বিষয়ক ভাবনায় তাই 'যোগ্যতা' কথাটি শেষ পর্যন্ত সর্বজনীনতার ইঙ্গিত বয়ে আনে। কেননা মানবিক সত্তার প্রকল্পকে নির্মাণ করতে গেলে এই যোগ্যতা শুধু প্রত্যাশিত ঘোষণামাত্র থাকে না। মানবিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে এ হলো ন্যূনতম অভিজ্ঞান। নিরন্তর উত্থাপিত জিজ্ঞাসার জবাব তৈরি করতে হবে মানবিক দায়বদ্ধতার তাগিদে। নইলে নিশ্চরিত্র বা লক্ষ্যশূন্য যথাপ্রাপ্ত জগৎ রূপান্তরিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত তাৎপর্যের অভিমুখী হবে না। উদ্যমের মধ্য দিয়ে নিজস্ব জগৎ ও তার মূল্য গড়ে তুলতে হবে। কোনো তাৎপর্যই পূর্বনির্ধারিত নয় বা কোনো জগৎই তাৎপর্যের নিরিখে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অজস্র অপরতার সঙ্গে গ্রথিত মানুষই প্রকৃত স্রষ্টা এবং অর্জিত তাৎপর্যের ভোক্তা। নির্মিতির দিক দিয়ে কেউ এগিয়ে বা কেউ পিছিয়ে থাকতে পারে; কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয় না। তবে ন্যূনতম প্রাক্‌শর্ত হলো, উদ্যমের নির্মিতিতে নিছক প্রয়োজন নয়—দায়বোধের অভিব্যক্তি ঘটবে।

মূল্যনিরপেক্ষ জীবন যাপন করা কোনো সচেতন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা ইতিহাসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না বিশেষ সময় ও পরিসরের অন্তর্বয়নকে। সওয়াল তৈরি করতে করতে আর জবাব খুঁজতে খুঁজতে পার হয়ে যায় জীবন। কতবার বাহির ও ভেতরের সংজ্ঞা ও অবস্থান পালটে যায়, বিভিন্ন অবস্থানের অভ্যন্তরীন সীমানা রূপান্তরিত হয়। তবুও অব্যাহত থাকে মীমাংসা-যোগ্যতা অর্জন করার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াই রচনা করে ব্যক্তি-জীবন ও সামূহিক জীবনের ইতিহাস; উদ্যম ও চিন্তার সন্দর্ভে বারবার পুনঃপঠিত হয় অনন্যতা। মুক্ত ও সমাপ্তি-বিহীন জীবনের বহুমাত্রিক সময় ও পরিসরের নির্মিতি-প্রকরণকে অনুধাবন করতে করতে ব্যক্তি-অস্তিত্বের উপকূল-রেখায় পৌঁছে যাওয়া : এই হলো বার্তা। মীমাংসা এক অসমাপ্ত প্রকল্প—এই জেনে সম্ভাব্য প্রত্যুত্তরের জন্যে অনবরত তৈরি হতে থাকা—এরই নাম জীবন।

যখন মনে রাখি যে গভীরতম এই দার্শনিক উপলব্ধিকে বাখতিন ভাষা ও সাহিত্যে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন কিংবা সত্তা ও অপরতার দ্বিরালাপে যুক্ত করেছিলেন সৃষ্টি, রচয়িতা ও কর্তৃত্ববোধের স্বভাব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাকে—সম্বোধ্যমানতার বহুস্বরিক প্রক্রিয়া আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, ধর্মতাত্ত্বিক ভাবনা ও ধর্ম-নিরপেক্ষ চিন্তাধারাকে বাখতিন একই ভাবে তাঁর চিন্তাবিশ্বের মুক্ত পরিসরে ব্যবহার করেছেন। তবে এ সম্পর্কে বিতর্কেরও অবকাশ আছে। এ সম্পর্কে আর কিছু কথা না-বলে আমরা বরং দীপায়নোত্তর জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের প্রেক্ষিতে বাখতিনের রচয়িতা-পাঠকৃতি-প্রত্যুত্তরযোগ্যতা-নির্মিতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রকল্পে

নিহিত নতুন ধরনের তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করব। দৈনন্দিন জীবনের বাচনে নিয়ত যেসব বয়ান রচিত হয়ে চলেছে, তাদের সঙ্গে সাহিত্যিক পাঠকৃতিরও নিষ্কর্ষ-সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বুঝে নেব, কেন বাখতিনের দার্শনিক নৃতত্ত্বে মানুষ হওয়ার অভিজ্ঞান হলো তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠা। 'to be human is to mean'—এভাবে বাখতিনের কেন্দ্রীয় আকল্পের অন্তঃসার তুলে ধরে। হলক্যুইস্ট লিখেছেন : 'Human being is the production of meaning, where meaning is further understood to come about as the articulation of values.' (১৯৯৫ : একচল্লিশ)।

মানুষ যেমন তাৎপর্য সৃষ্টি করে, তেমনই তাৎপর্যও তাকে রচনা করে চলেছে। ইতিহাসের সঙ্গে অপরিহার্য দ্বিবাচনিকতায় মূল্যমানের অভিব্যক্তিও রূপান্তরপ্রবণ মানুষের সঙ্গে অনবরত বদলে চলেছে। পাল্টে যাচ্ছে সম্পর্ক, সত্তার নান্দনিক ও দার্শনিক বৈধতা, উদ্যমের আকরণ ও নির্যাস। এ আসলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তীব্রতর হয়ে-ওঠা সংঘর্ষের বয়ান। স্বভাবত এই সংঘর্ষ বদলে দিচ্ছে উচ্চারণের অন্তর্বৃত বিন্যাস এবং অপর সমস্ত উচ্চারণের সঙ্গে তার দ্বিরালাপের বৈশিষ্ট্যও। আগেই লিখেছি, আধিপত্যবাদের কৃৎকৌশল প্রত্যাখ্যানের শক্তিও অর্জিত হচ্ছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে। ইতিহাসই যোগান দিচ্ছে দৃষ্টির উদ্বৃত্ত, নিরন্তর মিথষ্ক্রিয়ার উত্তাপ। কোনো বিশেষ সময়পর্বে কিংবা পরিসরে পাঠকৃতিতে তথ্য যে রূপান্তরিত হচ্ছে চিহ্নায়কে কিংবা চিহ্নায়কপুঞ্জও বিশেষ পরিস্থিতিতে তথ্যপুঞ্জে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, তারও নির্ণায়ক ইতিহাস। মনে পড়ে, তাৎপর্যকে বলা হয়েছে বিশিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর সময়বাহিত সম্ভাবনার প্রকাশ (Communal possibility)।

অন্যভাবে বলা যায়, বহু ব্যক্তিসত্তার সমবায়ী উপস্থিতি কোনো বিশেষ কালে-পরিসরে-জনসন্নিবেশে যখন নির্দিষ্ট কিছু জিজ্ঞাসা-প্রকরণ ও সম্ভাব্য মীমাংসা-প্রয়াসের আকল্প নির্মাণ করে নেয়—বিশেষ ধরনের তাৎপর্যসন্ধান ব্যক্ত হয় দার্শনিক ও নান্দনিক উদ্যমে। এমন ঘটে দ্বিবাচনিক সংযোগ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। কোনো কারণেই এই মৌলিক বিধি এড়ানো যায় না। বাখতিন বলেন : 'to be means to communicate dialogically. When the dialogue ends, everything ends.' (১৯৮৪ : ৮৬)। যেহেতু এই সংযোগ শুধু তথ্যের নয়, চিহ্নেরও অর্থাৎ বাচনের সঙ্গে পরাবাচনের—ইতিহাস-নির্দিষ্ট বস্তুবিশ্ব এবং নির্যাস-কেন্দ্রিক চিহ্নবিশ্ব যুপগৎ বিচার্য। মানুষের ইতিহাসের পক্ষে যাঁরা দাঁড়াতে চান, প্রতিবেদনকে 'communal engagement' বলে জেনে বাচনকে 'দ্বিমুখী কৃত্য' হিসেবে ব্যবহার করা তাঁদের শিখে নিতে হয়। কৃত্যের এই উভচারিতা সম্পর্কে যিনি অবহিত, তাঁর কাছে প্রত্যুত্তরযোগ্যতা অর্জন করার প্রক্রিয়া ও লক্ষ্য সর্বদা দ্বিবাচনিক। বাচনের উৎসে কারা রয়েছে এবং কাদের উদ্দেশে বাচন উৎসারিত হচ্ছে—এই দুটি পক্ষ সমানভাবে কৃত্যের স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ নির্মাতা এবং নির্মাণের লক্ষ্য : দুটোই প্রতিবেদনের নিয়ামক। তাই আস্তিত্বিক সংগঠনের সঙ্গে উচ্চারণ-বিন্যাসের দায়বোধ তাঁরাই স্বীকার করে নিতে পারেন, যাঁরা নিজেদের সঙ্গে বহির্বৃত জগতে ব্যাপ্ত অপর পরিসরগুলির অনন্যতাও সমানভাবে স্বীকার করেন।

কৃত্য বা উদ্যম (deed) বাখতিনের কাছে বাচন ও ক্রিয়া—দুই অর্থই দ্যোতিত করে। কীভাবে তাৎপর্য উপলব্ধ হতে পারে এবং বাচন হয়ে উঠতে পারে শরীরী বাস্তব—এই

জিজ্ঞাসার সূত্রে তিনি রচনাপ্রক্রিয়া, রচয়িতা ও নায়কসত্তার পার্থক্য, সত্তা ও অপরতার ব্যবধান ইত্যাদি প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। লেখক/প্রতিবেদক বাখতিনের কাছে কোনো একবাচনিক ও স্থিরীকৃত অস্তিত্ব নয়; কৃত্যের সঞ্চালক হিসেবে তা বিশিষ্ট দক্ষতা ও শক্তির পারিভাষিক নাম। তাই স্রষ্টা-লেখক আর লেখক-ব্যক্তি হুবহু এক হতে পারে না। সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠে তার প্রকল্পে; ব্যক্তির জৈবিক অবস্থানের সঙ্গে সত্তাকে পুরোপুরি মেলানো যায় না। তেমনি লেখক-স্রষ্টাও বিশিষ্ট উপস্থিতি; কৃত্যের নিরিখে নির্ণীত হয় তার অভিজ্ঞান। সৃষ্টির প্রক্রিয়া যখন চলমান, সাধারণ অবস্থান থেকে লেখক-সত্তা উন্নীত হয় 'বিশেষ' অবস্থানে। নানা ধরনের অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত সংঘর্ষ আছে সত্তার। তারই মধ্যে স্রষ্টা-প্রতিবেদকের সংঘর্ষ আরও একটু আলাদা। এই সংঘর্ষ যেমন কৃত্যের হয়ে ওঠায় অনুভূত হয়, তেমনি লক্ষ করা যায় সন্দর্ভে বিভিন্ন কুশীলবের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোনের উপস্থাপনায়, বিশেষত নায়কসত্তার রচনায়। পাঠকৃতির মধ্যে বিভিন্ন পরিসরের উপস্থিতি ও উচ্চারণের বহুত্ব যে মূলত উপস্থাপিত দৃষ্টিকোনের বহুত্ব—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্রষ্টা-প্রতিবেদকের সংঘর্ষময় তাৎপর্যসন্ধান এভাবেই পাঠকৃতিকে বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক করে তোলে।

বাখতিন লিখছেন : 'The Artist's struggle to achieve a determinate and stable image of the hero is to a considerable extent a struggle with himself' (১৯৯৫ : ৬)।

এই বিষয়টি এমন যা সূক্ষ্ম বা সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দাবি করে। এখানে যে আত্মগত সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠকৃতিতে তার অভিব্যক্তিও ভিন্ন ভিন্ন। নায়কসত্তায় থাকে কেন্দ্র ও পরিধির টানাপোড়েন, প্রতিবেদক ও অপরতার আততি। কেননা তার অন্বিষ্ট উপস্থিতিতে লেখকস্বরের অনুপস্থিত অস্তিত্ব কখনো কখনো অনতিক্রম্য। লেখক যেহেতু 'secret legislator of the text' (১৯৮৪ : ৮৯), নায়কসত্তার সার্বভৌমত্ব শুধুই প্রতীয়মান। তবে যখন উত্তমপুরুষ কথকের বয়ানে ঐ সত্তা উপস্থাপিত, প্রত্যুত্তরযোগ্যতা ও নির্মিতি-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ নানাভাবে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। বাঙালি পাঠকের কাছে *রজনী, চতুরঙ্গ, জাগরী, বিবর* কিংবা *কঙ্কাবতী, পথের পাঁচালী, অন্তঃশীলা, কাঁদো নদী কাঁদো, হারবার্ট, খোয়াবনামা* অথবা *বিষবৃক্ষ, গোরা, ঘরে-বাইরে, পুতুল নাচের ইতিকথা, গণদেবতা, অন্তর্জলী যাত্রা, অরণ্যের অধিকার* প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকসত্তা-নায়কসত্তা-কথকসত্তার দ্বিবাচনিক নির্যাস যেভাবে ধরা পড়ে, তা নিবিড় বিশ্লেষণের বিষয়। বাখতিনীয় আকল্প অনুযায়ী প্রাগুক্ত সত্তাগুলির আন্তঃসম্পর্ক ঐসব উপন্যাসে নানা ধরনের জিজ্ঞাসার সমান্তরালতা ও অজস্র মীমাংসা-প্রয়াসে দেখতে পাই। এইসব সত্তার অভিব্যক্তিতে যত বিভঙ্গ লক্ষ করি, সেইসব অন্তঃস্বরের সমারোহ সম্পর্কে অবহিত করে আমাদের। এই সমারোহে চূড়ান্ত মীমাংসা নেই, আছে শুধু মীমাংসা-প্রয়াসের নিরবচ্ছিন্ন আর্তি। নির্মিতির বিবিধ বর্গ হিসেবে এইসব মূলত সত্তা ও অপরতার মৌল পার্থক্য ও সমান্তরালতার যুগলবন্দি। ঐ প্রত্যয়ের নানা অভিব্যক্তি শেষ পর্যন্ত জেগে থাকে কেবল 'architectonics of consciousness.' (তদেব. ৯৪)-এর চূড়ান্ততাহীন বিচ্ছুরণ নিয়ে।

তত্ত্ববিশ্ব, মার্ক্সীয় প্রেক্ষণে

প্রতিটি উচ্চারণ মূলত সামাজিক ক্রিয়া আর কোনো অস্তিত্বই কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—এমন কথা যিনি বলেন, তাঁর প্রতিবেদনে বৌদ্ধিক বিদ্যুচ্চমক থাকে না কেবল। থাকে চেতনার সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ও, একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া চেতনা মানে অপরতা যাঁর কাছে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় প্রতিবেদনে থাকবে মাটি ও আকাশের দ্বিবাচনিক বিনিময়—এও প্রত্যাশিত। তিনি, মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন, নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ জেনেছেন প্রতীয়মান বাস্তবের মধ্যে অজস্র সমান্তরাল বাস্তবের অস্তিত্ব। জেনেছেন, জীবনের প্রতিবেদন কখনো একটিমাত্র স্বরের বিন্যাস নয়; স্বর থেকে স্বরান্তরে যেতে যেতে নানা উচ্চাবচতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সুরসংহতি, সমবায়ী উচ্চারণের সামাজিক প্রত্যয়। জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে যে দার্শনিক বীক্ষা বাখতিন প্রস্তাব করেছেন, তাতে দেখি, কোনো তাৎপর্য পুরোপুরি হারিয়ে যায় না কখনো। একদিন না একদিন নতুন প্রতীতি, নতুন উপলব্ধির আকরণ নিয়ে ফিরে আসে। তাঁর মতে, এ যেন নীড়ে-ফেরার উৎসব। বৃন্তহীন পুষ্পের মতো কোনো কিছু বিকশিত হতে পারে, একথা বাখতিন মানেন না। তিনি যখন বলেন, প্রতিটি সত্তা সহযোগী সত্তা আর জীবন মানে সত্তার সহযোগিতার নিরন্তর ঘটনা-পরম্পরা এবং সংগঠন—সেসময় তাঁর সামাজিক প্রেক্ষণের আদল স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরো। *রাবেলে ও তাঁর জগৎ* বইতে বাখতিন এই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন, যে, হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শেষ হয় না কখনো, সম্পূর্ণ হয় না পরিধি। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তা গড়ে ওঠে, মুখর হয় নতুন সৃষ্টিতে। এক পরিধি থেকে অনবরত তৈরি হতে থাকে আরেক পরিধি। এই সংগঠন একদিকে শুষে নেয় জগৎকে, আবার অন্যদিকে জগৎও শুষে নেয় সত্তার সংগঠনকে। জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি নিবিড়ভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত এবং অন্তর্বয়নের সূত্রে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত।

অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিতে চলেছে দ্বিরালাপ। সত্তার সংগঠনে জাগতিক অনুপুঙ্খগুলির দ্বিবাচনিক বিনিময় থেকে একই সঙ্গে ফুটে উঠছে ঐক্য ও অনৈক্য, সঙ্গতি ও বিসঙ্গতি। মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাচনই প্রকাশের ভিত্তি—একথা না লিখলেও চলে। ভাষার মধ্য দিয়ে জীবন ও জগতের সঙ্গে অহরহ যে-সম্পর্ক গড়ে তুলছি, বাচনের মধ্যে তার স্পষ্ট আদল ফুটে ওঠে। এই বাচন হয় দুইয়ের মধ্যে; নিজে-নিজে তা কখনো ব্যক্ত হতে পারে না। অপর অস্তিত্ব দর্পণের মতো সত্তাকে প্রতিফলিত করে; কিংবা প্রতিফলিত-ই করে না কেবল, একে অপরকে প্রমাণিতও করে। অপরের ধারণা না-থাকলে সত্তার প্রতীতিও অসম্ভব। প্রতিদিনের সামাজিক ব্যবহারে সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন একে অপরের কাছে উন্মোচিত হই এবং সেই সূত্রে জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করি, যাচাই করে নিই—তেমনি এই সংলাপের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আমাদের কথনবিশ্ব। বাখতিন এই অতিপরিচিত ব্যবহারিক অনুপুঙ্খকে পারিভাষিক মর্যাদা দেননি কেবল, একে তাঁর তত্ত্ববিশ্বের মুখ্য আকল্প করে তুলেছেন।

দু'জন মানুষের সংলাপে কথক ও শ্রোতার কথা বলা ও কথা শোনার মধ্যে বিনিময়ের সেতু গড়ে ওঠে। দুজনের সমান্তরাল অস্তিত্ব তাতে স্বীকৃত হচ্ছে যেমন, তেমনি দুইয়ের অবস্থানগত পার্থক্যও স্পষ্ট। স্বভাবত তাদের উচ্চারণও পরস্পর থেকে আলাদা হবে। দেরিদা যাকে 'পার্থক্য-প্রতীতি' বলেন, বাখতিনও সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। সংলাপের পারিভাষিক রূপান্তরের ফলে যা হয়ে উঠল দ্বিবাচনিকতার দার্শনিক ভূমি, তাতে বিনিময়ের গভীরতর বিচ্ছুরণ থেকে নানা ধরনের সম্ভাবনার উপকূলরেখা জেগে উঠেছে। এইসব সম্ভাবনার মধ্যে চলেছে আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস যাকে বাখতিন 'mutuality of differences' বলতে চেয়েছেন। নিরবচ্ছিন্ন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বিপুল সমগ্রের আয়তনে পৌঁছাতে হয় বলে কোনো একক সত্তার আধারে তাকে সম্পূর্ণ ধারণ করা অসম্ভব। সত্তা ও অপরতার সম্পর্ক বারবার ছেদহীন নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যখন গৃহীত ও পুনর্গৃহীত হয়—কেবলমাত্র তখনই তাৎপর্যের দ্বিবাচনিক গ্রন্থনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই যে গ্রন্থনার কথা বলছি, ধারাবাহিক বিনিময়ের ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠে। স্বভাবত তাৎপর্যও একান্তিক নয়, অনেকান্তিক। অপরতার উপলব্ধি ছাড়া চেতনা যেহেতু অপ্রতিষ্ঠ, সত্তা কখনো স্বনির্ভর প্রকল্প নয়। জীবন ও জগতের সমস্ত অনুপুঙ্খের মতো অস্তিত্বও আসলে এক নির্মিতি; কিন্তু তা নিজে-নিজে পূর্ণ হয়ে ওঠে না। কেন্দ্র ও পরিধির টানাপোড়েনে ব্যক্ত পার্থক্যভিত্তিক সম্পর্ক অর্থাৎ সম্পর্কের দ্বিবাচনিকতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরকে অনবরত নির্মাণ করে চলেছে। বাখতিন মনে করেন এই পার্থক্য যেমন আপেক্ষিক তেমনি দীর্ঘায়ত। দ্বিবাচনিক দর্শন অনুযায়ী তাই সমস্ত তাৎপর্য আপেক্ষিক এবং প্রতিবেদনের উপসংহার আসলে আপাত-সমাপ্তি। পরবর্তী কালে ও পরিসরে তাৎপর্য পুনর্নবায়িত হয় বলে মুক্ত উপসংহারের প্রতীতি সাম্প্রতিক তত্ত্ববিশ্বে এত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিক সন্দর্ভে, নান্দনিক প্রেক্ষিতে, সামাজিক চর্যায় রাজনৈতিক প্রতিবেদনে এই সত্যই সমর্থিত হচ্ছে বারবার। বাখতিন জানিয়েছেন, অস্তিত্বে অন্তর্বৃত পার্থক্য দূর করা যায় না কখনো কেননা 'Separateness and simultaneity are basic conditions of existence' (১৯৯০ : ২০)। ধারাবাহিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কোনো-একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের তাৎপর্য যখন অন্য আরেকটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, ঐ প্রক্রিয়ায় দুটি স্তর যুগপৎ সত্য হয়েও পৃথক পরিসরে বিরাজ করে। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বাখতিনের ভাববিশ্বে পুনর্নির্মিত হয়েছে। আইনস্টাইনের মতো বাখতিনও পর্যবেক্ষকের অবস্থানকে মৌলিক বলে ভেবেছেন, কারণ, আন্তঃসম্পর্কের তাৎপর্যে দ্বিবাচনিক বিন্যাস যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ঐ সম্পর্কে উপলব্ধির জন্যেও চাই উপযুক্ত প্রেক্ষণবিন্দু। সমান্তরালতার সম্পর্ক বিন্যাসে ঐ পর্যবেক্ষকও নিরাসক্ত দ্রষ্টা নন, সক্রিয় সহযোগী। তার মানে, তিনি যেমন পর্যবেক্ষণ করেন, তেমনই নির্মীয়মান সন্দর্ভের অংশভাক হয়ে নিজেও তাৎপর্য উপপত্তির অন্যতম প্রকরণ হয়ে ওঠেন। সুতরাং দ্বিবাচনিক পদ্ধতিতে সত্তা এবং সত্যের প্রতীতি থেকে আমরা এই বুঝি যে, বাস্তবতার নিষ্কর্ষ কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে না। তাকে সর্বদা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। আর, এই অর্জন সম্ভব কেবল নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে : 'Everything is perceived from a unique position in existence' (তদেব : ২১)।

যখন একথা বলি, মার্ক্সীয় প্রেক্ষণের সঙ্গে এই ভাবনার সাযুজ্য চোখে পড়ে। কারণ

'নির্দিষ্ট অবস্থান' আর কিছুই নয়, ভাবাদর্শগত অবস্থান। আধিপত্যবাদী বর্গের স্থিতি যখন বিনা দ্বিধায় মেনে নিই, প্রতাপের ভাবাদর্শ আমাদের মধ্য দিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক আর সোনার পাথরবাটি একই কথা। ইতিহাসের মানুষ হিসেবে যখন ঐতিহাসিক সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করি, নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই গড়ে তুলি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে ভাবাদর্শের উপযোগিতা পরখ করে না-নেওয়া পর্যন্ত সত্যের স্ফুরন হতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াকে বুঝি কেবল ভাবাদর্শগত প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। সুতরাং বাখতিনের কাছে যদি এই পাঠ নিই যে সত্তা হলো আকরণযুক্ত ঘটনার অন্য নাম এবং সত্তার আকরণ বিন্যস্ত হতে পারে কেবল সময় ও পরিসরের বর্গায়তনে—তাহলে বুঝতে পারি, মার্ক্সবাদ প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বমূলক দর্শন এবং বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায়োগিক উপলব্ধির নির্যাস এই ভাবনায় উপস্থিত। অপরতার প্রেক্ষিত ছাড়া ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা ঐতিহাসিক সত্য নিরূপিত হতে পারে না। এই বাখতিনীয় আকল্পের সঙ্গে মার্ক্সীয় তাৎপর্যবাদের আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তিনি বলেছেন, 'There is no figure without a ground' : তদেব : ২২)। আরো বলেছেন, মানুষের মনের কাঠামোটা এরকম যে জগৎকে বিপ্রতীপ দর্পণে না-দেখা পর্যন্ত অর্থপ্রতীতি হয় না। মার্ক্সবাদও প্রসঙ্গ বিচ্যুত সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না; জানে যে সত্য অচল অনড় নয় বলেই পরিস্থিতি অনুযায়ী তার রূপান্তর হয়। এই পরিস্থিতি নিছক যান্ত্রিক অবস্থান নয়, ইতিহাসনিয়ন্ত্রিত ভাবাদর্শ এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অজস্র দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে জীবন। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ইয়ুরি খারিন লিখেছেন, 'The world is not a chaotic agglomeration of isolated things but an integral totality of interacting phenomena. The relations between objects and their properties, manifested in their mutual determinacy, conditionallity and dependency, are expressed in the concept of connection.' (১৯৮১ : ১১১)। এই বক্তব্য থেকে বাখতিনের ভাববিশ্ব খুব বেশি দূরে নয় নিশ্চয়।

বাখতিনের অন্যতম প্রধান আকল্প হলো, যেসব ক্রিয়া আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে পারে এবং সামাজিক সংযোগের সেতু গড়তে পারে—শুধুমাত্র তাদেরই রয়েছে তাৎপর্য বহনের যোগ্যতা। নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি তাদের প্রেরণা দেয় ও শক্তিমান করে তোলে। মানুষের জীবন , চিন্তা এবং উচ্চারণ : সমস্তই যেন বহুস্বরিক সংযোগ ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন আয়তন। অর্থোপপত্তি যা-থেকে হয় না, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে এমনও হতে পারে যে, সাধারণ প্রচলিত পরিধির মধ্যে তাৎপর্য-প্রতীতি হলো না। সেক্ষেত্রে পরিধি-বহির্ভূত কোনো প্রেক্ষণবিন্দু থেকে অর্থবোধ হওয়া সম্ভব। এও আসলে অপরতার দর্শন। যেমন, ধরা যাক, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারো জীবনের নিষ্কর্ষ চূড়ান্তভাবে বুঝতে পারি যখন মৃত্যুর দর্পণে ঐ জীবনবৃত্তকে প্রতিফলিত হতে দেখি। তেমনি কোনো সমাজে একটি পর্যায় যখন শেষ হয়, সেসময় ঐ পরিসরের বাইরে গিয়ে তার যথার্থ পরিমাপ করতে পারি। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার পরে যেমন এখন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আলো ছায়ার অর্থোপপত্তি হচ্ছে। এখানেও অবশ্য পর্যবেক্ষকের

ভাবাদর্শগত অবস্থান এবং তাঁর উচ্চারণের প্রকৃত তাৎপর্য ও নিহিত শক্তি অনুধাবন করা সম্ভব হলো সময় ও পরিসরের ভিন্ন পর্যায়ক্রমে গিয়ে। অর্থাৎ বাখতিনের মৃত্যু-পরবর্তী বিশ্বে—প্রতীচ্যে এবং প্রাচ্যে, আধুনিকোত্তর এবং উপনিবেশোত্তর সমাজে—ভাবাদর্শগত অবস্থান অনুযায়ী তাঁর ভাবনা গৃহীত, পরীক্ষিত ও পুনরুদ্‌ভাসিত হচ্ছে। তেমনি আমাদের নজরে পড়ছে, বাখতিনের জীবৎকালে স্বদেশে তিনি কিন্তু ঈপ্সিত মাত্রায় গৃহীত হননি কেননা তাঁর রচনা প্রকাশিত হওয়াই কঠিন ছিল। এমনকি, দীর্ঘকাল সোভিয়েত সমাজে তিনি প্রত্যাখ্যাত অপর হিসেবে নির্বাসিত, কার্যত মৃত, হয়েই ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষ অবস্থানের বিচারে ধনবাদী প্রতীচ্যের যে-সমস্ত দেশ ছিল বহুদূরবর্তী অপর, তাদের মধ্যেই নবজন্ম ঘটল বাখতিনের। তাঁর রচনা অনূদিত, প্রকাশিত, ব্যাখ্যাত হওয়ার পরে নতুন তাৎপর্যে পুনরাবিষ্কৃত হলো। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যাঁদের তিক্ত অনীহা সর্বজনবিদিত, তাঁরা বাখতিনের উচ্চারণে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী অন্তর্ঘাতের প্রতিসন্দর্ভ খুঁজে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। দ্বিবাচনিকতার প্রতিবেদন তাঁদের কাছে কার্যত ট্রয় যুদ্ধের কাঠের ঘোড়া বলে বিবেচিত হলো।

তার মানে, পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সমর্থকদের কাছে বাখতিনের তত্ত্ববিশ্ব সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতিস্পর্ধী আয়ুধের যোগানদার। এঁরা এই দাবি পেশ করলেন যে মহান তাত্ত্বিকের স্বদেশে স্বকালে যেসব উচ্চারণ পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল—তাঁরা তাদের মুক্তি দিয়েছেন। তাঁরা এই সহজ সত্য মনে রাখলেন না (কিংবা, বলা ভালো, রাখতে চাইলেন না) যে বহুবিধ দ্বিবাচনিকতায় সমৃদ্ধ সোভিয়েত ইতিহাসের নির্যাস অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন সত্যের উদ্‌ভাসন অসম্ভব। এ ধরনের চিন্তা করার অর্থ বাখতিনের যুক্তিশৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে দেওয়া। কোনো বাচনের আয়ুষ্কাল উচ্চারণের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর নির্ভরশীল, একথা যিনি ভাবতেন, তাঁকে ইতিহাস-নির্ধারিত অবস্থান বিশ্লেষণ করেই বুঝতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ে বাচনের তাৎপর্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ, পরীক্ষিত, সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেডভেভেভ ও ভোলোশিনোভের নামে প্রচলিত রচনাকেও বাখতিনের বহুস্বরিক ভাববিশ্বের ফসল বলে গ্রহণ করছি। তাছাড়া, ধনবাদী প্রতীচ্যে সোভিয়েত ইতিহাস যতটা একবাচনিক ভাবে অবিশ্লেষনাত্মক ভঙ্গিতে গৃহীত হয়ে থাকে, তাকে মেনে না-নিয়ে বরং সমাজতন্ত্রের অন্তর্বর্তী দ্বিবাচনিক পরিসরকে পুনঃপাঠ করা উচিত। বাখতিনের উচ্চাবচতাময় জীবনের বিচিত্র সন্দর্ভ তো ঐ দ্বিবাচনিকতার প্রমাণ। অন্যভাবে বলা যায়, সময় ও পরিসরের বিশিষ্ট পর্যায়ক্রমেই বাখতিন-মেডভেভেভ-ভোলোশিনোভের সমান্তরাল উদ্ভব সম্ভবপর। এই পর্যায়ক্রমকেই প্রথম বুঝতে হবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার মতো; নইলে বাখতিনের ভাববিশ্ব-সঞ্চালক 'mutuality of differences' এর তাৎপর্য হারিয়ে যাবে আমাদের বিশ্লেষণ থেকে। তাঁর অভিপ্রেত প্রতিবেদন থেকে আমরা ইতিহাসের সামীপ্যের বদলে কেবলই আবিষ্কার করব মিথ্যা আত্মতার অন্তর্ঘাত। তাই বাখতিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে আধুনিকোত্তর বা উপনিবেশোত্তর জগতের অধিবাসী হিসেবে, আমরা যত দূরবর্তী অপর হই না কেন—ইতিহাসের নির্দিষ্টতাকে বুঝতে হবে সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য পূর্ণতায়।

দুই

একটি বিখ্যাত চীনা প্রবাদে এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয় : 'তোমাদের কাউকে যেন গুরুত্বপূর্ণ বা ঘটনাবহুল বা আগ্রহোদ্দীপক সময়ে বাঁচতে না হয়।' তাহলে, ঝড়ের মুখে কুটোর মতো বা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নৌকোর মতো তাকে হারিয়ে যেতে হবে— এই হলো মোদ্দা আশঙ্কা। মিখায়েল বাখতিনের মতো আর ক'জন চিন্তাবিদকে এত বেশি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে বাঁচতে হয়েছিল, তা বলা কঠিন। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন রুশ সমাজে ইতিহাসের রৈখিকতা ভেঙে দিচ্ছিল, তখন বাখতিন বাইশ বছরের তরুণ। বিপ্লবের আগে এবং পরে দ্বিধা-সংশয়-প্রত্যয়ের দোলাচল এবং ঘাত-প্রতিঘাত তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে শুষে নিয়েছিলেন। লেনিনের গঠনমূলক নেতৃত্ব থেকে স্ট্যালিনের একান্তিক নেতৃত্বে বিবর্তন এবং তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তিনি পর্যবেক্ষণ করেননি কেবল, তাঁকে ভুক্তভোগীও হতে হয়েছিল। তাঁর আকল্প অনুযায়ী বলা যায়, যুগান্তকারী ইতিহাসের অনিবার্য তাড়নায় তাঁকে নিতে হয়েছিল সক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা। তিনি গৃহযুদ্ধ দেখেছেন, নাজি আক্রমণের ভয়াবহতা দেখেছেন। বিপ্লবোত্তর কালে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নতুন জীবনস্বপ্ন ও উৎসাহের উত্তাপ অনুভব করেছেন এবং ত্রিশের দশকে স্বপ্নভঙ্গের শৈত্য, মতান্ধতা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও প্রত্যক্ষ করেছেন। ফ্যাসিবাদ দেখেছেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিরোধও দেখেছেন; হিমযুদ্ধের আমলে সাংস্কৃতিক অবসাদ, ক্রুশ্চেভ জমানার সংশোধনবাদ, ব্রেজনেভ পর্বের আদর্শচ্যুতি—একাদিক্রমে এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার এমন অভাবনীয় ভাবে যাঁর কাছে উন্মুক্ত হতে পারে, তিনি তো গভীর অনুভূতি দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ করবেন সমাজে-ইতিহাসে। বহ্নিমান সময়পর্বে যিনি ভেবেছেন এবং লিখেছেন, তাঁকে কেবল ব্যক্তি-সত্তা হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল হবে। তিনি আসলে সময়-প্রতীকী অস্তিত্ব; ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তাঁর নিরন্তর সংগঠিত দ্বিবাচনিক সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। জীবন ও মনন অন্যোন্যসম্পৃক্ত তাঁর; আধুনিকোত্তরবাদের পক্ষে এক্ষেত্রে বাখতিন প্রভূত সমস্যার কারণ। শৈশব ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা তাঁকে বহুভাষায় পারঙ্গম করে তুলেছিল; আর পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনা-প্রবাহ থেকে তিনি অর্জন করেছিলেন বহুস্বরিকতার অস্খলিত প্রত্যয়।

১৯১৮ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত নেভেল ও ভিটেব্‌স্ক শহরে এবং ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত লেনিনগ্রাদে বাখতিন যে নিবিড় বৌদ্ধিক মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন—কার্যত তা-ই তাঁর চিন্তাবিশ্বের গোড়াপত্তন করেছে। তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই তখন মার্ক্সবাদী ভাবপ্রকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু এবং পরবর্তী স্ট্যালিন-আমলের মতো মতান্ধতা না-থাকাতে সব বিষয়ে তর্কবিতর্কে তাঁরা আগ্রহী। একদিকে ধর্ম ও দর্শন, অন্যদিকে ভাষাতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-সাহিত্যতত্ত্ব—সব কিছুকে তাঁরা অণুবীক্ষণের বিষয় করে তুলেছিলেন। কোনো সংশয় নেই যে ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাখতিন তাঁর তত্ত্ববিশ্বের অন্যতম প্রধান আকল্পে পৌঁছেছিলেন : প্রতিটি সত্তা সহযোগী সত্তা এবং কোনো কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। চেতনা মানে যে অপরতার উপলব্ধি এবং সত্তা হলো আসলে এক নির্মিতি—এই বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল অবশ্যই এই পর্বে। জীবনের

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ এগারো বা বারো বছর বাখতিনকে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নভঙ্গের দিকে নিয়ে গিয়েছিল হয়তো; কিন্তু অন্য অনেক চিন্তাবিদের মতো তিনি পলায়নবাদ বা আত্মরতিতে আশ্রয় খোঁজেননি। পার্থক্য ও সমান্তরালতার বোধ কীভাবে দ্বিবাচনিক আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা দেয়, তিনি নিবিষ্টভাবে লক্ষ করেছিলেন। একদিকে কঠোর দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহানি এবং অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতাপের নতুন বিন্যাস জনিত সম্ভাব্য অস্বস্তি বাখতিনকে নিশ্চয় পীড়ন করছিল। কিন্তু পাশাপাশি আভাঁগার্দ চিত্রকলার উত্থান, প্রশ্নমুখর বুদ্ধিবাদ, দার্শনিক অন্বীক্ষা, নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উত্তাপ বাখতিনকে দিচ্ছিল নতুন-নতুন চিহ্নায়কের সন্ধান। বলা যায়, এই পর্বে যেন ভিত্তি তৈরি হলো পরবর্তী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধতর আরেকটি মৌলিক উপলব্ধির : প্রতিটি তাৎপর্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। বলা বাহুল্য, মার্ক্সবাদী বীক্ষায় সংগ্রাম হলো মানববিশ্বের আধারশিলা।

বিশের দশকে বাখতিন 'নান্দনিক প্রক্রিয়ায় লেখক ও নায়ক' বিষয়ে যে-রচনাটি লেখেন, আদি পর্যায়ের সেই লেখার প্রচ্ছায়া পরবর্তী পর্যায়েও অনুভব করা যায়। নন্দনচিন্তার সঙ্গে জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বকে তখন তিনি সমন্বিত করতে চেয়েছেন। পরিণত পর্যায়ে তিনি যে জানালেন, 'কোনো তাৎপর্য পুরোপুরি হারিয়ে যায় না কখনো'—সেই সূত্র অনুযায়ী আদিরচনায় ব্যক্ত বেশ কিছু ভাববীজ এবং জিজ্ঞাসা তিনি পরবর্তী কালে পুনরুত্থাপন করেছিলেন। তরুণ বয়সেও তাঁর মনে এই বোধোদয় হয়েছিল যে জীবনের বৃত্তকে ভেতর থেকে দেখলে কখনো সম্পূর্ণ মনে হয় না। নিজেদের জন্ম এবং মৃত্যু পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি না কখনো; কেবলমাত্র অপর কোনো ব্যক্তির জীবনবৃত্ত আমাদের চোখে সম্পূর্ণ হতে পারে। এইজন্যে আমরা কিছুতেই নিজেদের জীবনকথার নায়ক হতে পারি না। নায়কোচিত সম্পূর্ণতার প্রাক্শর্ত এই যে, অন্য কেউ তাকে পর্যবেক্ষণ করবে, বাইরে দাঁড়িয়ে। সেই অপর সত্তার অবস্থান নায়কের জীবনবৃত্তের মধ্যে হবে না কখনো। বাখতিনের আকল্প অনুযায়ী প্রতিটি তাৎপর্য সমাজের দ্বারা নির্মিত ও নির্ধারিত, অতএব স্বয়ং বাখতিনও তখন ঐতিহাসিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক আয়তনের মধ্যে থেকে প্রস্তাবিত নতুন জীবনস্বপ্ন ও সামূহিক পুনর্গঠনের প্রস্তাবনাকে সঠিক তাৎপর্য বুঝতে চাইছিলেন। সম্ভবত এইজন্যে তাঁকে উপযুক্ত তাত্ত্বিক আকরণ খুঁজে নিতে হলো। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বর্গায়তনের ভেতরে থেকে যদি সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা না যায়—অন্তত সম্ভাবনায় যেতে হবে তার বাইরে। কিন্তু এর মানে কি এই যে বাখতিন সমাজতান্ত্রিক আকরণকে অস্বীকার করতে চাইছিলেন? না, একথা বলা যায় না। অতি সরলীকৃত এই ব্যাখ্যা পুঁজিবাদী বিশ্বের কাছে খুবই গ্রাহ্য হলেও সম্ভাব্য সহজ বিশ্লেষণটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বাখতিন আসলে ঈপ্সিত তাৎপর্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রেক্ষণবিন্দুর পরীক্ষা করে দেখছিলেন। সমাজতান্ত্রিক অণুবিশ্বের প্রতি প্রচ্ছন্ন কোনো প্রত্যাখ্যান তাঁর বক্তব্যে বিম্বিত হয়নি। সত্যকে আমার নির্মাণ করি নিশ্চয়; কিন্তু তা করি দ্বিবাচনিকতার মধ্য দিয়ে। এই মহাসূত্রে অবশ্য বাখতিন পৌঁছেছেন আরো কিছুকাল পরে। আপাতত তিনি লক্ষ করছিলেন, ইতিহাস-নির্দেশিত মুহূর্ত ও পরিসর সত্যের উদ্ভাসনের জন্যে অপর মুহূর্ত ও পরিসরের দর্পণের ওপর নির্ভরশীল। কী ব্যক্তিজীবনে কী সামূহিক জীবনে—এই আকল্পের প্রায়োগিক উপযোগিতা অসামান্য।

চিন্তাজীবনের শুরুতেও তাহলে বাখতিন চেতনাকে একান্তিক বলে ভাবতে চাননি। অপরতার দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক ব্যঞ্জনাকে স্তরে-স্তরে গঠন করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ধান তখন থেকেই আবশ্যিক নৈতিক মান্যতা অর্জন করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অপর ব্যক্তিদের অপরতার স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দিতে হবে—এই হলো বাখতিনের মৌল বার্তা। সোভিয়েত সমাজের রাজনৈতিক পুনর্গঠনে আলোর সঙ্গে ছায়াঞ্চলও যে প্রসারিত হচ্ছিল, তা অনুভব করেই কি তিনি গভীর সংবেদনশীলতা দিয়ে মানবস্বরূপের সম্পূর্ণ পরিসর প্রতিষ্ঠার উপায়ের দিকে তর্জনি সংকেত করলেন? এবিষয়ে সার্থক আলোচনা এখনই হতে পারে যেহতু মৃত্যুর দর্পণে তাঁর সমগ্র জীবনের কৃতি ও চিন্তার বিবর্তন প্রতিফলিত হচ্ছে। বাখতিনের জীবনবৃত্তের ভেতর থেকে নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে তাৎপর্য অর্জনের বহুস্বরিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে পারছি। ভোলোশিনোভ ও মেডভেডেভের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত বাখতিনের চিন্তাজীবনে সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রম কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে যেমন তাৎপর্য-সন্ধানের তাৎপর্য বুঝতে পারি, তেমনি মার্ক্সীয় প্রেক্ষণের প্রাসঙ্গিকতাও অনুভব করি। এখানে বলা প্রয়োজন, ১৯৭০ সালে রুশ ভাষাবিদ ভিয়াচেশ্লাভ ইভানভ প্রথম ভোলোশিনোভ ও মেডভেডেভ রচিত বইগুলিকে বাখতিনের লেখা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এবিষয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত। তবু বাখতিনের মুখ্য আকল্প অনুযায়ী সমকালীন সমাজের প্রধান উচ্চারণ হিসেবে মার্ক্সবাদী ভাবনাপ্রস্থানের সঙ্গে অন্য সব উচ্চারণের দ্বিবাচনিক বয়নকে আমরা নিশ্চয়ই উপযুক্ত মর্যাদা দেব। এই সূত্রে প্রাগুক্ত প্রতিবেদনগুলিকে বাখতিনের নির্মীয়মান চিন্তাবিশ্বের বহুস্বরিকতার অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই কোনো। তাছাড়া অভিন্ন চিন্তাবৃত্তের শরিকদের মধ্যে দশকব্যাপী ঘনিষ্ঠ বিনিময় যখন ঐক্যবোধকে গড়ে তুলেছিল, তখনও বাখতিনের বৌদ্ধিক অস্তিত্বই যে ছিল কেন্দ্রীয় সংবেদনার আকর—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তাৎপর্যের মতো তাৎপর্যধারকও তো মূলত সামাজিক সত্তা; অতএব ভোলোশিনোভ/মেডভেডেভ-কে বাখতিন নামক সূত্রধার-অস্তিত্বের নির্ভরতাদায়ী দ্বিবাচনিক অপর হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই কিছু। মুক্ত ভাবনার পরিসরকে যতটা বেশি সম্ভব নির্বিঘ্ন রাখার প্রয়োজনেই সম্ভবত বাখতিন প্রতিকল্প সত্তার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। দ্বিরালাপের মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছাই সমবায়ী সত্যের উপকূলে, এই সংকেত দেওয়ার জন্যেই যেন ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিজস্ব লেখকসত্তার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি।

তিন

১৯২৯ সালে বাখতিনের চিন্তাজীবনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হলো। ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে যৌথ নির্মাণের বদলে এবার তাঁকে এগিয়ে যেতে হলো একক পরিক্রমায়। অবশ্য এই আপাত-সঙ্গহীনতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বহুস্বরসঙ্গতির উপার্জনও। মার্ক্সীয় প্রেক্ষণ এই পর্যায় থেকে মঞ্চসাজের আড়ালে চলে যাবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দ্রুত এমন কিছু ঘটনা ঘটবে, যা ব্যক্তি-বাখতিন ও চিন্তাবিদ বাখতিনের দ্বিবাচনিক গ্রন্থনায় বিচিত্র উচ্চাবচতা ও তীক্ষ্ণ জটিলতা যুক্ত করবে। লেনিন-পরবর্তী রাশিয়ায়

সমাজতন্ত্রের অন্ধকার অপর অবয়বটি ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়েছে। রাষ্ট্রকে ভাবাদর্শগত অন্তর্ঘাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু যৌথ কর্মোদ্যোগে ব্যক্তির 'স্বাধীন' অবস্থানের দার্শনিক, রাজনৈতিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্য কতখানি—এবিষয়ে যথার্থ পরিশীলিত উপলব্ধি না-থাকাতে অচলায়তনের দুর্লক্ষণগুলি প্রকট হতে শুরু করল। লেনিনগ্রাদে ধর্মজিজ্ঞাসুদের মধ্যে যেহেতু সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ কোনো গুরুত্ব পায়নি, ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য শত্রুর মোকাবিলায় ক্লান্ত প্রশাসন এদের সংশয়ের চোখে দেখত। সুতরাং ইতিহাসের অনিবার্য নিষ্ঠুর কৌতুকে নির্দিষ্ট জীবিকাহীন বাখতিন ঐ সংশয়ের শিকার হয়ে পড়লেন। তরুণ চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যমণি হিসেবে তাঁর সঙ্গে তখনকার বিভিন্ন ভাবমণ্ডলীর নিয়মিত যোগযোগ ছিল। জীবনকে যিনি তত্ত্বের প্রায়োগিক অভিব্যক্তি বলে জানেন এবং তাৎপর্যের বহুস্বরিকতায় যাঁর অখণ্ড বিশ্বাস— তাঁর পক্ষে এই যোগাযোগ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এর মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে বাখতিনের মতো মুক্তমতি মানুষ কোনো গোপন ধর্মীয় প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। জীবন যাঁর কাছে অন্তহীন অনাবিষ্কৃত পরিসরের বিস্তার, জীবনাতিরিক্ত পরাপাঠ দ্বারা তাঁকে উদ্বুদ্ধ মনে করলে বুঝতে হবে যে তাঁর তত্ত্ববিশ্বের নির্যাস আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। সাম্প্রতিক প্রতীচ্যের কোনো-কোনো ব্যাখ্যাতা বাখতিনের কৃতি থেকে মার্ক্সীয় প্রেক্ষণের ক্ষীণতম ইশারাও মুছে ফেলতে ব্যগ্র বলে অতিসরলীকরণ করেন। এটা কম কৌতুককর নয় যে ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে তৎকালীন রুশ-প্রশাসন বাখতিনের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ বিকৃতির অভিযোগ তুলে ধরেছিল, তার মানে দুটি দ্বিমেরুবিষম দৃষ্টিকোন থেকে বাখতিনের তাত্ত্বিক অণুবিশ্ব আক্রান্ত, অন্তত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি।

১৯২৯ এল সার্বিক পর্বান্তরের আভাস নিয়ে। সবচেয়ে দুরূহ পরীক্ষা বাখতিনকে দিতে হয়েছিল নিজেরই কাছে। একদিকে ডস্টয়েভস্কির নন্দন বিষয়ে তাঁর বই বেরোচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পীড়নের শিকার হচ্ছেন তিনি। নির্দিষ্ট জীবিকার অভাবে তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ছিল না, সুতরাং মননের ক্ষেত্রে কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য শেকলের বাধ্যবাধকতা থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন। জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা-কিছু মানবিক, বাখতিন সে-সমস্তকে বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণের বিষয় করে তুলেছিলেন। লক্ষণীয় ভাবে, লেনিনের সংকেত অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সৌধ গড়ে উঠতে পারে কেবল মানবিক উত্তরাধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে : 'We must take the entire culture that capitalism left behind and build socialism with it. We must take all its science, technology, knowledge and art. Without these we shall be unable to build communist society.' এই যে 'সমগ্র সংস্কৃতি গ্রহণ করা'র কথা বলেছেন লেনিন, বাখতিন তাঁর স্বতন্ত্র পথে এই নীতিই মেনে চলেছেন। এই হলো তাঁর বিখ্যাত পারিভাষিক সূত্র 'heteroglossia' বা অনেকার্থদ্যোতনার ভিত্তি। কিন্তু লেনিন-পরবর্তী রাশিয়ায় মতান্ধতা সমাজতান্ত্রিক চেতনার মৌল ঔদার্যকে হনন করেছিল। প্রতিটি পরবর্তী যুগ দ্বন্দ্ববাদের ভিত্তিতে যথাপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক উপকরণকে কিছুটা গ্রহণ কিছুটা বর্জন কিছুটা পরিমার্জন করে। সেই সঙ্গে পরীক্ষা, পরিশীলন এবং সংযোজনের মধ্য দিয়ে তার প্রায়োগিক যথার্থতা যাচাই করে নেয়। এই মার্ক্সীয় আকল্প

থেকে বাখতিনের বহুস্বরিক তাৎপর্যের সন্ধান খুব দূরবর্তী নয় নিশ্চয়। সোভিয়েত তাত্ত্বিক ই. বালের লিখেছেন : 'In every new historical epoch humanity always critically evaluates, supplements, develops and enrichs its inherited cultural values in the light of the new opportunities and new objectives standing before society and in accordance with the requirements of the specific social forces.' (*Communism and Cultural Heritage* : Moscow : 1984 : 66).

এই বক্তব্যের মধ্যে যে-সূত্রগুলি রয়েছে (সর্বদা বিশ্লেষণী মূল্যায়ন, সংযোজন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটানো)—এর প্রতিটি স্পষ্টত বাখতিন সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রতিটি সত্তাকে তিনি সহযোগিতার আধার ও আধেয় বলে জানতেন এবং তাৎপর্যকে সামাজিক গ্রন্থনা ও সম্ভাবনা বলে ভাবতেন। এতে মার্ক্সীয় চেতনারই নির্যাস উপস্থিত। যান্ত্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে অনুসরণ করার অর্থ মান্যতার ছদ্মবেশে তাতে অন্তর্ঘাত করা। বাখতিন সারা জীবন এই যান্ত্রিকতার বিরোধিতা করে গেছেন। ইতিহাসের নিষ্ঠুর কৌতুকে ত্রিশের দশকে এই যান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মতান্ধতা তাঁকে মূল স্রোত থেকে নির্বাসন দিয়ে 'প্রত্যাখ্যাত অপর'-এর অভিধা আরোপ করেছে। অথচ স্বয়ং লেনিন জানিয়েছিলেন, 'guarding the heritage does not mean confining oneself to the heritage,' (*Collected works* : Vol 2 : 1977 : 526), এই চমৎকার সূত্রটি বিস্মৃত হয়েছিল তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের অত্যুৎসাহীরা, রাষ্ট্রীয় প্রতাপের ধ্বজ বহন করে এরা লেনিনীয় আকল্পটি উপেক্ষা করেছিল। অথচ এই একই সূত্র অনুযায়ী, বাখতিন সূক্ষ্ম ও গভীর সংবেদনশীলতা দিয়ে মার্ক্সীয় প্রেক্ষণেরই ধারাবাহিক বিকাশ ঘটিয়ে গেছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবনচর্যা ছিল তাঁর মননের শক্তি ও লাবণ্যের উৎস। তা যদি না হত, রাষ্ট্রীয় পীড়ন তাঁকে স্তব্ধ করে দিতে পারত; অন্তত বহুমাত্রিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিত নিশ্চয়। ১৯৩০-এর শুরুতে লেনিনগ্রাদ ছেড়ে তাঁকে পাড়ি দিতে হলো কাজাখস্তানের অন্তর্গত কুস্তানাই শহরের অন্তরীণ-জীবনে। বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী লুনাচারস্কি যদি ডস্টয়েভস্কি বিষয়ক বইয়ের ইতিবাচক সমালোচনা না করতেন এবং ম্যাক্সিম গোর্কির পত্নী সহ আরো কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী চেষ্টা না করতেন, তাহলে কাজাখস্তানের বদলে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ভোগ করতে হতে বাখতিনকে। সেক্ষেত্রে তিনি হারিয়ে যেতেন অস্তগোধূলির ওপারে এবং মানুষের তত্ত্ববিশ্বও কখনো মৌলিক পুনর্লিখনের সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ হত না।

ত্রিশের দশক থেকে আরো ত্রিশ বছর তাঁর কোনো বই ছাপা হয়নি। কিন্তু পীড়ন ও চরম অনিশ্চয়তার সেই দশকেও বাখতিন ছিলেন সবচেয়ে বেশি সৃষ্টিশীল এবং মননের দিক দিয়ে সদাজাগ্রত। সে-সময় তিনি শিক্ষাবিষয়ক উপন্যাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন; উপন্যাসের ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থাকৃতি সম্পন্ন নিবন্ধ লেখেন এবং রাবেলে বিষয়ে অভিসন্দর্ভ ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে প্রস্তুত করেন। এও আসলে জীবনের অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিকতার বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি। কুস্তানাই শহরে অবশ্য এই দশকের পুরো সময়টা বাখতিনকে কাটাতে হয়নি। নির্বাসনের পালা শেষ হওয়ার পরে মোর্ডোভিয়ার সারান্স্ক শহরে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে তিনি চাকরি

পেয়ে যান। কিন্তু মস্কো থেকে চারশ' মাইল পূর্বের সেই ছোট্ট শহরেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না। এক বছর চাকরি করার পরে ১৯৩৭ সালে যখন আবার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হলো, পদত্যাগ করে বাখতিন চলে এলেন মস্কোর উত্তরে সাভেলোভো নামে ছোট্ট শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তিনি ওখানেই ছিলেন। কিন্তু বারবার স্থান পরিবর্তন করার ফলে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়াতে বহির্জগতের কাছে বাখতিন কার্যত মৃত হয়ে পড়লেন। তাঁর অস্তিত্বও ধীরে ধীরে বর্তমানের পরিধি থেকে মুছে গেল। এর কারণ, সহযোগী সত্তার অভাবে কোনো সত্তা কখনো বিকশিত হয় না; হয়ে ওঠার নিরন্তর প্রক্রিয়া যেহেতু স্বভাবে সামাজিক, এর ব্যত্যয় ঘটলে প্রসঙ্গচ্যুত সত্যভ্রমের আস্ফালন অনিবার্য। গতি জীবনেরই প্রকাশ এবং তা দ্বিবাচনিকতার নামান্তর; নিঃসঙ্গতা তেমনি একবাচনিক এবং স্থবিরতার মধ্য দিয়ে আত্ম-অবলুপ্তির সূচক। বাখতিনের জীবনে তথ্য ও তত্ত্বের যুগলবন্দি অবিস্মরণীয়। তাই দেখি, তাঁর উচ্চারণ গড়ে ওঠে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। যখন তাঁর জীবিকা অনিশ্চিত এবং জীবন অস্থির, সে-সময় নিত্যনতুন মননের বয়ন চলেছে; আবার যখন তিনি মোটামুটি স্থিতিশীল চাকরি করছেন— সে-সময় তাঁর রচনা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। বিল্‌ডুঙ্‌স্‌রোমান বা শিক্ষা-কেন্দ্রিক উপন্যাস সম্পর্কিত বইয়ে কেন্দ্রীয় সত্তার ধারাবাহিক অগ্রগতির কথা যিনি বলেন, তিনিই আবার চরম খামখেয়ালির পরিচয় দিয়ে সিগারেটের কাগজ হিসেবে ব্যবহার করে খসড়া পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ পুড়িয়ে ফেলেন। এই বইয়ের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি প্রকাশন-সংস্থার ঘরবাড়ি সহ ধ্বংস হয়ে যায় জার্মান হানাদারদের বোমা-বর্ষণে। বারবার নতুন হয়ে-ওঠা প্রতিবেদনের কথা যিনি বলেছেন, তাঁর জীবনেও বাধতামূলক পুনর্নির্মাণের পালা এসেছে অসংখ্যবার।

যুদ্ধের পর সারান্‌স্ক শহরের চাকরিটা ফিরে পেয়েছিলেন বাখতিন। ১৯৬১ সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত তিনি সক্রিয় শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। বহুস্বরিক জীবনের তাৎপর্য কীভাবে ক্রমশ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তার একটা সংকেত যেন পাওয়া যাচ্ছে এখানে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বিভিন্ন বাক্‌মাধ্যম (speech-genres) সম্পর্কে চমৎকার দীর্ঘ নিবন্ধ লেখা ছাড়া নতুন কোনো তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি করেননি। ১৯৫২ সালে ডক্টরেট ডিগ্রির বদলে বাখতিনকে ক্যান্ডিডেট্‌স ডিগ্রি দেওয়া হয়, তাও দীর্ঘ টালবাহানার পরে। ১৯৬০ সালে মস্কোর গোর্কি ইনস্টিটিউটের কয়েকজন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষক বাখতিনকে আশ্চর্যজনক ভাবে পুনরাবিষ্কার করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের মহাফেজখানায় তাঁরা ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কে বাখতিনের বইটি দেখতে পান এবং তার কিছুদিন পরে রাবেলে বিষয়ক অভিসন্দর্ভও খুঁজে পান। প্রথম তাঁরা লেখককে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কিছু কিছু সূত্রে জানতে পারেন, বাখতিন তখনও জীবিত; স্বভাবত, গভীর কৌতূহলে তাঁরা এই আশ্চর্য তাত্ত্বিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এরপর যা ঘটল, তা যেন আলাদিনের মায়াপ্রদীপের কাহিনি। বহু বাধা পেরিয়ে এঁদেরই চেষ্টায় ১৯৬৫ সালে *রাবেলে ও তাঁর জগৎ* বইটি প্রকাশিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধজনের মধ্যে

অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিল; অতি দ্রুত বাখতিন সোভিয়েত রাশিয়ার বৌদ্ধিক মহলে কিংবদন্তিতে পরিণত হলেন। তরুণ বয়সের মতো প্রবীণ বয়সেও তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল নতুন ভাবমণ্ডল। ১৯৭৫ সালের ৭ মার্চ তাঁর কায়িক মৃত্যু হওয়ার পরেও বাখতিন-ভাবমণ্ডল ক্রমশ প্রসারিত হলো। প্রমাণিত হলো, জীবনচক্র আবর্তিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাৎপর্যের প্রতীতিও ফিরে আসে নদীর জলের মতো। কোনো কিছুই একেবারে হারিয়ে যায় না; একদিন-না-একদিন সব কিছু ফিরে যায় উৎসে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী বারো বছরে গড়ে-ওঠা বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের আবহ হিসেবে প্রকট ছিল নতুন জীবনস্বপ্ন, নবনির্মাণের উত্তাপ, ভাবাদর্শের শক্তি ও লাবণ্য। অন্যদিকে, স্ট্যালিন-পরবর্তী সোভিয়েত রাশিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিথিলতার পর্বে নতুন ভাবে যখন চিন্তাবৃত্ত গড়ে উঠেছিল—তার মধ্যে পেরিয়ে গেছে প্রায়ে চল্লিশ বছর। সুতরাং এই নবায়ন আসলে সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ। তবুও, তাৎপর্য-সন্ধানের প্রয়াস যে বৃত্তাকার পথে ফিরে এল নবায়িত দিশা নিয়ে—এটাই লক্ষণীয়।

সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যখন সংকলিত হয়ে ছাপা হতে লাগল, বাখতিনের অসামান্য জীবন ও মননের দ্বিবাচনিকতা থেকে অর্থ খোঁজার প্রয়াসও শুরু হলো। বিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বন্দ্ব পর্ব থেকে পর্বান্তরে কত বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উত্থাপিত হলো। আগেই লিখেছি, ভোলোশিনোভ ও মেডভেডেভের সঙ্গে বাখতিনের নাম জড়িয়ে যাওয়াতে জটিল বিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। বিশের দশকের শেষে এবং ত্রিশের দশকের গোড়ায় মেডভেডেভ, বিশেষত সাংবাদিক ও প্রকাশন-সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে, লেনিনগ্রাদে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। আর, বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের সক্রিয় সদস্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হিসেবে ভোলোশিনোভও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের নামে যেসব বই বেরিয়েছিল, তার সঙ্গে ত্রিশের দশকে বাখতিন-রচিত অপ্রকাশিত নিবন্ধগুলির যৌক্তিক সাযুজ্য খুব প্রকট। এবং, এই তথ্যও খুব লক্ষণীয় যে মেডভেডেভ ও ভোলোশিনোভের বক্তব্যে মার্ক্সীয় ভাবাদর্শ ও বাচন নিয়ন্তা ভূমিকা নিয়েছে। তুলনামূলক ভাবে বাখতিনের স্বনামে রচিত প্রতিবেদনগুলিতে এই ভূমিকা আভাসিত; তবে একে গৌণ বলা যায় না। কারণ, বেশ কিছু মৌলিক ভাবকল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে মার্ক্সীয় চেতনায় প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছেন। সব মিলিয়ে, ভোলোশিনোভ, মেডভেডেভ ও বাখতিন ঐতিহাসিক বাস্তবের দ্বারা নির্ধারিত এমন ত্রিস্রোত অস্তিত্ব—যাদের আপাত-ভিন্নতা সত্ত্বেও ভাবাদর্শের ঐক্য ও সংহতি অনস্বীকার্য। বাখতিন মার্ক্সবাদী ছিলেন কি ছিলেন না—এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। গভীর অন্তর্বৃত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রাগুক্ত ত্রিস্রোত অস্তিত্বকে যদি এক ও অভিন্ন সত্যোপলব্ধির বিচ্ছুরণ বলে বুঝতে পারি, তাহলে একদিকে বাখতিন-চিন্তাবৃত্তের বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক অবচেতনা যেমন স্পষ্ট হয় তেমনি বিতর্কিত বইগুলির লেখকসত্তা সম্পর্কিত সমস্যাও তত পীড়িত করে না। আমাদের শুধু লক্ষ করতে হবে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বাখতিন যেসব নতুন আকল্প প্রস্তাব করেছেন কিংবা ভাষা-সাহিত্য-সমাজ-নন্দন সম্পর্কে যেভাবে উদ্‌ভাসনী আলো দিয়ে নতুন তত্ত্ববিশ্বের আদল গড়ে তুলেছেন—তাতে মার্ক্সবাদের সৃজনশীল পুনর্বিন্যাস হচ্ছে কিনা।

চার

প্রতীচ্যের বিশ্লেষণ-নিপুণ বাঘা-বাঘা পণ্ডিতেরা খুব সুবিধাজনক ভাবে যে-কথাটা এড়িয়ে গিয়ে মার্ক্সবাদী ভাবনাপ্রস্থানকে নস্যাৎ করেন, তা হলো এই মৌল মার্ক্সীয় প্রস্তাবনা— 'মার্ক্সবাদ কোনো আপ্তবাক্য নয়, তা আসলে কার্যক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক।' জীবন তো তত্ত্বের মাপে তৈরি হয় না, তত্ত্বই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠে এবং প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমাগত বদলে যায়। অতএব বাখতিন যদি মার্ক্সীয় প্রেক্ষণ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সন্দর্ভে মার্ক্সবাদী চেতনার সুরে-লয়ে বাঁধা পরিসরকে বারবার পুনরাবিষ্কার, পরিশীলিত ও সমৃদ্ধতর করেন—তাহলে, বুঝতে হবে, এই তাঁর ভাবনাপ্রস্থানের অন্যতম ধ্রুবক। তিনি যে বহুমাত্রিক চিন্তাবীজকে ক্রমশ অনেকার্থ-দ্যোতনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার সূচনাবিন্দু এবং মৌল সঞ্চালক হলো এই চেতনা। সোভিয়েত চিন্তাবিদ অধ্যাপক ই বালের এই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন : 'Undoubtedly, in his creativity, each scientist, writer, artist or composer has to answer the questions posed by life, yet how and when he answers them is determined by his talent and his ability to comprehend the present sooner and better than the others and to foresee the future.' (১৯৮৪ : ৫৬)। এই সূত্র অনুযায়ী, বাখতিন জীবনের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নমালার মীমাংসাপ্রয়াস অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বলেই পর্ব থেকে পর্বান্তরে তাঁর প্রতিভা ও ক্ষমতা ধরা পড়েছে। সাম্প্রতিক কাল ও পরিসরের বহুবিধ বিচ্ছুরণকে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক মার্ক্সবাদীর তুলনায় তিনি বেশি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। ভাববিশ্বের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতি যে-ইশারা তিনি করে গেছেন— আজ বিশ্বব্যাপ্ত বাখতিন-চর্চার মধ্যে তার অসামান্য গুরুত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। মার্ক্সীয় চেতনার সৃজনশীল পুনর্বিন্যাস করতে পেরেছিলেন বলেই কোনো অশ্মীভূত আপ্তবাক্যের কবলে তাঁর সন্দর্ভ পড়েনি; প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তিনি নিতে পেরেছেন উজ্জ্বল পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। এই চেতনার উত্তরাধিকারকে তিনি ছেদহীন, উচ্চাবচতাহীন যান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় গ্রহণ করেননি। দ্বিবাচনিকতার শর্ত অনুযায়ী চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে দিয়েছেন এবং ভেঙে দিয়ে, 'সাংস্কৃতিক বিকাশের জটিল, পরস্পরবিরোধী ও দ্বান্দ্বিক' (তদেব : ৬৬) চরিত্রকে প্রকাশ করেছেন। আর, এভাবে প্রমাণ করেছেন, মার্ক্সবাদীরা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় যে 'invariably deal with a progressive form of continuity only' (তদেব : ৭৭) এর কথা বলেন—ধারাবাহিকতার সেই প্রগতিশীল চরিত্র বাখতিন তাঁর সংবেদনশীল কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নিজের ইতিহাস নিজেই নির্মাণ করার যে মহাসূত্র এঙ্গেল্‌স্ দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য :—*Selected Correspondence* : 395), বাখতিনের জীবন ও মননের দ্বিবাচনিকতা তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বিশের দশকের শেষে বাখতিন টলস্টয় সম্পর্কে দুটি ছোট্ট নিবন্ধ লেখেন, যাতে মার্ক্সীয় ঘরানার ছাপ খুব স্পষ্ট। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে তাঁর দার্শনিক বিবর্তনে এই পর্যায়টি নেহাত আকস্মিক ও পারম্পর্যহীন অর্থাৎ বাখতিনীয় ভাববিশ্ব গড়ে উঠেছে এমন কিছু উপাদানের সমন্বয়ে যা জরুরি নয় তত এবং যা সুবিধাবাদের পোষক। একথা ভাবার মানে যে বাখতিনের বৌদ্ধিক সততাকে খারিজ করে দেওয়া, তা না লিখলেও চলে। প্রচলিত ও বাঁধা-ধরা পথে চলেননি বলে ধ্রুপদী মার্ক্সবাদীরা তাঁর উপর

ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও সন্দিহান—আবার সম্ভাব্য মার্ক্সীয় অনুষঙ্গের জন্যে প্রতীচ্যের ধুরন্ধর পণ্ডিতেরা প্রাণপণে সেই 'স্পর্শদোষ' কাটানোর চেষ্টায় ব্রতী। সত্যকে যিনি দ্বিবাচনিক বলে জেনেছেন, সময়ের বিচিত্র কৌতুকে তাঁর মননবিশ্বকে দুটি পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে একবাচনিক বলে প্রমাণ করার জন্যে কী উদগ্র ব্যাকুলতা! সমস্ত বিশ্লেষণ যে মূলত ভাবাদর্শ ভিত্তিক, এতে তার প্রমাণ পাচ্ছি। বাখতিনের উদার মানবতন্ত্রী উচ্চারণের সঙ্গে মার্ক্সবাদের বিরোধ কল্পনা করে যাঁরা সন্তুষ্ট কিংবা বিক্ষুব্ধ—তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই অপরতার উপলব্ধি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। অন্ধের হাতি দেখার পুরোনো রূপকটি হয়তো মনে পড়বে কারো কিংবা উপনিষদের ধরনে বলতে ইচ্ছে করবে—'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্, বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্'। মার্ক্সীয় অনুষঙ্গের মধ্যে যাঁরা অতিসরলীকরণ, বিকৃতায়ন বা একবাচনিকতার লক্ষণ খুঁজে পান—তাঁদের পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের আড়ালে চলে গেছে বাখতিনের জীবনব্যাপী মননের নির্যাস। অস্তিত্ব যাঁর কাছে অংশীদার হওয়ার নিরন্তর প্রক্রিয়া এবং তাৎপর্য যাঁর কাছে সামাজিক ভাবে নির্ধারিত অনেকার্থদ্যোতনার গ্রন্থনা—তাঁকে ইতিহাসের পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রয়াস আসলে প্রতিভাবাদর্শের অভিব্যক্তি। বিপ্লবোত্তর বাস্তবকে যাঁরা কৃষ্ণবিবর বলে প্রমাণ করতে মরিয়া, তাঁরা একদিকে বলেন, সমকালীন রুশ সমাজেও প্রধান উচ্চারণ মার্ক্সীয় চেতনা নয়, আবার অন্যদিকে তাদের অক্লান্ত পুনরাবৃত্তি হলো,' মার্ক্সবাদ বৌদ্ধিক বর্গের ওপর আরোপিত হয়েছিল 'as the deadening intellectual orthodoxy!' (ডেন্টিথ : ১৯৯৫ : ১১)।

তার মানে, মার্ক্সীয় চেতনা কোনো উত্তরণমনস্ক বিশ্বাসের আয়ুধ—প্রতীচ্যের বিশেষজ্ঞরা কিছুতেই তা মানতে রাজি নন। তাঁদের অবস্থানের পক্ষে মানানসই রাজনীতির প্রয়োজনে এঁরা যেমন সত্যকে উৎপাদন করে থাকেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে নিজস্ব বর্গের তাগিদ অনুযায়ী সাজিয়ে নেন তেমনি বাখতিনকেও তাঁরা নিজেদের ছাঁচে গড়ে নিতে চেয়েছেন। তাঁরা এও বলতে চেয়েছেন যে বাখতিনের ওপর মার্ক্সবাদের প্রভাব ততটা ছিল না যতটা ছিল সমসাময়িক টালমাটাল সমাজের অভিঘাত। একক বাচনকে তিনি যে চিরকাল সামূহিক বাচনের অন্তর্বয়ন হিসেবে জেনেছেন, তার পেছনে এঁরা কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঞ্জীবনী উত্তাপ খুঁজে পাননি। বরং বিমূর্তায়িত সামাজিক আলোড়নের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর 'overwhelming sense of the transfigurative power of collective life' (তদেব : ১৪) উদ্ভূত হওয়ার কথাই বলেছেন। সূর্য উঠলেও যারা সেই সত্য অস্বীকার করে 'কে বা আঁখি মেলে রে' জাতীয় অবস্থান নেয়—এখানে যেন তেমনি জ্বলন্ত বাস্তবকে ইচ্ছা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পরিচিত প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। যার অস্তিত্ব সইতে পারি না, তাকে প্রাণপণে অস্বীকার করে মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা মেটাই : এখানে সেই অভ্যস্ত পুরোনো রীতির প্রতিফলন দেখছি। সেসময়কার দার্শনিক প্রবণতা অনুযায়ী নব্যকান্টীয় চিন্তাধারা বাখতিনকেও আকৃষ্ট করেছিল যদিও বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা তাঁর ছিল না। চেতনাকে বহিরঙ্গ জগতের নিছক প্রতিফলন বলে ব্যাখ্যা তিনি করেননি কারণ মন তাঁর কাছে এমন কোনো সাদা পাতা নয় যাতে জগতের সানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা মুদ্রিত হবে। নিজের বাইরে বড়োসড়ো যে-জগৎটি রয়েছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার জন্যে চেতনা নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রকরণ তৈরি করে নেয়। বিশেষত

সময় ও পরিসরের ধারণা যথাপ্রাপ্ত জগৎ থেকে নিষ্পন্ন হয় না কখনো। চেতনা মানে অপরতার প্রত্যয়, একথা বলেছেন বাখতিন। চিন্তার নব্য-কান্টীয় প্রকরণ দিয়ে তিনি সত্তা ও অপরের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর ভাবনার নির্যাস মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের মৌল স্বরূপে নিষ্ণাত।

সত্তা সম্পর্কে আমাদের অনুভব কিংবা অপর ব্যক্তিদের অপরতা সম্পর্কে আমাদের অনুভব পারস্পরিক অন্বয় ও অনন্বয়ের যে-বয়ন তৈরি করে—সেখানেই বাখতিনের জ্ঞানতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব আধারিত। জীবনে ও শিল্পে তাৎপর্যের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ স্বভাবত গড়ে ওঠে একই প্রক্রিয়ায়। যেহেতু সম্পর্কে সংলগ্নতা না কেবল—ব্যবধানও থাকে, সেতু নানাভাবে গড়ে ওঠে। অন্তত সেতুর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না কখনো। সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক ও নান্দনিক সমস্যাগুলি পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষায় যেমন সমস্ত একটি অভিন্ন বস্তুতান্ত্রিক ঐক্যে বিধৃত, তেমনি বাখতিনের বহুস্বরিক যুক্তি-শৃঙ্খলায় আপাত-ভিন্ন অস্তিত্ব সমান্তরাল অবস্থানের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ঐক্যপ্রতীতির সম্ভাবনাকে কর্ষণ করেছে। দীর্ঘ চিন্তাজীবন জুড়ে তিনি এই মৌল আকল্পকে অনুসরণ করে গেছেন : 'artistic form and meaning emerge betwen people' (তদেব : ১৩)। শৈল্পিক প্রকরণ ও তাৎপর্য যদি জনসাধারণের পারস্পরিক বিনিময়ের প্রভাব থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে আধার ও আধেয়ের বহুমুখী দ্বিবাচনিকতা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিত আগাগোড়া তাঁর ভাববিশ্বে অনুসৃত হয়েছে। দার্শনিক ও নৈতিক উপাদানের সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বদা তাঁর নজরে পড়ে বলে বিমূর্তায়নের প্রতি তত্ত্ববিদদের স্বাভাবিক ঝোঁককে তিনি অনেকখানি এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। সাহিত্যতাত্ত্বিক আলোচনায় চেতনার ঐতিহাসিক ভিত্তিকে তিনি কখনো ভুলে যাননি। বস্তুত বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা সর্বতোভাবে সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন এবং লোকায়ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। যাঁরা শ্লেষের ভঙ্গিতে ও আত্মপ্রতারণার তাগিদে বলেন, ১৯১৭ সালের পরে 'সরকারি বৌদ্ধিক অবস্থান' (অর্থাৎ মার্ক্সীয় চেতনা) এড়িয়ে চলা বাখতিনের পক্ষে অসম্ভব ছিল—তাঁরা আসলে তাঁর জীবনব্যাপ্ত সত্যনিষ্ঠাকে অবমাননা করেন। এঁদের এইসব কথাবার্তা প্রতিভাবাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এঁরা প্রমাণ করেন যে চোখ থাকলেও সবাই দৃষ্টিমান হয় না। তাঁরা যা দেখতে চেয়েছেন তা-ই দেখেছেন। মার্ক্সবাদের মধ্যে তাই এঁরা কেবলই খুঁজে পান 'monolithic orthodoxy' এবং পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার সমন্বয়। এমনকি, তাঁদের ধৃষ্টতা এই বলে সীমা ছাড়িয়ে যায় যে মার্ক্সবাদ নাকি আদৌ রুশ সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক চালিকাশক্তি নয় (তদেব : ৩৯৪)। ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করার এই নবার্জিত ঔদ্ধত্য এঁরা পেয়েছেন বিশ্বপুঁজিবাদের রুশ 'মিত্র'দের মধ্যে যারা আশির দশকের শেষে অকল্পনীয় অন্তর্ঘাত করে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। অতএব বাখতিনের ভাববিশ্বেও তাঁরা একই ধরনের প্রতিবৈপ্লবিক অন্তর্ঘাত করার জন্যে তাঁর তত্ত্ব থেকে মার্ক্সীয় অনুষঙ্গের সমস্ত সম্ভাবনাকে মুছে ফেলতে তৎপর।

পাঁচ

নব্বইয়ের দশকের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেখছি, গত কয়েক বছর থেকে পৃথিবী জুড়ে চলছে তত্ত্ব-সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক কৃৎকৌশলের তাণ্ডব। ইতিহাসের

প্রতিবেদনকে নস্যাৎ করার জন্যে নানা আয়োজন চলেছে প্রতীচ্যের প্রতাপসংলগ্ন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কখনো শুনছি উত্তর-মার্ক্সবাদের প্রস্তাবনা, কখনো দেখছি নব্য-ঐতিহাসিকতাবাদের ঝলকানি। একই সুতোয় গাঁথা বাখতিনের ভাববিশ্বে মার্ক্সীয় চেতনার গৌণ ভূমিকা প্রমাণের চেষ্টা। আবার একই নিঃশ্বাসে প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক একথাও বলেছেন যে মার্ক্সবাদী প্রেক্ষণের কিছু কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বাখতিনকে আকর্ষণ করেছিল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শনে সমস্ত ক্রিয়ার সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি যেভাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে, বাখতিনের বিশ্ববীক্ষায় তার প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট—এটাও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উচ্চারণের সামাজিক নির্দিষ্টতা মেডভেডেভ ও ভোলোশিনোভের নামে প্রচলিত রচনাগুলিতে মুখ্য আকল্প হিসেবে উপস্থিত। তাছাড়া এই দুটি নামে এবং স্বনামে লিখিত প্রতিবেদনে ব্যক্ত অনেকার্থদ্যোতনার ভাবনায় ঐতিহাসিক বাস্তবতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক শ্রেণীর গুরুত্বের কথা বাখতিন বিশেষভাবে বলেছেন। এই ব্যাপারকে পাশ কাটাতে না-পেরে ঐ তাত্ত্বিকেরা বলেছেন, এতে মার্ক্সীয় চেতনার বিশেষত্ব নেই কেননা আরো অনেক সামাজিক তত্ত্ব ও দর্শন এরকম কথা বলে থাকে। *রাবেলে ও তাঁর জগৎ* বইতে বহুচর্চিত কার্নিভালের ধারণায় যদিও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অনুষঙ্গ দিবালোকের মতো স্পষ্ট, সামাজিক তাৎপর্যবহ উচ্চারণে একক বাচনের অনন্যতা ও বিশেষত্ব বেশি প্রকাশিত হয়েছে—এই হলো তাঁদের অভিমত। এতে তাঁরা অবসংগঠন ও অধিসংগঠনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অভিব্যক্তি দেখতে চাননি। একদিকে তাঁরা বলছেন, মার্ক্সীয় চেতনার অনুষঙ্গ বাখতিনের মধ্যে খোঁজা নিরর্থক, অন্যদিকে বলছেন, রুশ ইতিহাসের বিশিষ্ট বিকাশের পথ ধরে তিনি মার্ক্সবাদীদের পুঁজিবাদ-বিরোধী আবেগের অংশীদার হয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে চমৎকার সিদ্ধান্ত সম্ভবত এই যে : 'Bakhtin's explicit hostility to the isolating and alienating nature of capitalist social relations is cognate with one version of Marxism though it clearly does not imply any commitment to a belief in the socialist transformation of society.' (তদেব : ১৫)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাখতিন/মেডভেডেভ বা বাখতিন/ভোলোশিনোভ যেভাবে নিজেদের যুক্তি সাজিয়েছেন, তা অনুসরণ করে আমরা বিভিন্ন বর্গের উচ্চারণকে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহুস্বরিক ফসল বলে বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে আমাদের ধারণা হয়, কীভাবে দ্বিবাচনিকতার তাত্ত্বিক আকল্প ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়েছে। দেখি, জটিল ও বিচিত্র প্রকরণের মধ্য দিয়ে বাচন, উচ্চারণ, প্রতিবেদন, জনসাধারণ, সামাজিক বর্গ অনবরত মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে এবং রূপ থেকে রূপান্তরে পরস্পরকে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে মার্ক্সীয় চেতনার নির্যাস গভীর সংবেদনা নিয়ে উপস্থিত। যাঁরা নিতান্ত কুযুক্তির বশে তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে বাখতিনের অবস্থান মূলত মার্ক্সবাদের অনেক বাইরে এবং তিনি পীড়নপ্রবণ সরকারি ভাবাদর্শের কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিলেন—তাঁরা জেনে-শুনে সত্যের অপলাপ করেন। তাঁরা বাখতিনের জীবন-সত্য এবং সত্য-সন্ধানকে জানতে চান না এবং নিজেরা আসলে শ্রেণী-বিভাজক বিশ্বপুঁজিবাদের তলপিবাহক হিসেবে প্রগতিবিরোধী সরকারি প্রতিভাবাদর্শের ধ্বজ বহন করেন। তাঁরা বাখতিনকে নিজেদের প্রয়োজনমাফিক পিঞ্জরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে ছেঁটে নিতে চান এবং পছন্দসই

সেই প্রতিবাখতিনকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সফল অন্তর্ঘাতক বলে প্রমাণ করতে চান। মার্ক্সীয় ভাবনার পরিমণ্ডলকে যাঁরা রুদ্ধ পরিসরের অচলায়তন বলে নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করেন—কার্যত তাঁরাই মতান্ধ ও নিরন্ধ্র স্থবিরতার উপাসক। অথচ বাখতিন সৃজনশীল ভাবে মার্ক্সীয় চেতনার পরিধিকে বিকশিত করে গেছেন; তাঁর এই পরিশীলিত বৈদগ্ধ্য ও অনুভূতির নিবিড়তা ঐসব তথাকথিত তাত্ত্বিকদের মনের অন্ধকার কাটাতে পারেনি।

মেডভেডেভ/বাখতিনের *The Formal Method in Literary Scholarship : A Critical Introduction of Sociological Poetics* বইটি প্রকরণবাদের সঙ্গে মার্ক্সীয় বীক্ষণের দ্বিবাচনিক মিথস্ক্রিয়ার ফসল। সাহিত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক ভাষার বিচ্ছেদ মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বস্তু, মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে লিখন-প্রক্রিয়া, সমালোচনা ও তাৎপর্য-সন্ধানের বৈদগ্ধ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। মেডভেডেভ/বাখতিন দেখিয়েছেন, নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের আবহে সমস্ত লেখা জন্ম নেয় এবং বিকশিত হয়; সাহিত্যের পরিধির ভেতরে ও বাইরে উপস্থিত মূল্যবোধকে কখনো মেনে নেয় প্রতিটি মানবিক উচ্চারণ কখনো বা বিরোধিতা করে। পার্থক্য ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিকতাকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার আবহে প্রয়োগ করে লেখক দেখিয়েছেন, অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের তুলনামূলক গুরুত্বকে বুঝতে হবে ভাবাদর্শের সামগ্রিকতায়—'within the bounds of the unified sociological laws of development' (তদেব : ২৯)। অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদের নিষ্কর্ষকে সাহিত্য ও ভাবাদর্শপ্রসূত প্রকরণের সম্পর্ক বোঝাতে কাজে লাগিয়েছেন। মেডভেডেভ/বাখতিনের মূল আকল্প হলো : 'The language of art is only a dialect of a single social language' (তদেব : ৩৬)।

ভোলোশিনোভ/বাখতিনের Freudianism : A Marxist Critique বইতে এই যুক্তিবিন্যাস আরো একটু প্রসারিত হয়েছে। অবচেতনা সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় ধারণাকে অন্তর্বৃত সামাজিক ভাষার নানা পরস্পরবিরোধী ও বহুস্বরিক বিভঙ্গের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। মনস্তাত্ত্বিক জীবনকে সামাজিক বর্গায়তনের দ্বিবাচনিকতায় প্রতিস্থাপন করে লেখক মানবিক বাচনের নতুন দ্যোতনা আবিষ্কার করেছেন যেন। তাঁর প্রণিধানযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো : 'Only as a part of social whole, only in and through a social class, does the human person become historically real and culturally productive.' (তদেব : ১৫) স্পষ্টতই এই বক্তব্য মার্ক্সীয় চেতনার ফসল। তেমনি *Marxism and the Philosophy of Language* বইতে ভোলোশিনোভ/বাখতিন নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন, সামাজিক জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অর্জিত জীবনের অভিজ্ঞতা চিহ্নায়কের নিয়ন্তা এবং সেইজন্যে যাবতীয় মানবিক তাৎপর্যের সূত্রধার। শুধু যে বাস্তবতার যথাপ্রাপ্ত অংশ হিসেবে চিহ্নায়ক সক্রিয় থাকে, তা-ই নয়; সমান্তরাল ভাবে বিদ্যমান অপর বাস্তবতার বিচ্ছুরণও ঘটে ঐ চিহ্নায়ক থেকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ভাবাদর্শপ্রাণিত দৃষ্টিকোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোলোশিনোভ/বাখতিন লিখেছেন : 'Every sign is subject to the criteria of ideological evaluation (i.e., whether it is true, false, correct, fair, good etc.). The domain of ideology coincides with the domain of signs. They equate with one another. Whenever a sign is present, ideology is present,

too. Everything ideological possesses semiotic value.' (তদেব : ১০)। এই মন্তব্যের শেষ দুটি বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভাবাদর্শহীন কোনো চিহ্নায়ক হয় না বলে সময় ও পরিসরের অনুষঙ্গ ছাড়া তার তাৎপর্যের প্রতীতিও কখনো হতে পারে না। ভাষার অন্তর্বর্তী বহুস্বরিক সম্ভাবনাকে লেখক সর্বদা প্রত্যক্ষ করেছেন বর্গবিভাজিত সমাজের দর্পণে, ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রেক্ষিতে এবং সর্বোপরি সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক আয়তনে। ভাষার সামাজিক চরিত্রই চিহ্নায়কের নান্দনিক মাত্রা নির্ধারণ করে এবং সেই সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ে প্রতিবেদনের পরিসরও। কোনো উচ্চারণ যখন অপর উচ্চারণের সীমানাকে ছোঁয়, তখনই বাচনিক মিথষ্ক্রিয়ার সূচনা হয়। সেই বিন্দুতে জীবনও সচল হয়ে ওঠে। জন্ম নেয় উপন্যাসের নীহারিকাপুঞ্জ। সুতরাং গভীর অন্তর্বৃত যুক্তিশৃঙ্খলায় মেডভেডেভ/বাখতিন ও ভোলোশিনোভ/বাখতিন পরিণততর বাখতিনের মননক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এবং মার্ক্সীয় চেতনার পরিসর ধারাবাহিক ভাবে পরিশীলিত হয়ে তাঁর অণুবিশ্বকে গড়ে তুলেছে—এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় নিতে পারি আমরা। এই পরিপ্রেক্ষায় একক ও সামূহিক বাচনের দ্বিবাচনিকতায় সংগঠিত প্রতিবেদনের নান্দনিক ও সামাজিক তাৎপর্য আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে আরো। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

ছয়

রাবেলে ও তাঁর জগৎ, ডস্টয়েভস্কির নন্দন-বিষয়ক সমস্যাবলী, দ্বিবাচনিক কল্পনা, বাচন-মাধ্যম ও অন্যান্য পরবর্তী রচনা ইত্যাদি বইতে মার্ক্সীয় সাংস্কৃতিক তত্ত্বপ্রস্থানকে যেন বাখতিন নতুন-নতুন আয়তনে নিয়ে গেছেন। কোনো প্রচলিত পথে তা হয়নি; নিজের পথ ও পাথেয় তিনি নিজেই পুনর্নির্মাণ করেছেন বারবার। সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনি লোকসমাজের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করেননি; বরং তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সঞ্জীবনী সুধা। উপন্যাসের প্রতিবেদনে তিনি যে শিল্পসংবিদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ করেছেন, এর কারণ, লোকায়ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বয়নের শরীর ও আত্মাকে নির্মাণ করে। এসময় বাখতিন যেসব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাদের মধ্যেও লোকজীবনের অনুষঙ্গ খুব স্পষ্ট; যেমন : 'কার্নিভাল'। রাবেলে-বিষয়ক বইতে তিনি লিখেছেন, জনসাধারণ কার্নিভালকে দেখে না কেবল—তারা এর মধ্যে বাসও করে। বলা ভালো, প্রত্যেকে থাকে এতে। শব্দটির অভিধাগত অর্থ যদি বিচার করি, দেখব, জনগণের সমগ্র অংশ এর সঙ্গে যুক্ত। যখন কার্নিভাল চলতে থাকে, তার বাইরে জীবনের কোনো স্পন্দন থাকে না। যেহেতু এর পরিসরের কোনো সীমান্ত নেই, একে কেউ এড়াতে পারে না। কার্নিভাল যখন চলে, কেবলমাত্র তারই নিয়ম অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব; তবু এর মধ্যে সবাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। সর্বজনীন চরিত্র এর সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; সমগ্র জগতের পুনরুদয় ও পুনর্নবায়নকে কেবলমাত্র তারাই অনুভব করতে পারে যারা কার্নিভালে অংশ নেয়। বাখতিনের বক্তব্য নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে হয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনাই কার্নিভালের আকল্পকে গড়ে তুলেছে। ১৯১৭ সালের যুগান্তকারী ঘটনায় ব্যক্ত হয়েছে যৌথ বিশ্বাসের স্বপ্নময় সামগীতি; একে বলা যেতে পারে শোষিত-নিপীড়িত-প্রান্তিকায়িত

মানুষের উজ্জীবনের উৎসব। এ কেবল বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর যান্ত্রিক প্রবর্তনা নয়; রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের আরোপিত দীর্ঘতম অমারাত্রির পরে এ যেন উজ্জ্বল ভোরের কুসুমিত হয়ে ওঠা। প্রতিটি মানুষ সেখানে নবনির্মাণের হোতা এবং লক্ষ্যস্থল; বিপ্লব যেন মানুষের সমস্ত রুদ্ধ সম্ভাবনাকে মুক্ত করার উৎসব। বৈপ্লবিক পরিসরেরও সীমারেখা নেই কোনো এবং প্রতিটি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা যেহেতু অনবরত পূর্ণ হয়ে ওঠে—প্রত্যেকের স্বাধীনতা সেখানে চূড়ান্ত। অতএব কার্নিভাল রাজনৈতিক অবচেতনায় সম্পৃক্ত, এতে সংশয়ের অবকাশ নেই।

ত্রিশের দশকে সমগ্রের এই উৎসবে অন্তর্ঘাত করছিল যান্ত্রিক ও মতান্ধ রাষ্ট্রিক আমলাতন্ত্র। বাখতিন নিজেও নির্বাসিত হয়ে লক্ষ করেছিলেন কীভাবে জনসাধারণের উজ্জীবনের স্বপ্ন ও উৎসবের আবহ থেকে সর্বজনীন চেতনা সংকুচিত হয়ে ক্রমশ বিষাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু এইজন্যে লোকায়ত সংস্কৃতির শৌর্য ও লাবণ্য সম্পর্কে তাঁর মৌল প্রত্যয় হারিয়ে যায়নি। কার্নিভালের আকল্পে তিনি লোকজীবনের অন্তর্বৃত ভাবাদর্শগত শক্তির উৎস আবিষ্কার করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে এও দেখিয়েছেন, নান্দনিক আকরণ-অন্তর্বস্তু-কৃৎকৌশল-প্রতিবেদনের গ্রন্থনায় ঐ শক্তি কত বিচিত্র ভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। ফলে শুধু যে সাহিত্য ও শিল্প বদলে যায়, তা-ই নয়; জীবন ও সমাজ আমূল রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন হির্শকোপ বলেছেন, মার্ক্সীয় সাংস্কৃতিক তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে বাখতিনের মৌলিক অবদান রয়েছে। তাঁর মতে, বাখতিন একমাত্র তাত্ত্বিক—'for whom popular culture is the privileged bearer of democratic and progressive values' (১৯৮৬ : ৯২)। জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত ও মান্যতাপ্রাপ্ত সংস্কৃতিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন বাখতিন; তাঁর তাত্ত্বিক সন্দর্ভের মৌল ভিত্তিও ওখানে। অন্তর্নাট্য ও বহির্নাট্যের দ্বিবাচনিকতায় উন্মোচিত হলো এই সত্য, কার্নিভালের আশ্রয়ভূমিতে—'Power was forced out of the wings and onto the stage where it could be displayed, mocked, contested and transformed.' (তদেব)। ব্যক্তিগত জীবনে যত দুর্যোগই নেমে আসুক, বাখতিন কিন্তু সদ্য অতীত ও সমকালীন ইতিহাসের দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর আস্থা হারাননি। সামাজিক ও বৌদ্ধিক অস্থিরতা ও রূপান্তর, বিভ্রান্তি ও নিরীক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে 'দ্রষ্টা চক্ষু'র প্রয়োজনকে অনিবার্য করে তুলছিল। সত্যভ্রম ও সত্যকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বীক্ষণের দর্পণে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করার উপায় খুঁজছিলেন বাখতিন। কার্নিভালের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন বহুস্তরান্বিত ইতিহাসের প্রতিবেদনে ইতিবাচক ও গঠনমূলক অন্তর্ঘাত ঘটানোর উপযোগী আয়ুধ। একদিকে প্রকরণবাদী নন্দনের প্রচ্ছায়া এবং অন্যদিকে আধুনিকতাবাদের জায়মান চিহ্নায়কগুলির ইশারা—এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে নিজের পথ তাঁকে তৈরি করে নিতে হলো। এই পথ কার্যত লোকায়ত অনুষঙ্গের পুনর্নির্মাণে গড়ে উঠেছে।

প্যারডি, শ্রুতিসাহিত্যের শৈলী, প্রকল্পনা, প্রহসন, তির্যক বাচন এবং দ্যুতিময় হাসি প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত বিনির্মাণের বিশিষ্ট ধরন হিসেবে কার্নিভালকে প্রতিবাদী ভাবাদর্শের আকর করে তুলেছে। এই বিনির্মাণ হলো দ্বিবাচনিকতার প্রায়োগিক দর্শন যার উপযোগিতা ও তাৎপর্য ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রচিত হয়। প্রাগুক্ত ধরনগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'active discursive intervention conditioned by precise social and

historical circumstances.' (তদেব : ৯৩)। এভাবে নতুন প্রতিবেদনের যে যুক্তিবিন্যাস ফুটে উঠেছে, তাতে ব্যাকরণের বিধি কিংবা বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অনুশাসন বড়ো নয়। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে দ্বিবাচনিকতার আধার ও আধেয় খুঁজেছেন বাখতিন, তাতে বাস্তবতা ও ব্যাকরণ পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। আসলে আধিপত্যবাদীদের প্রতাপাত্মক সন্দর্ভে কার্নিভালের তির্যক হাসি দিয়ে অন্তর্ঘাত করতে চেয়েছেন তিনি। নিম্নবর্গীয়দের নিরুচ্চার অবস্থান থেকে লক্ষ করেছেন সংঘর্ষ ও ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষত রুশ সমাজকে। দ্বিবাচনিকতা যেন মুখোশের আড়াল থেকে মুখের আদল আবিষ্কার করার নিরন্তর প্রক্রিয়া, অপ্রতিহত এক প্রতিজ্ঞা। বাখতিনের প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ আমাদের মনে পড়ে আরো একবার : 'প্রতিটি তাৎপর্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়' এবং 'প্রতিটি তাৎপর্য সামাজিক'। কার্নিভালের আকল্প যেন আরো একটু এগিয়ে আমাদের জানাতে চাইছে, যে-দিকে আলো পড়ে না সাধারণত—সেদিকেই খুঁজতে হয় আলোর আর্তি। তখন নতুন ঠিকানায় পৌঁছাতে পারি, অতিব্যক্ত স্বরের বদলে অনাবিষ্কৃত স্বরের শৌর্য ও সৌন্দর্য গড়ে নিতে পারি। ফলে সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিচারে এই প্রক্রিয়া কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। প্রতিটি উচ্চারণকে তাৎপর্যবহ হতে হলে ভাবাদর্শগত প্রেক্ষিত, শ্রেণীবিভাজিত সমাজের অতীত ও বর্তমানকে স্বীকার করতে হয়। প্রান্তিকায়িত লোকসমাজ নিজস্ব তাগিদে যথাপ্রাপ্ত জগৎকে বিনির্মাণ করে; কেননা তা-ই সার্বিক পুনর্নির্মাণের আবশ্যিক ও ন্যূনতম প্রাক্‌শর্ত।

বাখতিন জানিয়েছেন, প্রতিবেদনের সামাজিকতা সমস্ত নান্দনিক উদ্যোগকে অর্থবহ করে তোলে এবং নিজস্ব নিয়তির দিকে নিয়ে যায়। 'Discourse in the Novel' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন 'the life destiny of given discourse' (১৯৮১ : ২৯২) এর কথা যাকে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুভব করতে হয়। পার্থক্য ও সমান্তরালতার উপলব্ধিতে স্পন্দিত বিভিন্ন বিষয়ের চেতনা একে অপরকে সৃষ্টি ও রূপান্তরিত করে চলেছে। বাখতিন যে সামাজিক প্রেক্ষিতকে উপস্থাপিত করেছেন, চেতনার বহুত্ব তার গোত্রলক্ষণ। আবার এর মধ্যে সন্নিবেশিত হচ্ছে বিবিধ অপরতার ধারাবাহিক অভিব্যক্তি। দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার শেষ নেই এবং তাতে বিচ্ছেদও নেই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোনের আভাস দিয়ে জটিল-এক সমগ্রতার আকরণ এরা গড়ে তোলে। সংশয়পীড়িত সময়-পর্বেও বাখতিন যে অনেকার্থদ্যোতনার তাত্ত্বিক আকল্প তুলে ধরতে পেরেছেন, এতে তাঁর একক বাচনের প্রতিরোধ-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। আবার, দ্বিবাচনিকতার নিরন্তর প্রবাহ যেহেতু লক্ষ করছেন তিনি—সমাজতান্ত্রিক নবনির্মাণের প্রতিজ্ঞাও সৃজনশীল ভাবে পুনর্বিন্যস্ত হলো। সামাজিক কৃত্যের বহুত্ব দ্বন্দ্ববাদে অস্বীকৃত হয়, তা কিন্তু নয়। বাখতিন যেমন প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি পরিসরের কথা ভেবেছেন, তেমনি সামূহিক বাচনের আশ্রয় হিসেবে সমগ্র কাল ও সমগ্র পরিসরের কথাও ভেবেছেন। তবে তাঁর বিশেষত্ব হলো, সত্যের উদ্‌ভাসনে 'dialogically interrelated set' (তদেব : ২৯৩) এর গুরুত্বকে তিনি সর্বাত্মক করে তুলেছেন। এভাবে দ্বিবাচনিকতা ভাবাদর্শগত সংগ্রামেরও বিশিষ্টতম আয়ুধ হয়ে উঠেছে যা ব্যক্তিকে সামাজিক প্রেরণায় গ্রথিত করে বারবার। সুতরাং বাখতিন মার্ক্সীয় চেতনার নির্যাসকে সৃষ্টিশীল ভাবে প্রয়োগ করে সমকালের সংশয়কুহেলি ছিন্নভিন্ন করেছেন এবং চিরদিবসের সূর্যকে সমকাল থেকেও আরো বেশি সংশয়কন্টকিত

ভবিষ্যতে ঈপ্সিত দিগন্তের দিশারি করে রেখেছেন—একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

বাখতিন কি তাহলে তাঁর তত্ত্ববিশ্বকে কল্পিত স্বর্গের আদলে গড়তে চেয়েছেন? তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী হিসেবে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের বহুবাচনিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। বহুদিন মার্ক্সবাদীদের নতুন মানবসমাজের স্বপ্ন দেখার জন্যে কল্পিত স্বর্গের নির্মাতা বলে ঠাট্টা করা হয়েছে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। বাখতিনের আকল্প অনুযায়ী প্রতাপের কথা না-বলে ভাষা-বাচন-প্রতিবেদনের কথা বললে তার কোনো তাৎপর্য থাকবে না। পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণের আবহে কোনো আন্তরিক উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাছাড়া 'নিরপেক্ষ' উচ্চারণ বলে কিছু হতে পারে না; কখনো বা প্রতাপের বশীভূত কখনো প্রতাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি। এই হলো প্রতিবেদনের অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক চেতনার দ্বিবাচনিক প্রেক্ষিত। বাখতিনকে যাঁরা রাজনীতির সংক্রমণ থেকে মুক্ত করার জন্যে মার্ক্সবাদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলতে চান—তাঁরা আসলে বাখতিনীয় অণুবিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করেন। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের চূড়ান্ত প্রযুক্তিনির্ভর আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়ে তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিকায়িত জনসাধারণ যখন বিশ্বপুঁজিবাদের একবাচনিক সন্দর্ভে কেবল সন্ত্রাসের অনেকান্তিক বয়ন দেখতে পাচ্ছে—সেসময় বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা ও অনেকার্থদ্যোতনা, কার্নিভাল ও বহুস্বরিকতা যেন প্রতিবাদের আয়ুধ যোগান দিচ্ছে। যাকে ব্যারি রুটল্যান্ড 'dialogic flux of collective desire' বলেন, তারই প্রেরণায় তৃতীয় বিশ্বের দেশে-দেশে জেগে উঠছে জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা। অতিকেন্দ্রায়িত একবাচনিক সন্দর্ভের বিস্তার প্রতিরোধহীন তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে-রুদ্ধতার আশঙ্কা তৈরি করছে, তার বিপ্রতীপে বাখতিনের প্রস্তাবিত কার্নিভাল ও দ্বিবাচনিকতা তুলে ধরছে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের পতাকা। সাম্প্রতিক ইতিহাস ও রাজনীতি বিশ্বায়নের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে যখন ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠছে, একদিকে আধুনিকোত্তর ও অন্যদিকে উপনিবেশোত্তর জীবনের পার্থক্য ও সমান্তরালতা অনৈক্য এবং ঐক্যের অভূতপূর্ব ও অন্যোন্য-উদ্ভাসন সম্ভব করে তুলেছে—সেসময় দুটি প্রাগুক্ত আকল্প বিচিত্র বহুস্বরিকতার আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের উপর আন্তর্জাতিক পণ্যায়নের অভিঘাত যখন প্রবলতম, বাখতিনের ভাববীজগুলি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। কেননা সেইসব আকল্প 'display...a built-in affinity for the oppressed and the marginal.' (রবার্ট স্ট্যাম : ১৯৮৯ : ২১)। কার্নিভালের মধ্য দিয়ে প্রকাশমান দ্বিবাচনিকতা তাই এই মুহূর্তে নিপীড়িতের রণকৌশল হিসেবে গৃহীত হতে পারে। মার্ক্সীয় চেতনার যা মৌল লক্ষ্য, বাখতিনের মধ্য দিয়ে আমরা আজ পৌঁছে যেতে পারছি সেই প্রতিবাদী প্রক্রিয়ায় যার সাহায্যে প্রান্তিকায়িত বর্গ বিকেন্দ্রায়নের আধেয় হয়ে উঠতে পারে। অবজ্ঞাত তৃতীয় বিশ্বে এইজন্যে এখন বাখতিন যেন পুনরাবিষ্কৃত চেতনার অক্ষয় তূণীর, মানবিক উদ্‌ভাসনের ভরসাস্থল, অন্তেবাসীদের পুনরুজ্জীবনের উৎস।

কার্নিভাল : লোকায়তের প্রত্যাঘাত

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও স্বভাব আধিপত্যবাদের দীর্ঘায়ত প্রশ্রয়ে এত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত যে এদের আস্তিত্বিক সংগঠনে প্রচ্ছন্ন লোকায়ত উপাদান সম্পর্কে প্রায় কেউই অবহিত থাকে না। সাংস্কৃতিক রাজনীতির অভিঘাত কীভাবে সত্য ও মিথ্যার সংজ্ঞা পালটে দেয়, এ বিষয়ে অসচেতনতা প্রায় সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন নয় যে আধুনিক যুগেই সরকারি সন্দর্ভ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। প্রাক্-আধুনিক সময়পর্বের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদনেও সরকারি অবস্থানই একান্তিক মান্যতা পেয়েছে। তা ঘটেছে লোকায়ত জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে পুরোপুরি নিরাকৃত করে। তবু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে প্রাতিষ্ঠানিক একাধিপত্যের অচলায়তন ভেঙে দিয়ে প্রান্তিক অস্তিত্বের উপস্থিতি তির্যকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাখতিন যখন লোকায়ত জীবনে জনপ্রিয় কৌতুকের বিস্মৃত পরম্পরা নিয়ে কথা বলেন, দ্বিবাচনিক অপর পরিসরের অনস্বীকার্য প্রতিস্রোত সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। Rabelais and his world ও Problems of Dostoevsky's Poetics—এই দুটি বইতে বাখতিন তাঁর বিখ্যাত কার্নিভাল-ভাবনা উপস্থাপিত করেছেন। ষোল শতকের বিখ্যাত সাহিত্যিক রাবেলের রচনায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন সন্দর্ভের বিকল্প একটি ধরন যা সরকারি ভাবাদর্শ ও উপস্থাপনা রীতির বিরোধিতা করে। এমনকী ডস্টয়েভস্কির মতো বহুস্বরিক সন্দর্ভ রচয়িতার পাঠকৃতিতেও তিনি দূরবর্তী কার্নিভাল-অতীতের অবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। জনপ্রিয় ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে কার্নিভাল যখন বয়ানের পাঠতন্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাতে যুগপৎ ধরা পড়ে বিকল্প চিন্তন-অভিজ্ঞতা-অনুভূতির চিহ্নায়ন প্রকরণ। জুলিয়া ক্রিস্তেভার মতে কার্নিভাল শুধু চিহ্নায়ক নয়, তা চিহ্নায়িতও বটে। তা-ই কোনো পাঠকৃতিতে যুগপৎ উপস্থাপনার বিষয় ও পদ্ধতি।

কোনো পাঠকৃতির চিত্রকল্প, ভাষা ও কথাবস্তুর মধ্যে কার্নিভালের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একে বলা যেতে পারে মঞ্চ-ছাড়া দৃশ্যসজ্জা; এতে যোগ দেয় যে সে যুগপৎ অভিনেতা ও দর্শক। প্রান্তিক লোক-উপাদান কীভাবে পাঠতন্তুতে রূপান্তরিত হবে, তার কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই এবং তা সরাসরিও ঘটে না। মান্য বয়ানে পৌঁছানোর পথে বেশ কিছু অন্তর্বর্তী স্তর পেরিয়ে যেতে হয় বলে প্রাকরণিক ও শৈলীগত রূপান্তর অন্তর্বস্তুর তাৎপর্যেও যথেষ্ট স্বরান্তর ঘটিয়ে দেয়। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে কার্নিভালের যে-ভূমিকা থাকে, প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানের প্রচ্ছায়ায় তার অনেকখানি বদলে যায়। আধিপত্যবাদী প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য বিচ্ছুরণের বিরুদ্ধে যাদের প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল সমান্তরাল অপরতার প্রকৃত অভিজ্ঞান, তা প্রাগুক্ত রূপান্তরের ফলে অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। তবু শিলাস্তরে নিহিত আদিমযুগের ভূতাত্ত্বিক অবশেষের মতো সাহিত্যিক প্রতিবেদনেও প্রচ্ছন্ন থাকে বিগত কালের সাংস্কৃতিক উপাদান, যা প্রতিস্রোতপন্থী লোকায়ত জীবনের ইশারা বয়ে আনে। বাখতিন দেখিয়েছেন, মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের জীবনে কার্নিভাল অনেক বেশি প্রকট ছিল। কেননা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে ছিল দ্বৈততা। একদিকে রাষ্ট্র ও ধর্মতন্ত্রের কর্তৃত্ব খচিত সরকারি বয়ান, সামন্ততান্ত্রিক বিধি প্রণোদিত কৃত্যের

বিশাল চাপ এবং অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবনপ্রণালীর হাসি, গান, কৌতুক, প্যারডি এবং বিপ্রতীপায়ন। এই ভাবনাসূত্রের নিরিখে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যদি পুনঃপাঠ করি, দেখব, নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনমানস ও নারী সমাজের অপ্রাতিষ্ঠানিক বয়ান পরবর্তীকালে আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে মঙ্গলকাব্যের ধারা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিবিড় পাঠের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি, বহু স্তরে রূপান্তরিত ঐসব পাঠকৃতির মধ্যে লোকায়ত কার্নিভালের আদিস্তরের অবশেষ রয়ে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক রাজনীতির অভিঘাত সত্ত্বেও বিপ্রতীপায়নের প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়।

বস্তুত এ কেবল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিষয় নয়। ধনতান্ত্রিক যুগেও অত্যন্ত পরিশীলিত ও বৌদ্ধিক চাতুর্য খচিত পাঠকৃতিতে এধরনের কার্নিভালীকরণ দেখা যায়। কোথাও তা স্পষ্ট আর কোথাও তত স্পষ্ট নয়, এইমাত্র তফাত। ডস্টয়েভস্কির নন্দন সম্পর্কিত বিখ্যাত বইতে বাখতিন লিখেছেন যে সাহিত্যের কার্নিভালীকরণ প্রক্রিয়া খুবই সৃষ্টিশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা গ্রহণ করতে পারি—'As a means for capturing in art the developing relationship under capitalism, at a time when previous forms of life, moral principles and beliefs were being turned into rotten cords and the previously concealed, ambivalent and unfinalised nature of man and human thought was being nakedly exposed.' (১৯৮৪ : ১৬৬)।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার একমাত্রিক আধিপত্যের পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যেও দেখেছি কীভাবে সমস্ত প্রাক্-আধুনিক জীবনপ্রণালী, নৈতিকতার বোধ এবং সামাজিক ও নান্দনিক ভাবাদর্শ অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক দীপায়নের ভেতরকার রাজনীতিকে উনিশ শতকের মধ্যস্বত্বভোগী নব্য বিদ্বৎসমাজ অনুধাবন করতে পারেননি। আসলে ঐতিহাসিক সময়ের গণ্ডি তাঁদের রুদ্ধ করে রেখেছিল শ্রেণীস্বার্থের পিঞ্জরে। 'বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়, কোথায় কারার দ্বার'—এমন বলা যায় না, যেহেতু এই কারাগার তাঁদের স্বযাচিত। জায়মান ধনতন্ত্র যে উপনিবেশের আয়ুধ, তা বোঝার দরকার ছিল না; কেননা তখন তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বৈষয়িক সমৃদ্ধির সম্ভাবনায়, অভিনব জ্যোতিরুচ্ছ্বাসের সহগামী শক্তির প্রত্যাশায়। অতএব এঁরা সর্বস্তরে সরকারি বীক্ষা ও প্রতিবেদনকে মান্যতা দেবেন; এজন্যে নিজেরা অণুবীক্ষণ-লভ্য হয়েও, বিপুল জনসমাজের ঐতিহ্য-বিশ্বাস-মূল্যবোধকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সমস্ত প্রাক্তন জীবনপ্রণালী তাঁদের কাছে অতীতের প্রেতচ্ছায়া বলে গণ্য হলো। তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রতিবেদনে উচ্চবর্গীয়দের কৃত্রিম নির্মিতি আধুনিকতার শিরোপা পেতে থাকল। কিন্তু তার মানে কি এই যে অনাগরিক ব্রাত্য জীবন পুরোপুরি মুছে গেল যেহেতু তারা ইংরেজিতে লিখতে-পড়তে-বলতে-ভাবতে পারে না? সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচার কিংবা পাঠ-প্রকরণ যদিও সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ণীত হলো, লোকায়ত জীবনের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি এবং হস্তক্ষেপ কিন্তু খারিজ করা গেল না। কেননা মানুষ আর তার চিন্তাবিশ্ব চূড়ান্তীকরণ প্রতিহত করে; পীড়ন যত সর্বগ্রাসী, প্রতিরোধও তত অনিবার্য। নতুন-নতুন পথে তার আবিষ্কার ঘটতে থাকে।

দুই

তাই প্রতীচ্যায়িত উপন্যাসের দর্পণে উনিশ শতকের নব্য আলোকপ্রাপ্ত বর্গ যখন নিজেদের কাঙিক্ষত প্রসাধনধন্য ও অলংকৃত চেহারা দেখতে পেয়ে তৃপ্ত, কল্পিত আকাশে ইচ্ছাপূরণমূলক ভ্রমণের বিবরণে মুগ্ধ—বিস্মৃত ভূমির সঙ্গে সংলগ্ন সামূহিক জীবনের পরম্পরার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ঐতিহাসিক ভাবেই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল লোকায়তের প্রত্যাঘাত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী* (১৮৯২) সেই পাঠকৃতি যার কোষে-কোষে 'folk carnival humour' -এর প্রগাঢ় উপস্থিতি লক্ষ করি। রাবেলের অণুবিশ্বে বাখতিন যেমন দেখতে পেয়েছেন 'boundless world of humourous forms and manifestations (which) opposed the official and serious tone of medieval ecclesiastical and feudal culture'—তেমনি আমরাও *কঙ্কাবতী*-র অণুবিশ্ব জুড়ে একদিকে দেখতে পাই সামন্ততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মতন্ত্রের বীভৎস গলিত প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র। অন্যদিকে দেখি তাদের নিষ্ঠুর বেপরোয়া আধিপত্যবাদী আকরণের প্রতিস্পর্ধী অজস্র অস্তিত্বের মিছিল। ফাঁপা সরকারি অবস্থানের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ায়, তাদের কেউ মানুষ নয়। যেন মানুষের অবয়বে অতিব্যক্ত পাশবিকতার প্রতি তর্জনি সংকেত করার জন্যে হাসির আড়ালে জীবনের মর্মসত্য ('প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা' :বাখতিন) প্রকাশ করেছে জন্তু-সরীসৃপ-কীট-পতঙ্গ-ভূত-পেত্নীর ছদ্মবেশধারী কুশীলবেরা। এরা সবাই আকারে-প্রকারে স্বভাবে-অভিব্যক্তিতে কার্নিভালের অন্তহীন হাস্যময় ভুবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বাখতিন-কথিত বিপ্রতীপায়নের অসামান্য দৃষ্টান্ত পাচ্ছি ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিবেদনে। মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর (এবং, বাস্তব ও প্রকল্পনার) এমন পারস্পরিক ভূমিকা-বদল কার্নিভালের সৃষ্টিশীল সম্ভাবনারই প্রমাণ।

ঠিক ১০১ বছর পরে প্রকাশিত নবারুণ ভট্টাচার্যের *হারবার্ট* (১৯৯৩) যেন বাংলা সাহিত্যে অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ ও উন্মুখ আধুনিকোত্তরবাদের সন্ধিলগ্নে '*urban carnival humour*'-এর দৃষ্টান্ত। ত্রৈলোক্যনাথে ছিল উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কাহিনী-গ্রন্থনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ছিল বাস্তবতার নামে ছদ্ম-বাস্তব চাপিয়ে দেওয়ার সুবিধাবাদী রীতির বিরুদ্ধে দ্রোহ। আর, নবারুণ বিশ শতকের উপার্জন বলে প্রচারিত যাবতীয় ধূর্ততা-কৃত্রিমতা-অন্তঃসারশূন্যতা ভরা কাহিনি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে অস্বীকার করেছেন। নয়া-ঔপনিবেশিক প্রতাপকে প্রত্যাঘাত জানানোর জন্যে তিনি বেছে নিয়েছেন হার্বার্ট সরকার নামক এক নাগরিক অন্তেবাসীকে। তার জীবন যতটা গোলমেলে ও শ্লেষগর্ভ, মৃত্যু তার চেয়েও বেশি। 'কাহিনি' শব্দটাই যখন চরম অবাস্তব, নবারুণ তাকে পুরোপুরি বিনির্মাণ নয় কেবল—তীব্র পরিহাসেও বিদ্ধ করেছেন। তাঁর এই আকরণোত্তর গ্রন্থনার অন্তঃস্বর সম্পর্কে লেখক কতখানি সচেতন, তা হারবার্টের মৃত্যু ও পরবর্তী বর্ণনায় স্পষ্ট: 'হঠাৎ তালে তালে হাততালি দেওয়া শুরু হয়। সঙ্গে সিটি ও নানারকম বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ। এইভাবে শোক অন্তিম রিচুয়ালের মাধ্যমে ব্যাপকতর আনন্দময় কোলাহলে পরিণত হতে থাকে। ... গেটের পাশেই ক্রন্দনশীলা শোভারানীর পাশে বিমূঢ় ললিতকুমার দাঁড়িয়েছিলেন। আনন্দধ্বনি শুনে তিনি বলে উঠলেন, শোভা, তুমি কাঁদছ? এ তো দেখছি কার্নিভাল।' (পৃ. ৫৫) যেভাবেই উচ্চারিত হোক না কেন

শব্দটি, যাবতীয় যথাপ্রাপ্তকে বিনির্মাণ করার মতো বিস্ফোরক এর মধ্যে মজুত রয়েছে। কেন্দ্রীয় কুশীলবের কথায় ও কাজে বহির্বৃত অপর পরিসরের নিরন্তর অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ব্যক্ত হয়েছে। নিছক উন্মাদের পাঠক্রম রচনা যে করেনি *হারবার্ট*, তা লেখকের এই ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপনায় স্পষ্ট : 'এল. টি. টি. ই-র লাইভ হিউম্যান বম্‌ব ধানুর সঙ্গে তুলনীয় হারবার্ট ছিল একটি ডেড্ হিউম্যান বম্‌ব। ...গত দুই দশক ধরে এই বিস্ফোরক সমাহার তোষকের মধ্যে শীতঘুম ঘুমোচ্ছিল যা চুল্লির উত্তাপে জেগে ওঠে। ...হারবার্টের রক্তহীন মৃতদেহ দাহ করার সময় জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল তা অবধারিত ভাবে এই ইঙ্গিতই দিয়ে চলে যে কখন, কোথায়, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে।' (পৃ. ৫৭)

এই বিন্দুতে এসে মনে হয়, কার্নিভাল কেবল সাহিত্যিক কৃৎকৌশল নয়; কার্নিভালের ধারণায় রয়েছে মুক্ত পরিসর, রয়েছে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অন্তঃস্বর। সর্বত্র-ব্যাপ্ত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জানাতে গিয়ে ঐ মুক্ত পরিসরের সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে হয়। পাঠকৃতির নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে, রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিকতার নানা আয়োজন। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হলে মনে রাখতে হয় যে পাঠকৃতিও যুদ্ধক্ষেত্র; লেখা ও পড়া—দু'টি ক্রিয়াই মূলত যুদ্ধ। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত তাৎপর্য অর্জনীয় বলেই লেখার কার্নিভালীকরণ যা ঘটিয়ে দেয়, তা যুগপৎ নান্দনিক ও রাজনৈতিক উন্মোচন। নবারুণ *হারবার্ট*-এ কার্নিভালের নাগরিক প্রয়োগ সম্পন্ন করেছেন। সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকেরা আধুনিকোত্তর কার্নিভাল, প্যারডি, শ্লেষ ও হাসি সম্পর্কে যে-সব আলোচনা করেছেন, সেই নিরিখে বলা যায়, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুরোপুরি নতুন স্তর আবিষ্কার করতে পারি তাতে। একটু আগেই লক্ষ করলাম যে কার্নিভালের ধারণা শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় অনুষঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে না; আধুনিক এবং আধুনিকোত্তর কালপর্বেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাঠের অভিনব পদ্ধতিকে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই বাখতিনের আদি প্রেরণা থেকে সময় ও পরিসরের বিচারে বহু দূরবর্তী বয়ানেও কার্নিভালীকরণের ভাববীজ ব্যবহার করা যাচ্ছে। এপ্রসঙ্গে চার্লস জেঙ্কস-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি : 'The Carnivalesque in postmodern literature is the crossing of boundaries, the breakdown of all categories of class, sex and genre that occurs in any carnival worthy of the name' (১৯৯১ : ১৭)।

বিভিন্ন বর্গায়তনের মধ্যবর্তী সীমান্ত যখন মুছে যায়, প্রান্তিকায়িত স্তরের উপেক্ষিত উপাদান শ্লেষ ও পরিহাসের অন্তর্ভেদী শক্তি নিয়ে অবতল থেকে উর্ধ্বায়িত হয়ে ওঠে। আধুনিকোত্তর সাহিত্য যেহেতু যুগপৎ উপস্থাপিত বক্তব্যকে সমর্থন দেয় ও প্রশ্নে বিদ্ধ করে—আপাতদৃষ্টিতে কার্নিভালের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রবণতার সঙ্গে কূটাভাসের সম্পর্ক তৈরি হয়। কেউ কেউ এমনও ভাবতে পারেন যে কার্নিভালের প্রধান উপজীব্য হাসি তাতে গোপন বিষণ্ণতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। বাখতিনের মৌল অভিপ্রায় থেকে বিচ্যুত হলে বিদ্রূপগর্ভ বা পরিহাসপ্রবণ বিপ্রতীপায়ন কীভাবে কার্নিভাল বলে বিবেচিত হতে পারে? আসলে খুব সতর্কভাবে বিষয়টির মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। সরকারি কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিন্যাস যে জীবনে মননে নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপ আরোপ করে—তাকে প্রত্যাহ্বান জানাতে প্রান্তিক অবতল থেকে উঠে আসে কার্নিভালের প্রতিস্রোত। অতি-উদ্ভাসন

যে বিপুল অন্ধতাকে আবৃত করে রেখেছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আমাদের। লোকায়ত জ্ঞান ও অনুভূতি সরাসরি নয়, নানা ছদ্মবেশ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানের রৈখিকতায় আঘাত করে। সাংস্কৃতিক প্রভুত্ববাদের দেওয়াল তাতে ভেঙে না পড়ুক, বেশ কিছু পাথর অন্তত খসে পড়ে। আর, এই গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হয় আমাদের, একমাত্রিক জাতীয় সংস্কৃতি বা মূল্যবোধ সত্য হতে পারে না কখনও। প্রান্তিকায়িত অপর পরিসরের মধ্যে অনাবিষ্কৃত রইল কিনা জনমানসের প্রকৃত নির্যাস, সামূহিক অস্তিত্বের খাঁটি প্রাণপ্রবাহ—সে-বিষয়ে আমাদের অবহিত করে বলেই তো 'Bakhtin's carnival idea had the thrill of a cultural and biological universal.' (Caryl Emerson : 1997 : 163)। সামাজিক জীবনের মর্মমূলে যাঁরা বহুত্ববাদী দার্শনিক বীক্ষাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেন, সরকারি বক্তব্যকে নির্বিকল্প মান্যতা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবই নয়। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণায় এখন প্রমাণিত যে বৃহৎ ঐতিহ্য ও লঘু ঐতিহ্য সম্মিলিত ভাবে জাতীয় সংস্কৃতির জন্ম দেয়। কিন্তু উদ্ধত আধিপত্যবাদ এই সত্যকে অস্বীকার করতে চায় বলে সমস্ত অপর পরিসরের অস্তিত্বই মুছে ফেলে এবং কোথাও কোনো বিকল্পের সম্ভাবনাও স্বীকার করে না। চূড়ান্ত এই একবাচনিকতা ও রুদ্ধতাকে মোকাবিলা করতে দেখা দেয় কার্নিভালের বিপ্রতীপায়ন। দ্রোহাত্মক এই প্রবণতাকে কেউ কেউ বলেছেন সংযোগের নতুন আকল্প; বলেছেন, এ আসলে 'Carnival dynamics' (তদেব)।

এই 'dynamics'-এর নিরিখে আপাত-প্রাতিষ্ঠানিক লিখনপ্রণালীর মধ্যেও আমরা আবিষ্কার করতে পারি ভূমিসংলগ্ন জীবনের দ্রোহ, ক্ষমতা-দম্ভ মোকাবিলার জন্যে লোকায়ত চেতনার অন্তর্ঘাত। হয়তো এতে সাময়িক কৌণিকতার চেয়ে বেশি কিছু তৈরি হয় না; তবু একবাচনিক সরকারি বয়ানই যে শেষ কথা নয়—এই উপলব্ধি অন্তত নিয়ে আসে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক প্রকরণ থেকে উৎসারিত বেসরকারি রচনাপুঞ্জ। তার প্রকাশ হয়তো পিনদ্ধ নয়, প্রণালীবদ্ধও নয়; তবু প্রাতিষ্ঠানিক বাচনের অভ্যস্ত ও রুদ্ধ অচলায়তনে প্রতিস্পর্ধা জানাতে এর জুড়ি নেই। একে বাখতিন বলেন কার্নিভালীকৃত লিখন-প্রয়াস—'which has taken the carnival spirit into itself and thus reproduces within its own structures and by its own practice, the characteristic inversions, parodies and discrownings of carnival proper,' (Simon Dentith : 1995 : 65)। বাখতিনের দৃষ্টিকোন অনুসরণ করে সমালোচকেরা লক্ষ করেছেন যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু কিছু বিশেষ পর্যায়ে কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী প্রবণতা আলাদা ভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তখন সরকারি বয়ান যত দাপটের সঙ্গে উচ্চবর্গীয় অবস্থানকে পুষ্ট করুক না কেন, প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই অনালোকিত পরিসর থেকে উঠে আসে সমান্তরাল অস্তিত্বের বার্তা। তখন কোনো-একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রকরণ একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করলেও তারই ভেতর থেকে দেখা দেয় ভিন্ন ধরনের অন্তর্বয়নের ঘোষণা।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই কখনও কখনও চোখে পড়ে সম্ভাব্য 'carnival spirit'-এর উপস্থিতি। *বিষবৃক্ষ, রজনী* ও *রাজসিংহ*-এর মতো নিশ্ছিদ্র গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রতিবেদনেও ঐ ব্যতিরেকী উপস্থিতির ইশারা রয়েছে। আর, ইন্দিরার পরিহাস, আখ্যানের বিশিষ্ট চলনে লক্ষ করি সেই বিপ্রতীপায়নের প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃপ্ত আবির্ভাবের ঠিক আগে *আলালের ঘরের দুলাল* ও *হুতোম প্যাঁচার নকশা*

নামক দুটি প্রতিবেদনে কার্নিভালের প্রবল উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সংকেতগর্ভ। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নাগরিক সমাজ যখন আত্মদৃষ্ট দর্পণে আলোর উদ্‌ভাসনের বদলে সহগামী ছায়ার পরিসরই বেশি মাত্রায় দেখতে পাচ্ছিল, আখ্যানে ইচ্ছাপূরণের আয়োজন সত্ত্বেও 'carnival imagery'-এর চলমান প্রবাহে সমান্তরাল পরিসর প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। জীবনের বয়ান তৈরি করতে গিয়ে সংবেদনশীল লেখকেরা সমাজ-জীবনে যেসব অসঙ্গতি লক্ষ করেছিলেন, তাদের প্রচলিত কমেডির ধরন কিংবা ব্যঙ্গ-পরিহাস দিয়ে উপস্থাপিত করলে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা-শৃঙ্খলায় কার্যকরী ভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না। এখানেই কার্নিভালীকরণের প্রসঙ্গ আমাদের মনোযোগ দাবি করে।

তিন

না লিখলেও চলে, হাসি শুধু হাসি নয়, ব্যঙ্গ-পরিহাস-প্যারডিও নিছক কৌতুক নয়। যেহেতু আধিপত্যেবাদের বিরুদ্ধে অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকজীবনের নিরবচ্ছিন্ন উৎস থেকে সঞ্চালিত হয় জনমানসের প্রত্যাঘাত, তার সাংস্কৃতিক রাজনীতিগত তাৎপর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সত্যের ওপর সুবিধাভোগী উচ্চবর্গীয়দের দখলদারি মেনে নিতে পারে না বলেই প্রান্তিকায়িত জনের নিজস্ব প্রতিবাদ আরোপিত কাঠামোকে বিদ্রূপে-শ্লেষে-হাসির তরঙ্গে বিদ্ধ করে। ক্রিস্টফার স্টোন তাঁর *Parody* নামক বইতে মন্তব্য করেছিলেন : 'ridicule is society's most effective means of curing inelasticity. It explores the pompous, corrects the well-meaning eccentric, cools the fanatical and presents the incompetent from achieving success. Truth will prevail over it, falsehood will cower under it.' (১৯৯৪ : ৮)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মন্তব্য। বাখতিনের কার্নিভাল বিষয়ক তত্ত্ববীজে এই ভাবনা আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী হয়ে পরিহাসকে অনেকার্থদ্যোতক করে তুলেছে। সমাজের নিচুতলার যে-পরিসরে সাধারণত আলো পড়ে না, তাদের জনপ্রিয় উৎসব-হুল্লোড়-মজা-পরিহাসের মধ্যেও যে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে বৃহত্তর সমাজের পক্ষে আবশ্যিক শুদ্ধীকরণের কৃৎকৌশল—তা সাধারণভাবে নজরে পড়ে না। যেখানে গর্বোদ্ধত আধিপত্যবাদীরা নিজেদের বীক্ষণ ও প্রকাশে কোনো ধরনের পরিবর্তন মেনে নিতে চায় না এবং ফলে নিজেদের বিভিন্ন প্রতিবেদনকে চরম রক্ষণশীল অচলায়তনে পরিণত করে—সেখানে ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে সর্বতোভাবে মুক্ত পরিসরের সূত্রধার নিম্নবর্গীয় সমাজ। সামাজিক আয়তনের অনমনীয়তা ব্যাধির মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে গতির আকল্পগুলিকে পরাভূত করে এবং পঙ্গুতা হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। ঐ অনমনীয়তার প্রতিষেধক হিসেবে দেখা দেয় কার্নিভালের হাসি। উচ্চবর্গীয় বয়ানের অলংকৃত ও প্রসাধিত অবয়ব যে দুর্বল ও শিথিল মুখোশমাত্র, ঐ সত্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয় কার্নিভালের কৃৎকৌশল। যে-সমস্ত পরিসরে আরোগ্য বিধান সম্ভব, সেখানে অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী হতে পারে নিম্নবর্গীয় লোকবৃত্ত থেকে উৎসারিত চেতনার প্রতিস্রোত।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ যে গড়ে তুলতে পারে কার্নিভাল, তার কারণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরম্পরা থেকে বিচ্ছেদ রচনা করে কর্তৃত্ববাদীরা। পর্যায়ে পর্যায়ে অত্যন্ত সুকৌশলে, প্রচারের চাতুর্যে, মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থানুকূল প্রবণতাকে

সর্বজনীন বলে উপস্থাপিত করে তারা। তবু উদ্ভাসনের আতিশয্য সত্ত্বেও মিথ্যার এই প্রগল্ভতাকে ধরিয়ে দিতে পারে কার্নিভাল। কেননা ঐতিহ্যের চিরায়তনে লোকসমাজের শিকড় অত্যন্ত দৃঢ়, সাময়িক আঁধি সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপক বিচ্ছেদের কোনো অবকাশ নেই। বাখতিন যাকে 'collective ancestral body of all the people' (১৯৮৪ : ১৯) বলেছেন, ব্যতিরেকী দৃষ্টিভঙ্গির উৎস সেখানেই। ষোল শতকে রচিত রাবেলের উপন্যাসে তিনি যে জনপ্রিয় উৎসব-মুখরতার ওপর সর্বাত্মক নির্ভরতা লক্ষ করেছেন, তাতে পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে অর্জিত সামূহিক বয়ানের পরম্পরার প্রতি মান্যতা ফুটে উঠেছে। গোষ্ঠীগত ধারাবাহিকতার বোধ ছাড়া এই মান্যতা সম্ভব নয়। কার্নিভালমূলক চিত্রকল্প ও চিহ্নায়কের বিপুল ভাণ্ডার থেকে রাবেলে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং মধ্যযুগের সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির রুদ্ধতার বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করেছেন। জনপ্রিয় আনন্দ ও ইতিবাচকতার প্রেরণা হিসেবে বাখতিন শারীরিক অনুষঙ্গের বস্তুতান্ত্রিক স্বভাবের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ করেছেন। বিমূর্তায়নের প্রতি উচ্চসংস্কৃতির যে ঝোঁক রয়েছে, এর কারণ একে মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণায় অভিজাত বলে ধরে নেওয়া হয়। কৃত্রিম নির্মিতির প্রতি একরৈখিক আনুগত্য থাকায় অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক অভিব্যক্তির বস্তুতন্ত্রকে উচ্চসংস্কৃতি চিরকালই তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে এবং অবদমিত করেছে। রাবেলে মূলত এই অবদমনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিকল্প নন্দন ও বিকল্প প্রতিবেদনের প্রস্তাবনা করেছিলেন। বাখতিন তাঁর বইতে নিঃসন্দেহে এমন-এক নন্দনের কথা জানিয়েছেন যা 'celebrates the anarchic, body-based grotesque elements of popular culture, and seeks to mobilize them against the humanless seriousness of official culture.' (ডেন্‌টিথ : প্রাগুক্ত : ৬৬)।

জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়ঘন দৈহিকতা ও উদ্ভট উপাদানের প্রতি যে আকর্ষণ দেখা যায়, তাতে নৈরাজ্যের বৈশিষ্ট্য থাকলেও সরকারি মনোভঙ্গি প্রত্যাখ্যানের তাগিদই আসল। প্রতিবাদী নন্দন গড়ে ওঠে এই প্রবণতা থেকেই। উদ্ভট বা আতিশয্য লোকবৃত্তে নিহিত অসঙ্গতির প্রমাণ নয়, এদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সরকারি বয়ানের বিরুদ্ধে হাসিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে গণমন। 'Grotesque realism' নামক বিশেষ পারিভাষিক শব্দবন্ধ দিয়ে রাবেলের রচনাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুতন্ত্র ও শারীরিক অনুষঙ্গের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দেখানো হয়েছে কীভাবে এরই প্রভাবে লিখনশৈলী কার্নিভালীকৃত হয়ে যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করার মধ্য দিয়ে যে-ধরনের জৈবিক বৃত্তি ব্যক্ত হয়, তাকে আড়াল করার পরিবর্তে কার্নিভাল-অনুপ্রাণিত লেখক শারীরিক উপস্থিতিকে যেন উৎসবে রূপান্তরিত করেন। এইজন্যে লেখককে সতর্ক মাপজোখ ও পরিশীলনের পথ ছেড়ে দিয়ে আদিমতা, আতিশয্য ও উদ্ভটের পথ গ্রহণ করতে হয়।

তাই বাখতিনকে লিখতে হয়েছে : 'The essential principle of grotesque realism is degradation.' (তদেব : ১৯)। তবে এই আপাতস্থূলতা বা অবনমন নিছক নেতিবাচক প্রক্রিয়ামাত্র নয়। খনি থেকে তুলে-আনা আকাটা হিরের মতো লোকায়ত জীবনে উদ্ভট ও অসঙ্গত বলে প্রতীয়মান বস্তু আসলে মূল্যবান চিহ্নায়ক। এই বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় যে প্রসাধন ও পরিচ্ছদের আড়ম্বর আমাদের বিভ্রান্ত করে। মানুষ মূলত বিমূর্ত ও বায়বীয় নয়; রক্ত-মাংস-হাড়-মজ্জার বাস্তবতাকে অস্বীকার

করা অসম্ভব। তাই বিমূর্তায়নের 'অভিজাত' পথ অনুসরণ না করাতে আপাত-দৃষ্টিতে যে অবনমন ঘটেছে, তা ইতিবাচক অস্তিত্বের ঘোষণা। ইতিবাচক এইজন্যে বলছি যে কার্নিভালের উৎসাহ ও সজীবতা লালিত চিত্রকল্পে ও চিহ্নায়কে মানুষের নির্মল ও অকৃত্রিম অস্তিত্ব পুনর্জীবিত ও পুনর্নবায়িত হয়ে থাকে। রাবেলের রচনায় এটাই ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে আমরাও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্য যখন স্পর্শভীরু দূরত্বে গিয়ে কোলাহল-মুখর জনারণ্য সম্পর্কে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, কার্নিভালের উপাদান সব নিষেধের গণ্ডি ভেঙে দেয়। হাটে-বাজারে, জনারণ্যে যেসব ভাষা ও ভঙ্গি প্রচলিত, তাদের স্বচ্ছন্দে বয়ানে নিয়ে আসে। উচ্চসংস্কৃতির অহংকার ও শুচিতাবোধ চূর্ণ করে যেন পাতাল থেকে তুলে আনে লোকায়ত জীবনের সুপ্ত প্রস্রবণ। অপরিচিতকে পরিচিত করার ফলে প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গের মধ্যে অজস্র বিনিময় ও বিকল্পায়ন যুগপৎ সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসগুলির মধ্যে অন্তর্ঘাত করে নানা ধরনের প্রতিন্যাস। পুরোনো আকরণ এমন ভাবে বিনির্মিত হয়ে যায় যে পাঠকৃতির বহির্বৃত ঐক্য ধ্বস্ত হয়ে পড়ে। আবার পরক্ষণেই জেগে ওঠে অভিনব পুনর্নির্মাণের সম্ভাবনা। ইতিহাসকে যারা ভয়াবহ ভাবে খণ্ডিত করতে চাইছিল, তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করে কোনো জনগোষ্ঠীর সার্বিক ইতিহাসের অসামান্য ব্যাপ্তি ও গভীরতা ব্যক্ত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কার্নিভালের হাসি ও শ্লেষ অভাবনীয় তাৎপর্যের দ্যোতনা বয়ে আনে। সরকারি অবস্থানের উদ্ধত একমাত্রিকতা ও সীমাবদ্ধতা জনিত নিরানন্দ পরিসর কার্নিভালের ধারাবাহিক উপস্থিতিতে কেটে যেতে থাকে। সুতরাং একটু আগে যাকে অবনমন বলেছি, তা আসলে প্রতীয়মান মাত্র; অমোঘ ও নিবিড় দ্বিবাচনিকতার সূত্রে জীবন পুনরাবিষ্কৃত হয় বলেই আমরা বরং লক্ষ করি ঊর্ধ্বায়নের প্রক্রিয়া! তবে তাকে অনুভব করতে হয় কার্নিভালের দ্বিবাচনিক উদ্ভাসনের সূত্রে। সরকারি অবস্থান যেহেতু চরিত্রগত ভাবে আধিপত্যবাদী, জগৎ ও জীবনের একবাচনিক আকল্প চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রবল উৎসাহী ও অনমনীয়। এর মোকাবিলা করায় লোকসমাজের উদ্যম এইজন্যে সাংস্কৃতিক রাজনীতির আওতায় পড়ে।

চার

ডস্টয়েভস্কির নন্দন সংক্রান্ত আলোচনায় বাখতিন দ্বিবাচনিকতার পরম্পরার উৎস খুঁজে পেয়েছেন সুদূর অতীতে, যখন লোকবৃত্ত থেকে স্বত-উৎসারিত শ্রুতি সাহিত্য আদিম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের অজস্র উপাদান বয়ে নিয়ে যেত মোহনার দিকে ধাবমান স্রোতধারাকে পুষ্ট ও ঋদ্ধ করার জন্যে। তিনি লক্ষ করেছেন, সক্রেটিসের দ্বিরালাপমূলক প্রতিবেদনে এই প্রক্রিয়ার আদি সংরূপ পাওয়া যাচ্ছে। লোকায়ত কার্নিভাল দ্যোতক বিতর্ক থেকে সক্রেটিস তাঁর দ্বিরালাপ গড়ে তোলার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বাখতিনের মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ : 'Folk-carnival debates between life and death, darkness and light, winter and summer etc. permeated with the pathos and change and the joyful relativity of all things, debates which did not permit thought to stop and congeal in an one-sided seriousness or in a stupid fetish for definition or singleness of meaning—all this lay at the base of

the original core of the genre'. (১৯৮৭ : ১৩২)। এই বক্তব্য অন্তর্বৃত দার্শনিকতা ও তাৎপর্যের অনেকান্তিকতার ওপর উদ্‌ভাসনী আলো নিক্ষেপ করে। বহুস্বরিক উপন্যাসের 'কার্নিভাল' শিকড় সম্পর্কিত তাঁর আলোচনায় প্রকাশ-মাধ্যমের ঐ মৌল কেন্দ্রের ভিত্তি সম্পর্কিত ধারণা বিশদ করা হয়েছে। বাখতিন প্রাগুক্ত মন্তব্যে আরও জানিয়েছেন, 'This distinguishes the Socratic dialogue from the purely rhetorical dialogue as well as from tragic dialogue.... The Socratic discovery of the dialogic nature of thought, of truth itself, presumes a carnivalistic familiarization of attitudes toward the object of thought itself, however lofty and important, and toward truth itself.' (তদেব)। এই যে বলা হলো চিন্তার উদ্দিষ্টের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কার্নিভালসুলভ পরিচিতীকরণ—তাতে আসলে আরোপিত আভিজাত্যের প্রত্যাখ্যান ও প্রতিষেধ বোঝানো হলো। শেষ পর্যন্ত মূল প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে, সত্য কী এবং সত্যে পৌঁছানোর পথ-ই বা কী!

সত্য-সম্পর্কিত মানুষের চিন্তা এবং সত্য সন্ধানের পদ্ধতি স্বভাবে দ্বিবাচনিক—এই কেন্দ্রীয় উপলব্ধির সূচনা করেছিলেন সক্রেটিস, বাখতিন তা লক্ষ করেছেন। সক্রেটিসের ভাবনাবিশ্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সত্য সন্ধানের প্রকরণ সরকারি একবাচনিকতার প্রতিস্পর্ধী। নির্দিষ্ট কোনো সত্যের উপর নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির দখলদারি অগ্রাহ্য করে সক্রেটিস জানিয়েছিলেন, কোনো ব্যক্তি-মানুষের মস্তিষ্কে সত্য জন্ম নেয় না কিংবা তাকে সেখানে খুঁজেও পাওয়া যায় না। তাঁর মতে 'it is born between people collectively searching for truth, in the process of their dialogic interaction.' (তদেব : ১১০)। সত্যের সামূহিক সন্ধান যেহেতু মূর্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সম্ভব, লোকায়ত জীবনের অনভিজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় উদ্ভূত হতে পারে অনেকার্থ-দ্যোতনার প্রক্রিয়া। জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভট উপাদান থাকতে পারে, তা আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি। ঐসব উপাদানের অতিব্যক্ত শারীরিক অনুষঙ্গ ও আতিশয্য থাকা সত্ত্বেও এদের অপরিহার্য বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই জগতের পদে পদে দ্বৈততা ও দ্বিচারিতা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে আত্মবিদারক শ্লেষ ও বলিষ্ঠ পরিহাস। সর্বব্যাপ্ত উন্মুক্ততায় সবই মানিয়ে যায় কেননা এদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে অকৃত্রিমতায় ও সাবলীলতায়। বস্তুত কার্নিভালের প্রধানতম শক্তি এখানেই যে, তা হলো 'a site in which multiple cultural forms combine' (ডেন্‌টিথ : ১৯৯৫ : ৭০)। এই স্থিতিস্থাপকতা একবাচনিক সরকারি প্রতিবেদনে অকল্পনীয়।

বাখতিন যে কার্নিভালের হাসিকে পুনর্জীবন দানে সক্ষম ইতিবাচক শক্তি হিসেবে ভেবেছিলেন, তার যাথার্থ্য আমাদের পাঠঅভিজ্ঞতা দিয়ে সমর্থন করা সম্ভব। বাখতিনের রাবেলে পাঠ আমাদের প্রচুর ব্যঞ্জনা-গর্ভ চিন্তাসূত্র উপহার দিয়েছে। আপাতত নতুন দৃষ্টান্ত আহরণ না-করে আমরা লক্ষ করতে পারি, কোনো পাঠকৃতির অন্তর্বয়নে নিহিত অন্যোন্য-সম্পর্কগুলি বৌদ্ধিক আভিজাত্য দিয়ে পুরোপুরি নির্মিত হয় না। প্রতিটি পাঠকৃতিকে ঘিরে রাখে যে দৃশ্য ও অদৃশ্য সাংস্কৃতিক বলয়, তার লোকায়ত উৎস খুঁজে নিতে পারলে বুঝব, কার্নিভালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ পাঠকৃতির কতটা গভীরে সঞ্চারিত হতে পারে। এই বিচ্ছুরণ আসলে বয়ানের 'historical density'-এর প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য বাখতিন-বিশেষজ্ঞদের নধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। একটু আগে যাকে কার্নিভালের বিচ্ছুরণ বলেছি, তার পরিধি কতদূর ব্যপ্ত কিংবা কর্তৃত্ববাদ-বিরোধিতাকে কী কী ভাবে ব্যাখ্যাকরা সম্ভব, এ বিষয়ে বিতর্কের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রাবেলে-পাঠ কি আসলে স্ট্যালিনের জমানায় সরকারি মতবাদের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ব্যবহৃত প্রত্যাঘাত? কার্নিভালের হাস্য পরিহাস যেভাবে চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্দেরা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, তেমনি বাখতিনও কি মধ্যযুগীয় সাহিত্যপাঠের অজুহাতে সমসাময়িক স্ট্যালিন পন্থী প্রাতিষ্ঠানিকতাকে বিদ্রূপে বিদ্ধকরার অস্ত্র তুলে দিতে চাইছিলেন সাধারণ মানুষের হাতে? এইসব প্রশ্নও স্পষ্টত সমসাময়িক ইতিহাস নিষ্পন্ন। এটা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে। প্রতীচ্য দুনিয়ায় বাখতিন যাদের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছেন, তারা সাধারণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী এবং মার্ক্সবাদেরও প্রতিপক্ষ। যেহেতু ইংরেজি-জানা তৃতীয় বিশ্বের কাছে বাখতিন এদের দ্বারাই পরিবেশিত হয়েছেন, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর চিন্তাবিশ্বের ভাষ্যসমূহ গ্রহণ করতে হয় আমাদের। কেননা এইসব ভাষ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদীদের রণকৌশল সম্পৃক্ত সত্যের রাজনীতি।

উমবের্তো একো ভিন্ন-একটি প্রসঙ্গে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন অতিভাষ্যের বিপদ সম্পর্কে, সেকথা মনে পড়ে। লোকায়তের প্রতিস্পর্ধাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করি, এরকম মনে হয় না যে বাখতিন সত্য উচ্চারণের জন্যে কোনো মধ্যযুগীয় সাহিত্যিককে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন। সক্রেটিসের দ্বিরালাপ মূলক বাচনিক পদ্ধতিকে যিনি পুনরাবিষ্কার করে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদকেই আরও একটু বিকশিত ও প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, তিনি কার্নিভালকেও প্রান্তিকায়িত লোকসমাজের নান্দনিক প্রতিরোধমূলক পুনর্নির্মাণের কৃৎকৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অতএব বাখতিনের রাবেলে বিষয়ক বইটিকে পড়তে হবে 'As a hidden polemic against the regime's cultural politics' —সাইমন ডেনটিথের এই মন্তব্যে আমাদের সায় নেই। কিংবা হাসি ও কৌতুককর রচনা সামাজিক দ্বন্দ্ব ও আততির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া রোধ করার একটি কৌশলমাত্র, বলশেভিক বুদ্ধিজীবী লুনাচারস্কির এই ব্যাখ্যা বাখতিনকে কার্নিভালের ধারণা তৈরি করতে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল— এই মন্তব্যও সঠিক মনে হয় না। কেননা একটু আগেই আমরা লক্ষ করেছি, গ্রিক শ্রুতিসাহিত্য যখন লিখিত সাহিত্যে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সেইসময়কার প্রান্তিক লোকসমাজের সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ থেকে সক্রেটিসর দ্বিরালাপ গড়ে উঠেছিল। সঞ্চরমান লোকশ্রুতির বিপুল সমৃদ্ধি থেকে কীভাবে যুগে যুগে গড়ে ওঠে উচ্চবর্গীয় সাহিত্যিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন ধারা— তা বাখতিনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রাবেলে-পাঠ এই প্রক্রিয়ারই ফসল।

ব্যক্তিগত জীবনে যাই ঘটে থাকুক, বাখতিনের মতো মৌলিক চিন্তাবিদ কখনও বিরূপ অভিজ্ঞতার বৌদ্ধিক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে নিজের মননবিশ্বকে সংগঠিত করেন না। অতএব সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিরক্ত হয়ে 'inplict re-joinder' (তদেব) হিসেবে কার্নিভাল প্রণোদিত উদ্ভট বাস্তবতাবাদের বয়ান তৈরি করেছিলেন— এই অভিমত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। তাঁর চিন্তাজীবনের প্রধানতম আধেয় ও অবলম্বন যে দ্বিবাচনিকতার দর্শন, তারই প্রেরণায় কর্তৃত্ববাদ ও একবাচনিকতার যথার্থ

বিকল্প হিসেবে তিনি অভিন্ন চিন্তাবীজের প্রস্তাবনা করেছিলেন। মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নয়, তাকে আরও সংহত পরিশীলিত ও পূর্ণতর করে তোলার জন্যে বাখতিন লোকসমাজের অনাবিল জীবনপ্রবাহে নিহিত প্রতিরোধ ও ৰিকল্পয়ানের অমিত শক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রান্তিকায়িত অপর পরিসরের সমবায়ী উপস্থিতিকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ার জন্যেই সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তন হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের পর্যায়ে এই অপর পরিসর নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালিত করে কর্তৃত্ববাদের শেষ প্রচ্ছায়াও মুছে নেবে, এই ছিল ঈঙ্গিত। কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন ও রাষ্ট্রের সমীকরণ যদি সম্পন্ন না হয়, অপর পরিসরের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই হবে ইতিহাসের কাছে দায় পালন। কার্নিভালের হাসি-শ্লেষ-কৌতুকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শুদ্ধীকরণের নিষ্কর্ষই আজ লক্ষ করতে হবে আমাদের। তাই আবারও লিখছি, বাখতিনের মতো অনন্য মানুষ প্রচ্ছন্ন ভাবেও ব্যক্তিগত বৌদ্ধিক প্রতিশোধ স্পৃহা মেটানোর জন্যে কোনো কিছু করতে পারেন না। তাছাড়া তাঁর লিখনবিশ্ব কিংবা চিন্তাবিশ্বের সরলীকৃত ব্যাখ্যা বা তাদের সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত ধারণার নিরিখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অর্থ হলো বাখতিনের প্রতি চরম অবিচার।

পাঁচ

প্রতীচ্যের দুর্ধর্ষ পণ্ডিতেরা যেহেতু এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বৌদ্ধিক সেনাপতি, বাখতিনের চিন্তাপ্রণালী থেকে বৈপ্লবিক নিষ্কর্ষ মুছে নেওয়ার জন্যে তাঁদের আগ্রহ স্বাভাবিক। সমস্যা হলো, তাঁদের বিশ্লেষণের পেছনে যে সাংস্কৃতিক রাজনীতি রয়েছে—সে-বিষয়ে অভিনিবেশ না-দিয়ে অনেক প্রগতিপন্থী আলোচক (প্রতীচ্যে এবং এদেশে) বাখতিনকে খারিজ করতে চান। কার্নিভালের তত্ত্ববীজ যেহেতু প্রান্তিকায়িত বর্গের সাহসী প্রত্যাঘাত বলে বিবেচিত হতে পারে, এর অপব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। বাখতিন কেন লোকসমাজকে জগৎসম্পর্কিত দ্বিতীয় (অর্থাৎ বিকল্প) সত্যের ভাণ্ডারী বলেছেন, এর তাৎপর্য গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। হলক্যুইস্টের মতো প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ কেন বাখতিনের কার্নিভাল সম্পর্কিত বিশ্লেষণে 'a strong element of idealization, even utopian visionariness' (১৯৮৪ : ৩১০) দেখতে পান—তা বোঝা খুব একটা শক্ত নয়। যিনি সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দ্বান্দ্বিক সংগ্রামকে তাচ্ছিল্যসূচক চিহ্ন (ঊর্ধ্বকমাযুক্ত struggle : তদেব) দিয়ে উপস্থাপিত করেন, লোকসমাজের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক বয়ানকে নস্যাৎ করার জন্যে তিনি বাখতিনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আদর্শায়িত বলবেন—এটাই স্বাভাবিক। তাঁর মতে, 'Bakhtin consistently idealises the folk as an untamable, rebellious, and regenerative force that will destroy the status quo, but from the ashes will rise newer and finer worlds.' (তদেব : ৫১০-৫১১), এমন যদি ভেবে থাকেন বাখতিন, তাকে বিশেষজ্ঞ 'আদর্শায়ন' বলে লঘু করছেন কেন? স্থিতাবস্থা যেহেতু চিরকাল আধিপত্যবাদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে সহায়ক, কার্নিভাল তো সেখানেই আঘাত করবে। আর এটাই তার 'রাজনৈতিক' অন্তঃসার। বহু শতাব্দীব্যাপী শোষণ রুশ সমাজকে

কতটা নিরেট ভাবে একবাচনিক করে তুলেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯১৭ সালে শুরু হয়েছিল চির-উপেক্ষিত অন্তেবাসী জনের ক্রমিক উর্ধ্বায়ন। কার্নিভাল এই দুরূহ প্রক্রিয়ার ইতিহাস-নির্দিষ্ট তত্ত্ববীজ : এই সত্য অস্বীকার করার অর্থ হলো বিপ্লব-পূর্ববর্তী আধিপত্যবাদী শক্তির সমর্থন-যোগানো যুক্তিশৃঙ্খলা তৈরি করা।

রাবেলেকে উপলক্ষ করে পরিবর্তনের ভাবাদর্শ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রতি বাখতিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সূত্রে পাঠকৃতি আর বাচনও যে বিশেষ মনোযোগের আকর, তা তাঁর বয়ান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত রাবেলে-পাঠে কার্নিভাল ও উদ্ভট বাস্তবতাবাদ দুটি গৌণ পাঠ হিসেবে গণ্য। কার্নিভাল হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শেষোক্তটি হলো সাহিত্যিক প্রকরণ। প্রতিবেদনে সামাজিক ও সাহিত্যিক নিষ্কর্ষ ও উপাদান কীভাবে মিথষ্ক্রিয়ার আকর, বাখতিন তা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে সামূহিক ভূমিকায় নিষ্পন্ন লোকায়ত জীবন-চর্যা ও সক্রিয়তা এবং শারীরিক প্রকরণগুলির অর্থবহত্বও বিশ্লেষণ করেছেন। উচ্চ সংস্কৃতি ও নিম্ন সংস্কৃতির চিরাগত ব্যবধানকে সরকারি ও বেসরকারি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বয়ানের সূত্রে ব্যাখ্যা করে প্রতাপের পীড়ন ও অবদমনকে তিনি বাচনের সোচ্চার ও নিরুচ্চার, উদ্ভাসিত ও নিরালোক পরিসরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন। কর্তৃত্ববাদের দ্বারা অনুমোদিত ভাষা, সত্য, নৈতিকতা ও উপস্থাপনা যদিও ধারাবাহিক ভাবে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, বাখতিন দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিটি স্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে কর্তৃত্ববাদের প্রতিস্পর্ধী হাসি ও কৌতুক—'A boundless world of humourous forms' (১৯৮৪ : ১১)। একমাত্রিক, একরৈখিক ও একবাচনিক রুদ্ধ জগতের সর্বাত্মক আরোপের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদ মূলত প্রান্তিক সমাজ থেকেই উঠে আসে। এটাই মানুষের ইতিহাস, তার সংস্কৃতির ইতিহাস।

বাখতিন জানিয়েছেন : 'every age has its own norms of official speech and propriety. And every age has its own type of words and expressions that are given as a signal to speak freely, to call things by their own means, without any mental restrictions and euphemism.' (তদেব : ১৮৮)। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে বাখতিন রাবেলেকে উপলক্ষ করে মূলত সমসাময়িক রাশিয়া সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেছিলেন। হোমার-ভার্জিল-দান্তে-শেক্সপীয়র-গ্যয়েঠে এবং এঁদের মতো অন্য সব কালোত্তর স্রষ্টার সমকালে সরকারি বয়ান ও বিধিবিন্যাস অবশ্যই প্রকট ছিল। কিন্তু প্রতিভার অর্থই হলো সমস্ত রুদ্ধ পরিসরের বিনির্মাণ করে মুক্ত বাচনের প্রতীতিতে পৌঁছানোর ক্ষমতা। এঁদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে সমকালীন জনসমাজের সামূহিক বাচন থেকে সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, সমান্তরালভাবে উপস্থিত অপর পরিসরের উপকরণ দিয়ে তাঁরা প্রচলিত সরকারি বয়ানের রুদ্ধতাকে প্রতিহতও করেছেন। নইলে চিন্তা ও অনুভূতির নবীন স্থাপত্য গড়ে উঠতে পারত না।

১৯১৭-এর পূর্ববর্তী রাশিয়ার সাহিত্যে পুশকিন-টলস্টয়-ডস্টয়েভস্কি-গোগোল-টুর্গেনিভ প্রমুখ স্রষ্টা জারতন্ত্রের সরকারি বয়ানকে প্রতিহত করেই নিজেদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গোর্কি কি তখনকার সরকারি বয়ানকে অন্ধভাবে অনুগত্য দেখিয়ে গেছেন? আধিপত্যবাদের কাছে সমর্পিত সাহিত্য-

সমালোচকেরা যা-ই বলুন না কেন, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় যে-ভাবাদর্শ বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে—সর্বাত্মক মুক্তি-ই তার অন্বিষ্ট। ইতিহাসের চলমান ধারাকে যারা রচনা করে আবার নিজেরাই ঐ ধারা দ্বারা রচিত হয়—সেই প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গজনের নিত্যজায়মান প্রতিবেদন ভাবাদর্শকে কখনও রুদ্ধ হতে দেয় না। প্রতিভাবান স্রষ্টারা এই প্রক্রিয়াকে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে অনুধাবন করেন বলেই সমসাময়িক সরকারি বয়ান তাদের চেতনাকে গ্রাস করতে না পারে না কখনও। কার্নিভালের সূক্ষ্ম ও নিবিড় উপস্থিতি তাদের সঞ্জীবিত রাখে। পুশকিন বা ডস্টয়েভস্কির ক্ষেত্রে তা যতটা সত্য, গোর্কি ও ব্রেখটের ক্ষেত্রে ততটাই সত্য। শুধু নিজস্ব সময়ের অভিঘাতে তাদের পথ পরস্পর-ভিন্ন।

বিভিন্ন উৎস-জাত প্রতিবেদনের মধ্যে যে-সব সীমান্ত সাধারণভাবে স্বীকৃত, কার্নিভাল তাদের মান্যতা দিতে অস্বীকার করে বলে সমাজের অবতল থেকে উঠে-আসা উপাদানের অভিঘাতে সেসব ক্রমাগত ভেঙে যায়। তত্ত্ববস্তু, অবভাস ও মূল্যমানের মধ্যে প্রচলিত অনড় সরকারি জলবিভাজন রেখা মুছে যায় ক্রমশ। বিভিন্ন শব্দের আন্তঃসম্পর্ক ও বাচনিক অভিব্যক্তির মধ্যে নতুন ধরনের দোলাচল দেখা দেয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক জগতের হওয়া ও হয়ে ওঠা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা, শ্লেষ ও বিষাদের মতো আপাত-বিপরীত প্রবণতাকেও অন্যোন্য-সম্পৃক্ত করে তোলে। ফলে পাঠকৃতির আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা নতুনভাবে নির্ধারিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সরকারি বয়ানের রক্ষণশীলতায় যেসব অপূর্ণতা ও রুদ্ধতা অনাবিষ্কৃত ছিল, সেসব উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। আর, পাঠকৃতির মধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব মুক্ত পরিসরের অস্তিত্ব প্রকট হতে শুরু করে। আভিজাত্য ও প্রতাপের মায়ায় মুগ্ধজনদের কাছে এই সত্য উন্মোচিত হয় যে—'all peoples...have enormous spheres of speech that had not been made public and are non-existent from the point of view of literary written language.' (তদেব : ৪২১)। লিখিত ভাষার যে মান্যতাপ্রাপ্ত সংরূপকে 'সাহিত্যিক' বলা হয়ে থাকে, সেই সাহিত্যিকতার স্বেচ্ছাবৃত নির্মিতি পুনরাবৃত্ত অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ফলে কখন তা একবাচনিক মিথ্যার স্থাপত্য হয়ে উঠেছে, আমরা লক্ষ্যই করি না। বরং তার অভিজাত অবস্থান থেকে অজ্ঞাত জীবনের বিপুল পরিধিকে মনে করি অস্তিত্বহীন। যাবতীয় অপর পরিসর ঐ সাহিত্যিকতার কাছে পুরোপুরি অবান্তর হয়ে পড়ে।

তাই সেই পরিসর থেকে যখন আশ্চর্য বৈচিত্র্যযুক্ত বাচনের উপস্থিতি অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হয়, সযত্নরচিত সুবিধাজনক সামঞ্জস্যের বোধ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। আরোপিত গাম্ভীর্যের প্রতিষেধক হিসেবে যেন হাসি-পরিহাস-শ্লেষ-উদ্ভট আতিশয্য-প্রবণ গণআঙ্গিক ব্যবহৃত হয়। কার্নিভাল-চেতনাই এদের তাৎপর্যের নিয়ামক! এদের মধ্যে কোনো আনুগত্য বা চাহিদা থাকে না। অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবন-প্রণালীর স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষ-পুলক থেকে এদের উদ্ভব বলে গণমানসের মুক্ত পরিসরে যেন 'আমরা সবাই রাজা'। প্রত্যেকেই কার্নিভালের নির্মাতা, আসলে প্রত্যেকেই স্বয়ং কার্নিভাল। যতক্ষণ কার্নিভাল আছে, এর বাইরে অন্য কোনো জীবন থাকে না। কার্নিভালের সময়ে ও পরিসরে জীবন নিজের নিয়ম নিজেই তৈরি করে। সেই নিয়ম স্বাধীনতার, মুক্তির, বাধাবন্ধনহীনতার। তাই বাখতিন বলেছেন : 'Carnival is not a spectacle seen by the people; they live in it,

and every one participates because its very idea embraces all the people.' (১৯৮৪ : ৩০০)। অর্থাৎ প্রান্তিক পৌরসমাজে কার্নিভাল-চেতনা সর্বত্র ও সর্বদা উপস্থিত। কোনো-একটি নির্দিষ্ট উৎসবে তাই তা সম্পৃক্ত নয়।

বিস্ময়বোধ সৃষ্টির নিত্যনবায়মান ক্ষমতা কার্নিভালের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিস্ময়ের প্রবল শক্তিতে তা আস্তিত্বিক অনেকার্থদ্যোতনার বার্তা বয়ে আনে। সরকারি বয়ানে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই। চিরন্তন, অবিচল, চরম, অপরিবর্তনীয় প্রভৃতি বর্গের মধ্যে লোকমন শুধু পীড়নের অজুহাত খুঁজে পায়। তাই কার্নিভালের হাসি দিয়ে এইসব ধারণায় হস্তক্ষেপ করে পরিবর্তন-পুনর্নবায়ন-মুক্তি-চূড়ান্ততাহীনতার আনন্দকে চিন্তাপ্রণালীতে ও প্রতিবেদনে প্রতিস্থাপিত করে। রাবেলের ভাববিশ্ব থেকে সূত্র নিয়ে বাখতিন কার্নিভালের যে-সমস্ত অনুষঙ্গকে নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের মধ্যে সময়ের প্রকল্প সম্পর্কিত ধারণা লক্ষ করার মতো। সময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ আধিপত্য-প্রবণ ভাবাদর্শসমূহ যেসব অনমনীয়, নিয়মতান্ত্রিক ও রুদ্ধ পরিসর ঐতিহাসিক আকল্পদের আরোপ করে থাকে—কার্নিভালের সময়-ভাবনা তা থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এতে নেতিবাচক পলায়নমনস্কতা নিহিত রয়েছে। কেননা কার্নিভাল অনাবিল ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে সময়কে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় এবং ইতিহাসকেও মুক্তি দেয় আরোপিত আকরণের প্রতি অনুগত্য থেকে।

বাখতিনের কার্নিভাল-মূলক ভাবনা নিঃসন্দেহে আমাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিবেদনের নতুন পাঠে প্রাণিত করে। সার্থক উপস্থাপনায় কীভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে বহুরৈখিকতা ও অজস্র অন্তর্বয়ন, তা আবিষ্কারের নতুন নতুন পথ আমরা খুঁজে নিতে পারি। শুধু সরকারি ও বেসরকারি ভাবাদর্শের গ্রন্থনাই নয়, আমরা লক্ষ করতে শিখি বাচনের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দ্বিরালাপের উৎস ও বিস্তারের পটভূমিও। নানা ধরনের আততিপূর্ণ উপন্যাসের বয়ানেও খুঁজতে শিখি কার্নিভালের লোকায়তদ্যুতি, শ্লেষ-পরিহাসের প্রতিভাবাদর্শ ও প্রতিসন্দর্ভের প্রত্যাঘাত। আরোপিত আভিজাত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শিখি আমরা, প্রতাপ-পীড়ন-কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যে অনুভব করি লোকায়ত পৌরুষের উপস্থিতি। অতি সাম্প্রতিক আধুনিকোত্তর পৃথিবীতে প্রতীত বাস্তবতা ও অধিপরিসরের গ্রন্থনা যখন এককেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার পরাক্রান্ত সাংস্কৃতিক রাজনীতিকে অনতিক্রম্য করে তুলেছে—অতিপরিশীলিত বিজ্ঞাপনের মাদকে প্রতিষ্ঠিত সত্যের একমাত্র দখলদারদের ('sole possessor of truth') প্রতিস্পর্ধা জানাতে পারে বাখতিনের কার্নিভাল-তত্ত্ব। শুধু তত্ত্ব হিসেবে নয়, প্রায়োগিক সামর্থ্যের জোরে। বিশ শতকের একজন বিখ্যাত সমাজনির্মাতা শতফুল বিকশিত হওয়ার সামূহিক স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই মানুষটি আরো বলেছিলেন, ক্ষমতার সদরদপ্তরে কামান দাগতে হবে। কার্নিভাল-ভাবনায় তাঁর এই দুটি কথাই প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান দুনিয়ায় প্রতাপ-মদমত্তদের অতিকেন্দ্রিকতার পর্যায়েও অসংখ্য জনগোষ্ঠীর সমান্তরাল পুষ্পায়নে এবং প্রান্তিকায়ত পরিসর থেকে তুলে-আনা নিরন্তর প্রত্যাঘাতের শক্তিতে সার্থক হতে পারে কার্নিভালের সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। বলা ভালো, হতে পারে নয়, হয়ে চলেছে।

বাখতিন, এসময়ে

বহু শতাব্দী ধরে যিনি মানুষের চিন্তাবিশ্বকে আলোকিত করবেন, তাঁর চূড়ান্ত-বিন্দুহীন যাত্রায় এক শতাব্দী মাত্র পূর্ণ হলো চোদ্দ বছর আগে। প্রতীচ্যের তত্ত্বভাবনা, বিশেষত উপন্যাস-চিন্তা, গত তিন দশকে নিরবচ্ছিন্ন উন্মোচনের সূত্রে কেবলই ভাবনার নতুন নতুন অণুবিশ্ব নির্মাণ করে চলেছে। আমাদের পাঠাভ্যাস ও চিন্তাপদ্ধতির সংস্কার এত দৃঢ়প্রোথিত যে একে ধারণ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে হলে চাই আত্মবিনির্মাণের স্পৃহা। কিন্তু হায়, আমাদের বৌদ্ধিকতার অহংকার এবং নিজস্ব অবস্থানের অনমনীয়তা বাস্তিল দুর্গের চেয়েও বেশি দুর্ভেদ্য। তার ওপর সাম্প্রতিক কালে বিশ্বাসহীনতার চোরাবালি এত সর্বগ্রাসী যে ইতিহাস-ভাবাদর্শ-তাৎপর্য প্রভৃতিও প্রয়োগ-শূন্য তত্ত্ববীজ হিসেবে ধিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত। ইদানীং বিকেন্দ্রায়নের নামে চরম নৈরাজ্য আমাদের এত বেশি অধিকার করে রেখেছে যে কোনো প্রতিবেদনের স্বত-উৎসারিত যুক্তি-শৃঙ্খলায় আমরা কিছুতেই আস্থা রাখতে পারি না। নিজেদের অবিশ্বাস-দীর্ণ অস্তিত্ব থেকে সংক্রামিত নিরলম্বতার পাণ্ডুরোগ মহামারীর মতো ছড়িয়ে দিচ্ছি চিন্তাবিশ্বের নানা অভিব্যক্তিতে। বিশেষত আধুনিকোত্তরবাদের জটিল সন্দর্ভগুলির আংশিক ও অযথার্থ গ্রহণ কেবলই বিড়ম্বিত করছে আমাদের। তাই বাখতিনের অনন্যতাকে ঈপ্সিত মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারছি না সম্ভবত। চিন্তার ইতিহাসের ওপর যেহেতু নিজেদের পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রচ্যুত অবস্থানের ছায়া চাপিয়ে দিচ্ছি, বাখতিনের ভাববিশ্ব থেকে অর্জিত সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্তও করতে পারছি না।

বিশ শতকের শেষে আধুনিকোত্তরবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ধত যুগলবন্দি জীবন থেকে ক্রমাগত মানবিক নির্যাস শুষে নিয়েছে। পরিসর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে গভীরতা আর সময় থেকে ব্যাপ্তির বোধ। তাহলে প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা বা সম্বোধ্যমানতাকে কীভাবে জাগিয়ে রাখব আজ? কীভাবেই বা বাখতিনের চিন্তাবীজ পুষ্পিত হবে আমাদের অনিকেত এবং পারম্পর্যহীন অবস্থানে? পরিবর্তনের স্রোতে আমরা এখন দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ভেসে যাচ্ছি। বাখতিনের জীবনেও মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটেছিল, ইতিহাসের কত বিচিত্র পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল—ইতিমধ্যে তা জেনেছি আমরা। তাঁর জীবন ও মননের নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপের গ্রন্থনায় ইতিহাসের বহুস্বরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাখতিন নিজে যাকে মহাসময় (Great time) বলেছেন, তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল তারই মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা আধুনিকোত্তর ভাবনার নিরিখে ইতিহাসকে মহাসন্দর্ভ বলে প্রত্যাখ্যান করতে শিখেছি, বাখতিনের জীবন-নিষ্পন্ন প্রত্যয় কি আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে! বাখতিন চিন্তা-প্রস্থানের আলোচনায় অতিউদ্ভাসিত প্রথম বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহ যেহেতু সবচেয়ে বেশি, তাদের আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির অভিপ্রায় ও রণকৌশল কি আদৌ ভুলে থাকা সম্ভব? তৃতীয় বিশ্বের জিজ্ঞাসুরা কীভাবে বিশ্বাস করবেন যে প্রথম বিশ্বের বাখতিন-ভাষ্য—'প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা' কিংবা 'সত্তা মানে সমান্তরালতার বোধ' বা অংশীদার হওয়ার প্রত্যয়'— এইসব মহাবাক্য আন্তরিকভাবে স্বীকৃত হবে? কার্নিভাল তত্ত্বে অন্তর্বৃত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নির্যাসকে কিংবা বাখতিনীয় তাৎপর্যতত্ত্বে

সংগ্রামের অপরিহার্যতাকে কীভাবে গ্রহণ করতে পারে একবাচনিক আভিজাত্যে অভ্যস্ত জনেরা?

কোনো তত্ত্বপ্রস্থান বা সেই তত্ত্বপ্রস্থানের পাঠ ও বিশ্লেষণ ইতিহাসের বাইরে যেতে পারে না। ইতিহাসকে অস্বীকার করলে গোলকধাঁধা তৈরি হয়ে মাত্র। অন্যত্র লিখেছি, দ্বিবাচনিকতা নিছক নান্দনিক কৃৎকৌশল নয়; তা জীবনদর্শনের সারাৎসার। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে তাকে উপেক্ষা কিংবা কুঠারাঘাত করলে নিছক বৌদ্ধিক চর্চায় তা আলোচনার অধিকার থাকে না। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পর্যায়ে যাবতীয় অপর পরিসরের স্বাতন্ত্র্য, সার্বভৌমত্ব ও সমান্তরাল অবস্থানের অধিকার যারা ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছে এবং নিজেদের প্রয়োজন-মাফিক সত্য উৎপাদন করছে—তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা দ্বিবাচনিক বিশ্ববীক্ষাকে কেনই বা সমর্থন করবেন? তাদের 'নিরপেক্ষ' সত্য সন্ধান আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে—তা সহজেই অনুমেয়। অন্তত যে-পৃথিবীতে ইরাক-বসনিয়া-কসভো-সোমালিয়া-আফগানিস্থানের ঘটনাবলি সম্ভব, সেই পৃথিবীর উন্নততম তথ্য-প্রযুক্তির সমর্থনধন্য বৌদ্ধিকবর্গ বাখতিনের ভ্রান্ত পাঠই করতে পারেন শুধু।

বিখ্যাত বাখতিন-আলোচক ক্যারিল এমার্সন The first hundred years of Mikhail Bakhtin বইয়ের প্রাক্‌কথনে লিখেছেন : 'The Bakhtin industry has known its share of gossip, turfwars, unsubstantiated rumour, dialogue in bad faith, nostalgic fantasy and willful misreadings.' (১৯৯৭ : দশ)। এই যে ইচ্ছাকৃত ভ্রান্ত পাঠের কথা বলা হলো, তাতে তৃতীয় বিশ্বের যেসব ভাষ্যকারেরা জড়িয়ে পড়েন, এর মূলে রয়েছে প্রথম বিশ্বের বৌদ্ধিক বর্গের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য ও অবিশ্লেষণাত্মক পাঠের আভাস। স্বয়ং এমার্সনের বক্তব্য সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। আমরা যারা তুলনামূলক ভাবে ছোট সময়ের অধিবাসী, জীবনবৃত্তের সীমাবদ্ধতা বা অভিজ্ঞতার অতিসংলগ্নতা সত্ত্বেও খোলা মনে চিন্তাবিশ্বের মুখোমুখি হতে আমাদের কোনো বাধা হওয়ার কথা নয়। এমার্সন-কথিত মিথ্যা বিশ্বাসের চাপ অবশ্যই অনস্বীকার্য বাস্তব। তবু তাৎপর্য অর্জনের সংগ্রামী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতেই হয়। নব্বই-এর দশকে প্রতিবিপ্লব-পরবর্তী খণ্ডীকৃত রাশিয়ার তথাকথিত উত্তর-সমাজতন্ত্রী পর্যায়ে বাখতিন কীভাবে পুনঃপঠিত হচ্ছেন, এ সম্পর্কে এমার্সন তথ্য-সমৃদ্ধ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছে যে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ তো নয়ই, কোনো রাজনীতিও তাঁর চিন্তাজীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারেনি। নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসকের পীড়ন সত্ত্বেও তিনি কীভাবে রয়ে গেলেন চিরমুক্ত, গৃহহীন ও অসম্পৃক্ত—তা অনুসন্ধান করে আলোচকেরা বাখতিন সম্পর্কে কার্যত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। অথচ তাঁরই বিখ্যাত তত্ত্ববীজ অনুযায়ী ('জীবন ও সাহিত্যের প্রতিবেদন কখনও চূড়ান্ত করা যায় না') আলোচকদের ঐ প্রবণতা সমর্থন করা যায় না।

তাঁর মধ্যে কেউ কেউ দেখতে পেয়েছেন সাম্যবাদ-উত্তর আধুনিকোত্তর চিন্তাধারার পূর্বাভাস। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অবস্থান খোঁজা হচ্ছে 'Somewhere between a classic and cliche' (তদেব : ৩)। বিশেষত আধুনিকোত্তর ভাবনার প্রেক্ষিতে বাখতিনের চিন্তাবিশ্বের বিবর্তন ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও লক্ষ করা যায়। তবু রুশ ভাষ্যকার ভি. এল. মাখলিন-এর মতে বাখতিনকে বুঝতে হবে নেতি নেতি করে। তাঁকে বলা যায় 'non-Marxist, nonformalist, Non Freudian, non-structuralist, nonexistentialist, noncollectivist,

nonutopian, nontheologian, in a word a non-modernist' (তদেব : ৪) তাত্ত্বিক। আসলে এত দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করার পরেও বাখতিন রয়ে গেছেন রহস্যময়, এমনকী কিছুটা প্রহেলিকাও। তাঁর তত্ত্ববিশ্ব কতটা স্ববিরোধী কিংবা অসম্পূর্ণ—এই আলোচনাও কম হয়নি। বিশেষত সাম্প্রতিক বঙ্গীয় আলোচকদের একটা অংশ এ-বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী। প্রতিবেদনের মধ্যে অন্ধবিন্দু থাকাটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। স্বয়ং বাখতিন সার্থক বয়ানকে মুক্ত পরিসরের দ্যোতক বলে ভাবতেন। নিরন্তর প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে তাঁর কাছে শেষ কথা বলে কিছু ছিল না।

দুই

সুতরাং বাখতিন কী করতে পারেননি, সেই অপূর্ণতার ওপর বেশি মনোযোগ না দিয়ে আমরা তাঁর দ্রষ্টাচক্ষুর ব্যাপ্তি ও গভীরতার পরিমাপ করতে পারি। লক্ষ করতে পারি, কীভাবে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন স্বর ও স্বরান্তরের অজস্র সম্ভাবনা, খুঁজে পেয়েছিলেন বস্তু ও ক্রিয়ার বিনির্মাণের তাগিদ। চিন্তার ঔচিত্য নয়, চিন্তার স্বভাবই অন্বিষ্ট ছিল তাঁর। কীভাবে ভাবনার সীমান্তগুলি অনবরত মুছে যাচ্ছে এবং তার ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের কূটাভাস—বাখতিন আমাদের সেদিকে মনোযোগী হতে প্রাণিত করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালির আস্তিত্বিক পরিসরে কীভাবে গৃহীত হচ্ছেন বাখতিন—তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা সহজ নয়। তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে প্রতীচ্যের ভাষ্যকারদের চোখ দিয়ে বাখতিনকে দেখার ফলে কিছু কিছু নেতিবাচক মনোভঙ্গি নিঃসন্দেহে তৈরি হয়েছে। এর সমাধান যদি করতে চাই, কর্তৃত্ববাদের কৃৎকৌশল থেকে তাৎপর্য সন্ধানের প্রক্রিয়াকে আগে মুক্ত করতে হবে। সারা জীবন ধরে যিনি বাচনবিশ্বের যোগ্যতা পরীক্ষা করে গেছেন, তাঁকে টুকরো করে দেখা চলে না কখনো। ভরসার কথা, কোনো কোনো বাঙালি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও আলোচক এবিষয়ে ক্রমশ অবহিত হয়ে উঠেছেন। এই উপলব্ধি উত্তরোত্তর গাঢ়তর হয়ে উঠছে যে এই জগৎ যতটা বাস্তব ততটাই রূপক। চিহ্নায়িত জগতে সত্যে পৌঁছানোর পথে সবচেয়ে বড়ো বিঘ্ন হলো প্রাতিষ্ঠানিকতা বা সরকারি বয়ানের রক্ষণশীলতা। বহুস্তরান্বিত পাঠকৃতিতে সমস্ত অন্তর্বয়ন প্রকাশ্য নয়, রয়েছে বহু গোপন বা অনতিগোপন গৌণ পাঠও। গত দশ বছরে বেশ কয়েকজন সমালোচক বাখতিন চর্চায় অংশগ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যাচ্ছে না যে তৃতীয় বিশ্বের অপর পরিসরের উপযোগী যথাপ্রাপ্ত স্থিতির গভীর তাৎপর্য বাঙালি ভাবুকেরা ঈপ্সিত মাত্রায় নিঙড়ে নিতে পেরেছেন। বাখতিনের যে-সমস্ত ভাববীজ বাঙালির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির জমিতে বহুধা-অঙ্কুরিত হতে পারত, তা হয়নি। তবে এটা ঠিক যে দেবেশ রায় প্রবর্তিত উপন্যাসতত্ত্বমূলক আলোচনার প্রভাব নবীন প্রজন্মের কয়েকজন প্রাবন্ধিকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে ব্যাপৃত হয়েছেন কয়েকজন উজ্জ্বল কথাকার। কিন্তু আবারও লিখছি, বাখতিনীয় দ্বিরালাপ থেকে যে নবায়মান প্রত্যুত্তরযোগ্যতার বহুমুখী কর্ষণ হতে পারত, তা এখনও অপেক্ষিত। তেমনই কার্নিভালের সাংস্কৃতিক রাজনীতির তাৎপর্য এবং সেই তাৎপর্যের বিস্ফোরক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সম্ভাবনা আমাদের অভিনিবেশ পায়নি। জীবন-জগৎ-সাহিত্যের প্রতিবেদন কীভাবে অনবরত পুনঃপাঠ করে যেতে হয়, সেই ভাবনার উদ্ভাসন আমাদের মানববিশ্বের প্রতীতিকেই সমৃদ্ধতর করতে পারত। বিশেষত ভারতীয়

চিন্তাকাশের শরিক হয়েও আমরা বাখতিনীয় ভাবকল্পকে আমাদের মানবিক মহাকাশে উত্তীর্ণ হওয়ার যাত্রায় কোনো অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কি না, তা গভীর বিবেচনার বিষয়। গত কয়েক বছরের সাহিত্যপ্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবনবীক্ষার মধ্যবর্তী জলবিভাজনরেখা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব যেন প্রাসঙ্গিক নয় আর, বিচিত্র সমগ্রায়নের প্রবণতায় কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ বয়ানের পার্থক্য অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। আধুনিকোত্তর পরিস্থিতির নামে আরোপিত প্রতিনন্দনের কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পিত হচ্ছে বাঙালির লিখন-প্রণালী। বাখতিনের কার্নিভাল সংক্রান্ত ভাবনার নির্যাস থেকে এক্ষেত্রে হয়তো আমরা প্রতিরোধের ভিন্ন প্রকরণ খুঁজে নিতে পারতাম।

না, এসব কোনো আক্ষেপের কথা নয়। বিশ্বব্যাপ্ত নির্মাণবায়ন প্রবণতার মধ্যে আমাদের অজস্র স্ববিরোধিতা-লাঞ্ছিত সাংস্কৃতিক সমাজ কীভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে—এটাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। এ ব্যাপারে কতটা সাহায্য করতে পারেন বাখতিন, সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে এখন। ইতিহাসই বাঙালির পরিসরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ফলে অসংখ্য উচ্চাবচতা, কৌনিকতা ও অনিশ্চয়তা সম্বল করে বাস্তুহীন মানুষের প্রব্রজন আজও অব্যাহত। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার মাত্রা যেহেতু আলাদা, জীবনবীক্ষায় ভিন্নতার অভিব্যক্তিও অনিবার্য। বস্তুত প্রাক্-আধুনিক, আধুনিক ও আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর সহাবস্থান তাই বাঙালির ভাববিশ্বকে গ্রন্থিল করে তুলেছে। সাহিত্যকর্মে আধার ও আধেয়ের দ্বিরালাপ নানাভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। স্বভাবত প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নটি সমস্ত বাঙালির দ্বারা একই ভাবে মীমাংসিত হতে পারে না। বিভিন্ন অবস্থানের সীমান্তগুলিকে কীভাবে গ্রহণ করতে পারি আমরা, এ-বিষয়ে বাখতিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নেওয়া সম্ভব। বিশেষত বাস্তব ও অধিবাস্তব, বস্তুবিশ্ব ও চিহ্নবিশ্ব ইদানীং যেভাবে সাহিত্যিক প্রতিবেদনে একাকার হয়ে যাচ্ছে, নতুনভাবে দ্বিরালাপের যৌক্তিকতা নির্ণয় করা অবশ্যকৃত্য হয়ে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে আখ্যানের স্বরান্তর সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে যে অভিনব সচেতনতার সূচনা হয়েছে, তাকে বাখতিনীয় ভাবকল্প দিয়েই যথার্থ বিনির্মাণ করা সম্ভব। একটু আগে বাঙালির বাধ্যতামূলক প্রব্রজনজনিত চিন্তা ও অভিব্যক্তির যে অনেকান্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছি, সেই সূত্রে বলা যায়, বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীলতার কৃত্যে রূপান্তরিত করার পথ-নির্দেশ বাখতিনই দিতে পারেন। তাৎপর্যের রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে নৈঃশব্দ্য ও অনুপস্থিতির যত ভূমিকাই থাক, কৃত্যের নির্মিতিপ্রকরণ শুধুমাত্র তাদের ওপর নির্ভর করে না। এখানেই বাখতিন-কথিত সক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা আমাদের মনে পড়ে।

বাখতিনীয় ভাবকল্পকে সম্প্রসারিত করে ক্যারিল এমার্সন 'co-existent options in space' (প্রাগুক্ত : ১৬)-এর কথা বলেছেন। এই কথাটি বহুধাবিচ্ছিন্ন বাঙালির সাম্প্রতিক অবস্থানে খুব জরুরি চিন্তাসূত্র হয়ে উঠতে পারে। আরেকজন বাখতিন-বিশেষজ্ঞ, মিখায়েল এপস্টাইন, ১৯৯৩ সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : 'Post-humanism, post-communism, post-modernism—the river of time has entered an ocean and lost its fluency altogether.' (তদেব)। এ হয়তো বাঙালির পৃথিবী সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়; কিন্তু তবু আজকের অধিপরিসর শাসিত নব্য-বহুত্বের পর্যায়ে এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে

বিবেচনা করতেই হয়। লিখন-বিশ্ব ও তার বিচিত্রগামী ভাষ্যকে যদি সংহত ও গভীরতা-সন্ধানী করতে চাই, তাহলে বাখতিনের দ্বিবাচনিক ভাষাদর্শনের ওপর আস্থা রাখতে হবে। রচনাকর্ম, সমালোচনা ও তত্ত্বসন্ধানে আমরা আজ কেবল বর্তমানকেই গুরুত্ব দেব না, অতীত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পুনঃপাঠও করব। অর্থাৎ বাখতিন আমাদের সময় ও পরিসরের আবহমান পর্যায়ক্রমগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করেন। এই সূত্রটির প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন থেকে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনা করার রসদ সংগ্রহ করে নিতে পারি। গ্রেগরি ক্লার্ক তাঁর *Dialogue, Dialectic and Conversation* বইতে লিখেছেন : 'for people studying rhetoric and compostion as well as for those studying literature, Bakhtin's work provides perhaps our most comprehensive explanation of the process through which social knowledge is constructed in a co-operative exchange of texts. However diverse its particular applications. Bakhtin's explanation persistently and explicitly affirms the two complementary assumptions about language that support a social constructionist point of view : that our language creates rather than conveys our reality. ...and that it does so in a process that is collaborative rather than individual.' (পৃ. ৮-৯)

এই মন্তব্যের প্রতিটি অংশ বাংলা সাহিত্যের নিবিড় পাঠে দিক্‌দর্শক বলে বিবেচিত হতে পারে। সামাজিক নির্মিতিবাদী দৃষ্টিকোন ছাড়া নান্দনিক সত্য ও সেই সত্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। বাখতিনের কাছে পাওয়া নির্মিতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা কিংবা 'speech genre'-গুলির অন্তর্নিহিত সামাজিক মাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তরিত প্রতিবেদনের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারব। এটা ঠিক যে বাংলা বিদ্যাচর্চা, বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে, অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিবর্তিত হলেও বহুকাল ধরে প্রচলিত রক্ষণশীলতা একটু একটু করে বিচলিত হতে শুরু করেছে। বাখতিন বিশ্বাস করতেন, আমাদের লিখিত বা মৌখিক অভিব্যক্তির কৃত্য বা উদ্যম দুরূহ অন্তর্বৃত সংগ্রামের পরিণতি। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামূহিক অতীত ও বর্তমানের অজস্র উচ্চারণ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে ভাষার সামাজিক ঊর্ণাতন্তু গড়ে তোলে এবং গড়ার ঐ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রাগুক্ত সংগ্রামে যুক্ত হয়ে যায়। এইসব উচ্চারণে যাবতীয় অপর পরিসরের উপস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ ও অন্তরীকৃত। স্বর ও স্বরান্তরের বিন্যাস-প্রতিন্যাসের গ্রন্থনা স্বভাবে দ্বিবাচনিক। সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তহীন দ্বিরালাপের উপস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়ে থাকে।

তিন

বাচন সম্পর্কে বাখতিনের দ্যোতনাময় সমৃদ্ধ ভাবনা কি কম্পিউটার প্রযুক্তির সাম্প্রতিক পর্যায়ে অলংকৃত ভার হিসেবে গণ্য হবে? মুদ্রিত শব্দের জগতে অতি দ্রুত যেসব অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাতে বাচন ও পরাবাচন সংক্রান্ত সূক্ষ্ম চিন্তা এবং সেই চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সন্দর্ভ-পরাপাঠ-অন্তর্বয়ন বিষয়ক ধারণা কি ইতিহাসের মহাফেজখানায় ঠাঁই পাবে? সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব যেমন নিরালম্ব হয়ে পড়বে, তেমনি মানবতাবাদী মূল্যমানও ছিন্নমূল হতে বাধ্য। কম্পিউটারের পর্দায় অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে

সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে অক্ষরের সারি; এদের ইচ্ছামতো কমিয়ে-বাড়িয়ে দুমড়ে-মুচড়ে তৈরি হতে থাকে চরম নমনীয় নব্যপাঠকৃতি। অক্ষরের বিন্যাস-পদ্ধতি তো নয় কেবল, চরিত্রও আমূল পালটে যাচ্ছে। স্বভাবত বাচনও আগের মতো থাকতে পারে না। উপস্থাপনায় এমন উন্মুক্ততা দেখা দিচ্ছে, সংরূপে ও অন্বিষ্ট লক্ষ্যে ই-মেল নেটওয়ার্কিং হাইপারটেক্সট নিয়ে আনছে আমূল পরিবর্তন। বাখতিনের কাছে পাওয়া সংযোগের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তত্ত্ববীজ কি সর্বব্যাপ্ত বিয়োগপর্বের বিভ্রম ও অবভাসে হারিয়ে যাবে? প্রত্যুত্তরযোগ্যতার দার্শনিক নিষ্কর্ষ ও প্রাসঙ্গিকতা কি বজায় থাকবে এখন! লিখনভ্রম লিখনকে আর অধিপরিসরের উচ্চারণ-বিভ্রম উচ্চারণকে মুছে ফেলবে ক্রমাগত? বাখতিন মৌখিক সংযোগ-প্রকরণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তারই আদলে হয়তো বা এইসব অধিপাঠগুলিকে বিশ্লেষণ করার মতো তাত্ত্বিক বয়ান তৈরি করে নেওয়া যায়—এমন ভেবেছেন সাম্প্রতিক এক আলোচক। বাঙালির ভাববিশ্বে এই পর্যায়ের সূচনামাত্র হয়েছে। অন্তত প্রতীচ্যের বৌদ্ধিক সমাজের সঙ্কট এখনও আমাদের কাছে তত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। তবু, বদ্রিয়ারের পরিভাষায় এই ভবিষ্যৎ অতীতের ছবি আমাদের পক্ষে হতে পারে আগাম সতর্কীকরণ। আর, সেই সঙ্গে সংকট-জনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাখতিনের সময়োপযোগী পুনঃপাঠও শুরু করা যেতে পারে।

সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কিত যত দার্শনিক ভাবনা সাম্প্রতিক কালে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাদের মধ্যে বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা তত্ত্ব অতিসাম্প্রতিক কম্পিউটার প্রযুক্তির ফলে সৃজ্যমান বয়ানের বৈপ্লবিক রূপান্তরকে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ শতকের অন্তিম প্রহরে আমরা একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছি; মুদ্রণযুগের স্থিতিশীল পাঠকৃতিগত অভিব্যক্তির স্থান দ্রুত দখল করে নিচ্ছে ইলেকট্রনিক সাক্ষরতার অভিনব প্রবণতা ও যুগোপযোগী গতিশীল বয়ান। বাখতিনের ভাষা-ভাবনা শব্দের মৌখিক উৎসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল; কিন্তু তা আশ্চর্যজনক ভাবে আজকের ইলেকট্রনিক সাক্ষরতা ও পাঠকৃতির গতিশীল অভিব্যক্তিকে বোঝার মতো চিন্তাসূত্র আমাদের যোগান দিতে পারে। কোনো কোনো আলোচক ইদানীং 'Digital dialogics'-এর কথাও বলতে শুরু করেছেন। এটা ঠিক যে বস্তুবিশ্ব সাহিত্যিক বাচনের উৎকর্ষ-সূত্রে চিহ্নবিশ্বে রূপান্তরিত হচ্ছিল। বিশ শতকের শেষে তাত্ত্বিক আলোচনায় বিষয়টি তাই ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক পর্যায়ে চিহ্নায়কের আগ্রাসন তীব্রতর হয়ে চিহ্নায়িতকে কীভাবে গ্রাস করতে বসেছে—তাও আমরা লক্ষ করেছি। বস্তুবিশ্ব কার্যত বিভ্রমবিশ্বে পরিণত হওয়ার ফলে সাহিত্যিক বাচনেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে।

আধুনিকোত্তর কবিতায় প্রতি-উপন্যাসে প্রতি-গল্পে বয়ানের সংরূপ অন্তর্ঘাতের তোড়ে বিদীর্ণ হয়ে যেতে দেখেছি। বাস্তব যখন অধিবাস্তবে কিংবা পরিসর অধিপরিসরে লীন হয়ে যায়, বাচনের বোধ ও দ্বিবাচনিকতার আশ্রয় আমূল রূপান্তরিত না হয়ে পারে না। নির্মাণবায়িত সমাজে প্রযুক্তির বিস্ফোরণে অজস্র চিহ্ন যে উৎপাদিত হয়ে চলেছে—কার্যত তা তো অবভাস। আসলে যা ঘটছে, তা হলো নিশ্চিহ্নায়নের সন্ত্রাস। বাস্তব এখন প্রতীত (virtual) মাত্র। বাখতিনীয় ভাবকল্পগুলিকে প্রয়োগ করতে হলেও অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন। আসলে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, মানুষের পার্থিবতা ও সেই

পার্থিবতায় সম্পৃক্ত সাহিত্যবোধই প্রতীত বাস্তবের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসে প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি। দাতা ও গ্রহীতার অত্যন্ত মৌলিক ও আবশ্যিক দ্বিবাচনিক গ্রন্থনা আর পারস্পরিক প্রত্যুত্তরযোগ্যতা আজ কেবল তাত্ত্বিক ভাববীজ মাত্র নয়; সর্বগ্রাসী উদ্ধত প্রতাপের বিরুদ্ধে সাহসী সাংস্কৃতিক যুদ্ধেরও হাতিয়ার। অর্থাৎ একুশ শতক যদি বা আধুনিকোত্তর অবভাসবাদের কল্যাণে ভবিষ্যবাদী মায়া ছড়িয়ে দিয়ে নব্য রোমান্টিক প্রতিজগতের বার্তা বয়েও আনে, সর্বপ্লাবী মূল্যহীনতা থেকে সম্ভাব্য মূল্য-চেতনায় পৌঁছানোর দ্বিবাচনিক সংঘর্ষের পথ মানুষকেই নির্মাণ করে নিতে হবে। একুশ শতকের সাহিত্যে বাচনের আপাত-নির্বাসনের আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যোপলব্ধির এই নব্যপ্রযুক্তি মানুষকেই আবিষ্কার করতে হবে। সুতরাং বাখতিন-কথিত নির্মিতিবিজ্ঞানের তাৎপর্য পুনর্নির্ণয়ের প্রক্রিয়া রুদ্ধ হতে পারে না। পুনর্নির্মাণের এই প্রকরণে হয়তো অঞ্চলভিত্তিক, ঐতিহ্যভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক অপরতার বর্গগুলিও পুনর্নির্মিত হবে। কিন্তু যা-ই ঘটুক, দ্বিবাচনিকতা থেমে থাকবে না।

প্রযুক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যত চোখ ধাঁধিয়ে দিক বা বিভ্রান্ত করুক, ইতিহাসের ধুলোয় নিশ্চয় মানুষের এতদিনকার সাহিত্যকৃতির পরম্পরা মিশে যাবে না। যেভাবে বাচনের, উপন্যাসের প্রাক্-ইতিহাস খুঁজে পেয়েছেন বাখতিন, আমরাও একদিন প্রাক্-বিশ্বায়িত ও বিশ্বায়নোত্তর প্রযুক্তির নতুন অর্থ আবিষ্কার করে নেব। খুঁজে নেব প্রাক্-নির্মাণবায়ন ও নির্মাণবায়নোত্তর স্তরের নতুন চিহ্নতত্ত্ব। ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্যে নয়, সম্ভাব্য আগামী কালের সঙ্গে ঐসব তাৎপর্যের দ্বিরালাপের সূত্র খুঁজে নেওয়ার জন্যে। সংকট থেকেই যেহেতু সমালোচনার জন্ম হয় এবং অবশ্যই জন্ম হয় নব্যপাঠকৃতিরও—আমাদের আসন্ন সাহিত্যচর্চায় বাখতিনীয় ভাববিশ্বের সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটবে আমাদের। প্রতাপের বিচ্ছুরণে অভিভূত আমাদের মন; প্রচারিত হচ্ছে বহুত্ববাদের জয় অথচ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার আওরাখা। সমস্ত অপর পরিসরের সমান্তরাল অবস্থানের অধিকার যখন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, দৃষ্টির বহুত্ব কিংবা উদ্বৃত্ত তো কাগুজে কথা হয়েই থাকবে। যেহেতু বাখতিনের বয়ান 'canonical texts of the academy'-র দৃষ্টান্ত নয়—আজকের দিনের প্রয়োজনীয় পুনস্তত্ত্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে তাঁর উন্মুক্ত চিন্তা-পরিসর থেকে। পৌর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের পাশাপাশি ইদানীং যে নতুন তথ্য-বিস্ফোরিত তথ্য-উন্মুখ তথ্যগ্রাহী সমাজের সূত্রপাত হয়েছে, তার মোকাবিলা করতে হলে বাংলা বিদ্যাচর্চাকে নিরাসক্ত ও ছদ্ম-নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান পরিহার করতে হবে।

কেউ কেউ বলছেন, বাচনিক বনাম দৃশ্যগত আখ্যানের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর এখন। গ্রহীতাসত্তা যেহেতু নিছক গ্রহীতা নয় আর, ভোক্তাসত্তাও—আমাদের বহু দৃঢ়প্রোথিত ভাবনা হঠাৎ নিরালম্ব হয়ে পড়ছে। অভিনব সমস্যার সমাধান পুরোনো পথে হওয়া শক্ত। যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 'গন্তব্য' পথকে নিয়ন্ত্রণ করত, সেই পর্যায় থেকে সরে এসেছি আমরা। তাহলে, সন্দর্ভ থেকে প্রতিসন্দর্ভে পৌঁছানো যথেষ্ট নয়; 'উপস্থাপনা'র প্রায়োগিক তাৎপর্যকে বহুদূর প্রসারিত করতে হবে। সেই সূত্রে 'প্রত্যুত্তরযোগ্যতা'র ধারণাকেও সব গণ্ডি ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে অনন্ত স্থিতি-স্থাপকতার সম্ভাবনায়। যাঁরা বলছেন লেখকের বয়ানকে এখন রূপান্তরিত করতে হবে—'to digital, on-line forms of expression...from linear page to digital hypertext and multimedia visuals to more holistic electronic forums'—তাঁরা স্পষ্টত সময়ের অতি-সপ্রতিভ নব্য

কার্নিভালের রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের মনে সেই পুরোনো অবোধ প্রশ্নই জেগে ওঠে আবার : অতঃ কিম্? যে-কোনো মূল্যে টিকে থাকতে হবে—এই কি অস্তিত্বের সংজ্ঞা? বিশ্বব্যাপ্ত তথ্য রাজপথ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে লক্ষ করতে পারব কি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, ভোগ-প্রযুক্তির ক্যাসিনো, বস্তু ও চিহ্নের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান কীভাবে পলক ফেলতে-না-ফেলতে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে ততোধিক দুর্বার বেগে ধাবমান নেতি ও নৈরাজ্যের কৃষ্ণবিবরে?

আসলে সময়ের পর্বে-পর্বান্তরে যুদ্ধের সংজ্ঞা, যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম, যুদ্ধকৌশল পালটে যায়। একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকে অন্তত এইটুকু বুঝতে পারছি যে আগামী দিনগুলিতে মানবিক অন্তঃসার সংরক্ষিত করে রাখার মতো আপাত-প্রাথমিক কাজই হবে বড়ো ধরনের সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাখতিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন; তাঁর তত্ত্ববীজগুলি হবে যুগপৎ আত্মরক্ষার প্রকরণ ও প্রত্যাঘাতের আয়ুধ। বাখতিন জানতেন, দ্বিবাচনিকতা অন্তহীন; তা সর্বত্র ও সর্বকালে রয়েছে। বস্তুত এই প্রক্রিয়ার শক্তিতেই মানুষ অপরাজেয়, মানবিক নিষ্কর্ষ কালাতিযায়ী। নইলে ভাষা হারিয়ে যেত, মুছে যেত সাহিত্যিক প্রতিবেদন। সুনির্দিষ্ট সময়পর্বের সীমা ও বাধ্যবাধকতা পেরিয়ে গিয়ে ভাষাই শুধু সঞ্চরমান থাকে, গ্রাহক-সত্তায় সঞ্চারিত করে তার ঐশ্বর্য ও গভীরতা; আত্মদীপ ও অনন্যশরণ হয়ে ওঠে মানুষ। আজকের গোলকধাঁধা তাই এমন বন্দীশালা হতে পারে না যা-থেকে মুক্তি নেই। ভাষায় দীপ্যমান মানুষ কখনও তাৎপর্যরিক্ত হতে পারে না। যা-ই ঘটুক অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে, বাচনের যুদ্ধ অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ-সময়ে বাখতিনচর্চা তাই এই যুদ্ধে সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানেরই অঙ্গীকার। Speech Genres and Other Late Essays থেকে আরও একবার তুলে আনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উচ্চারণমালা : 'There is neither a first nor a last word and there are no limits to the dialogic context (it extends into the boundless past and the boundless future). Even past meanings that is, those born in the dialogue of the past centuries, can never be stable (finalized, ended once and for all). They will always change (be renewed) in the process of subsequent, future developments of the dialogue. At any moment in the development of the dialogue there are immense, boundless masses of forgotten contextual meanings, but at certain moments of the dialogue's subsequent development along the way they are recalled and invigorated in renewed form (in a next context). Nothing is absolutely dead; every meaning will have its homecoming festival.' (১৯৮৬ : ১৭০)

এসময় অর্থবোধে পৌছানোর সমস্ত পথ যখন আধিপত্যবাদী শক্তি-সমবায়ের দ্বারা আক্রান্ত, বাখতিন-ই হতে পারেন নবায়মান দ্বিরালাপের বহুস্বরিক উৎস। রুদ্ধতা থেকে নতুন উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়ার দিশা পেতে পারি তাঁর ইঙ্গিতময় চিন্তাবিশ্বে। এভাবেই সময়ের বিভ্রান্তি ও বিদূষণকে কার্যকরী ভাবে মোকাবিলা করতে পারি আমরা, তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক অবস্থানে থেকেও।

পরিভাষাপঞ্জি

Absolute — পরমতা
Act — উদ্যম, কৃত্য
Addressee — সম্বোধিত
Addresser — সম্বোধক
Addressivity — সম্বোধ্যমানতা
Alter ego — প্রতিকল্প সত্তা
Alterity — বৈকল্পিক স্থিতি
Answerability — প্রত্যুত্তরযোগ্যতা
Antinovel — প্রতিউপন্যাস
Antistory — প্রতিগল্প
Aporias — অন্ধবিন্দু
Architectonics — নির্মিতিবিজ্ঞান
Authorial self — লেখকসত্তা
Base — অবসংগঠন
Being — অস্তিত্ব
Chronotope — সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রম
Civil society — পৌর সমাজ
Cobeing — সহযোগী সত্তা
Counter-aesthetics — প্রতিনন্দন
Counter-discourse — প্রতিসন্দর্ভ
Counter-ideology — প্রতিভাবাদর্শ
Counter-utterance — প্রতিবাচন
Counter world — প্রতিজগৎ
Deconstruction — বিনির্মাণ
Deed — কৃত্য, উদ্যম
Defamiliarization — অপরিচিতীকরণ
Dchumanisation — বিমানবায়ন
Dialogical — দ্বিবাচনিব
Dialogue — দ্বিবাচনিকতা, দ্বিরালাপ
Difference, sense of — পার্থক্য-প্রতীতি
Discourse — সন্দর্ভ, প্রতিবেদন
Ego — অহং, অস্মিতা
Elite — বৌদ্ধিক বর্গ
Enlightenment — দীপায়ন
Epistemological — জ্ঞানতাত্ত্বিক
Ethical Act — নৈতিক কৃত্য
Existential — আস্তিত্বিব
Form — প্রকরণ
Formalism — প্রকরণবাদ
Free closure — মুক্ত উপসংহার
Given situation — যথাপ্রাপ্ত অবস্থা
Globalisation — বিশ্বায়ন
Great tradition — বৃহৎ ঐতিহ্য
Grotesque Realism — উদ্ভট বাস্তবতাবাদ
Hegemony — আধিপত্যবাদ
Heteroglossia — অনেকার্থদ্যোতনা
Historicism — ঐতিহাসিকতাবাদ
Humanism — মানবতন্ত্র, মানবতাবাদ
Hyper real — অধিবাস্তব
Hyper space — অধিপরিসর
Illusion — অবভাস
Image — ভাবকল্প
Information society — তথ্যগ্রাহীসমাজ
Intertextuality — অন্তর্বয়ন
Inversion — বিপ্রতীপায়ন
Language — সামূহিক বাচন
Legitimised — মান্যতাপ্রাপ্ত
Linearity — রৈখিকতা
Little tradition — লঘু ঐতিহ্য
Material world — বস্তুবিশ্ব

Metalanguage	পরাবাচন
Metaphysics	অধিবিদ্যা
Metaself	পরাসত্তা
Metatext	পরাপাঠ
Microcosm	অণুবিশ্ব
Model	আকল্প
Monological	একবাচনিক
Multidimensional	বহুমাত্রিক
Narrative	আখ্যান
Narratorial self	কথকসত্তা
Neocolonialism	নব্য উপনিবেশবাদ
New historicism	নব্য-ঐতিহাসিকতাবাদ
Non-humanisation	নির্মাণবায়ন
Official Discourse	সরকারি সন্দর্ভ, প্রতিবেদন
Ontological	সত্তাতাত্ত্বিক
Open text	মুক্ত বয়ান, পাঠকৃতি
Otherness	অপরতা
Paradox	কূটাভাস
Parole	একক বাচন
Participant observer	সক্রিয় পর্যবেক্ষক
Political society	রাজনৈতিক সমাজ
Polyphony	বহুস্বরসঙ্গতি
Post Colonial Consciousness	উপনিবেশোত্তর চেতনা
Post enlightenment	দীপায়নোত্তর
Post humanism	উত্তরমানবতন্ত্র
Post Marxism	উত্তরমার্ক্সবাদ
Post modernism	আধুনিকোত্তরবাদ
Post structuralism	আকরণোত্তরবাদ
Reader's response criticism	পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ
Rereading	পুনঃপাঠ
Retheorisation	পুনস্তত্ত্বায়ন
Seeing eye	দ্রষ্টাচক্ষু
Sign	চিহ্ন
Signification	চিহ্নায়ন
Signified	চিহ্নায়িত
Signifier	চিহ্নায়ক
Simulation	প্রতিরূপায়ণ
Situatedness	যথাপ্রাপ্ত স্থিতি
Space	পরিসর
Structuralism	আকরণবাদ
Subaltern	নিম্নবর্গীয়
Subtext	গৌণপাঠ
Superstructure	অধিসংগঠন
Surplus of vision	দৃষ্টির উদ্বৃত্ত
Text	বয়ান, পাঠকৃতি
Texture	গ্রন্থনা
Theoretical world	তত্ত্ববিশ্ব
Totalisation	সমগ্রায়ন
Unfinalizable	চূড়ান্ততাহীন
Virtual reality	প্রতীত বাস্তবতা
World view	বিশ্ববীক্ষা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Bell, Michael Mayerfeld and Gardiner, Michael : *Bakhtin and the Human Sciences* (Sage Publications, London, 1998)

Bernard-Donals, Michael F. : *Mikhail Bakhtin : Between Phenomenology and Marxism* (Cambridge University Press, Cambridge, 1994)

Bhattacharjee, Tapodhir : Relocating Bakhtin (Amritolok, Kolkata 2007)

Brandist Craig and Tihanov, Galin (eds.) : *Materializing Bakhtin* (Macmillan Press, London, 2000)

Clark, Katerina and Holquist, Michael : *Mikhail Bakhtin* (Harvard University Press, 1984)

Danow, David K : *The thought of Mikhail Bakhtin* (Macmillan, London, 1991)

Dentith, Simon : *Bakhtinian Thought* (Routledge, London, 1995)

Emerson, Caryl : *The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin* (Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997)

Gardiner, Michale : *The Dialogics of Critique : M. M. Bakhtin and the theory of Ideology* (Routledge, London, 1992)

Hirschkop, Ken and Shepher, David (eds.) : *Bakhtin and Cultural Theory* (Manchester University Press, 1989)

Holme, Karen and Helen Wussowceds.) : *A Dialogue of Voices : Feminist Literary Theory and Bakhtin* (University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota, 1994)

Holquist, Michael : *Dialogism : Bakhtin and His World* (Routledge, London, 1990)

Lodge, David : *After Bakhtin : Essays on Fiction and Criticism* (Roultedge, London, 1990)

Mandelkar, Amy (ed.) : *Bakhtin in Contexts : Across the Disciplines* (Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1995)

Maroes, Marcia : *Bilingual Education* (State University of New York Press, Albany, 1996)

Morris, Pam (ed.) : *The Bakhtin Reader* (Edward Arnold, London, 1994)

Morson, Garry Saul (ed.) : *Bakhtin : Essays and Dialogues of His Work* (University of Chicago Press, 1986)

Morson, Gary Saul and Emerson, Caryl : *Rethinking Bakhtin : Extensions*

and challenges (Northwestern University Press, 1989)
Morson, Gary Saul : *Mikhail Bakhtin : Creation of a Prosaics* (Stanford University Press, 1991)
Pearce, L. : *Reading Dialogics* (Edward Arnold, London, 1994)
Todorov, Tzvetan : *Mikhail Bakhtin : The Dialogical Principle* (Manchester University Press, 1984)
Vice, Sue : *Introducing Bakhtin* (Manchester University Perss, 1997)
বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (সম্পাদক) : এবং এই সময় (বাখতিন বিশেষ সংখ্যা) উথক প্রকাশনী, কলকাতা, ১২শ বর্ষ ৩৬তম সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৪০৩ (মার্চ-মে, ১৯৯৬)
বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : *পোষ্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭
ভট্টাচার্য, তপোধীর : *বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৬
রায়, দেবেশ : *উপন্যাস নিয়ে*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১
রায়, দেবেশ : *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪
শূর, চিরঞ্জীব (সম্পাদক) : *মননবিশ্ব পরিচয়* (১ম খণ্ড), আলোচনাচক্র, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৮